পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	পত্রাঙ্ক

G.P. DS—2,000. 2-89

ওঁ হংসঃ ষট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ।

গঙ্গাধর

ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ গঙ্গাধর বাবার

অপূর্ব্ব জীবন-কথা।

'সাধনপ্রদীপ', 'গুরুপ্রদীপ', 'পূজাপ্রদীপ', 'গীতাপ্রদীপ',
'ঠাকুর সদানন্দ' ও 'বিহারীবাবা' প্রভৃতি
গ্রন্থপ্রণেতা পরমহংস

শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত।

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল, শিল্প ও সাহিত্য বিভাগ হইতে

শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্ত্তী কাব্যশিল্পবিশারদ দ্বারা

প্রকাশিত।

কলিকাতা, সন ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ।

মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

শুভাশীর্ব্বাদ
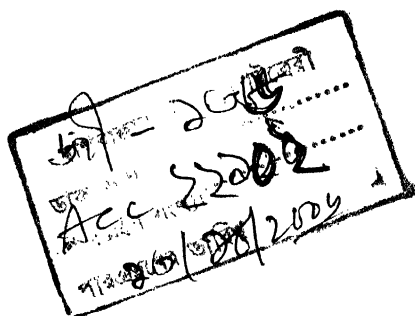
পরম কল্যাণীয়—

শ্রীমান্ ডাক্তার গঙ্গাধর দীর্ঘাঙ্গী

এচ, এম, বি।

বাবা গঙ্গাধর,—

বোধ হয় ত্রিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, শ্রীমৎ গঙ্গাধর ব্রহ্মচারীজী মহারাজের অপূর্ব্ব জীবন-কথা—তাঁহার মুখেই আমরা শুনিয়া, তখন চমৎকৃত হইয়াছিলাম ও তাহা তখনই লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছাও হইয়াছিল। প্রায় দশ বার বৎসর পূর্ব্বে সেই ইচ্ছা বলবতী হয়—তাঁহার এই জীবনী তখনই লিখিয়াছিলাম। নানা কারণে ইহা এত দিন প্রকাশের সুবিধা হয় নাই। আজ সেই মহাত্মার জীবন-কথা তোমারই কর-কমলে শুভাশীর্ব্বাদসহ প্রদান করিলাম। তুমি নিজে গঙ্গাধর—সুতরাং "গঙ্গাধর" যে তোমারই আদরের ধন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীআনন্দ-মঙ্গলময়ী মা তোমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধান করুন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা,
পুরীধাম—কলেরগতাব্দা
৫০৩১।

শুভাকাঙ্ক্ষী—

প্রকাশকের বিজ্ঞাপন।

পরম পূজ্যপাদ ঋষিমণ্ডলী ও ষট্ শ্রীমদ্ গুরু-পরম্পরা-নির্দ্দিষ্ট দর্শনমূলক-উপাসনা ও তদনুগত যোগ-বিজ্ঞানের বর্ত্তমান আচার্য্য এবং বিবিধ সাধনাদি-বিষয়ক গ্রন্থপ্রণেতা প্রসিদ্ধ পরমহংস পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতীজী মহারাজের প্রণীত পুস্তক-সমূহের আমরাই একমাত্র প্রকাশক। আজ তাঁহার সেই সিদ্ধ লেখনীপ্রসূত আর এক খানি উপাদেয় পুস্তক—ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ গঙ্গাধরবাবার অপূর্ব্ব জীবনকথা—"গঙ্গাধর" নামক গ্রন্থখানি আমরাই প্রকাশ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইলাম।

এই জীবন-কথা-উপলক্ষে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার স্বামীজী মহারাজ সমাজ, ধর্ম্ম, নীতি ও অযোধ্যা, নৈমিষারণ্য, হরিদ্বার এবং বিশেষভাবে জ্বালামুখী আদি হিম-পর্ব্বতান্তর্গত তীর্থসমূহের বর্ণনা-প্রসঙ্গে তাঁহার স্বভাবসুলভ সূক্ষ্মদৃষ্টি, অসাধারণ জ্ঞান ও গবেষণার যেরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা যথার্থই অপূর্ব্ব! মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিলে, সাধারণে ইহাতে নিশ্চয়ই যথেষ্ট আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন।

এই প্রসঙ্গে আমরা পূজ্যপাদের শুভ-আশীর্ব্বাদসহ জ্ঞাপন করি-তেছি যে, "হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোম্পানীর" পরম কল্যাণীয় শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্র ভড় মহাশয় "গঙ্গাধরের" মুদ্রণকার্য্যের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহনপূর্ব্বক পুস্তকখানি যথা সম্ভব সত্বর প্রকাশ করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আমরাও ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও সাফল্যের জন্য আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছি।

কলিকাতা শুভ রাসপূর্ণিমা,
সন ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ।

শ্রীশ্যামলাল শর্ম্মা,
প্রকাশক।
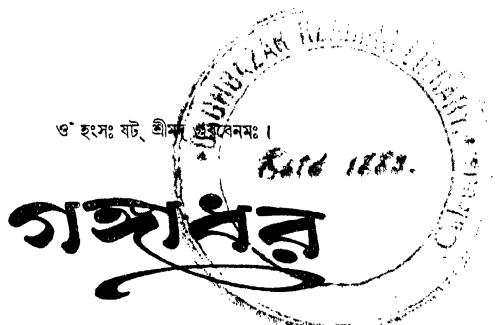
ওঁ হংসঃ যট্‌ শ্রীমদ্ গুরবেনমঃ।

গঙ্গাধর

ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ গঙ্গাধরবাবার অপূর্ব্ব জীবন-কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পবিত্র ভাগীরথীতটে একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষমূলে ‘রায়পুরের বাঁধাঘাট’। ঘাটটী অতি প্রাচীন, উহার স্থানে স্থানে ভগ্ন ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঘাটের একপার্শ্বে গাছের ছায়ায় বসিয়া, একটী বালক আপনার পাঠ্যপুস্তকগুলি পার্শ্বে রাখিয়া, আপন মনে কি ভাবিতেছিল—সহসা সে যেন বিচলিত হইয়া, নিজের গাত্রবস্ত্রাদি তথায় রাখিয়াই, সেই সোপান ধরিয়া জলে নামিল।

একজন অপরিচিত সাধু পূর্ব্ব হইতেই দূরে আর একটী গাছের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। তিনি বালকের এইরূপ চাঞ্চল্যপূর্ণ ভাব দেখিয়া, কি জানি কেন, বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন—“কি রে—খবরদার!”

সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দ্রুতবেগে বালকের নিকট ছুটিয়া আসিলেন ও অবিলম্বে তাহার হাতটী ধরিয়া ফেলিলেন। বালক এই আকস্মিক ব্যাপারে একেবারে হতভম্ব হইয়া, অমনি আবেগ-ভরে কাঁদিয়া ফেলিল।

সাধু বলিলেন—"কাঁদচিস্ কেন? তোর কি হয়েছে"?

বালক আরও জোরে কাঁদিতে লাগিল। জলপূর্ণ কুম্ভ যেমন সামান্য নাড়া চাড়া পাইলে, তাহার জল আপনা আপনি উছ্লাইয়া পড়ে, বালকের চক্ষে তখন তেমনই ভাবে অশ্রু বহিতে লাগিল।

ঘাটে তখন আর কেহই ছিল না, বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। এমন সময়ে বালকটীর সেইরূপ ভাবগতিক দেখিয়া, সাধুর মনে প্রথম হইতেই কিছু সন্দেহ হয়। ছেলেটী পূরা বিদ্যালয়ে যাইবার সাজে পুস্তকাদি সঙ্গে লইয়া এমন সময় যে, ঘাটে স্নানের জন্য আসে নাই, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যতক্ষণ ঘাটে লোকজন ছিল, ততক্ষণ সে একদিকে বসিয়া, আপন মনে যেন কি ভাবিতেছিল। যখন দেখিল—আর কেহই ঘাটে নাই, চারিদিক বেশ নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ, তখনই সে তাহার কাপড় চোপড় সব ফেলিয়া, যেন কত ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া জলে নামিল।

সাধুকে সে পূর্ব্ব হইতে আদৌ লক্ষ্য করে নাই। তিনি দূরে যে স্থানে বসিয়াছিলেন, সে স্থানটী অন্য একটী বৃক্ষের অন্তরালে ছিল। সে তাঁহাকে দেখিতে পাইলে, হয় ত তখন অমন ভাবে জলে নামিতে ইতস্ততঃ করিত। যাহা হউক তিনি বালকের তাৎকালিক মনোগত ভাব আভাসে আংশিক অবগত হইয়া এবং পরে তাহার সেই রোরুদ্যমান ও দুঃখবিহ্বল অবস্থা দেখিয়া, অতি করুণ হৃদয়ে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে উপরে উঠাইয়া আনিলেন। তাহার মুখ ও চক্ষু মুছাইয়া দিয়া, তাহাকে কাছে বসাইলেন ও ধীরে ধীরে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বালক কতকটা শান্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলে, তাহার

মানসিক দুঃখকাহিনী—যাহা সে বলিতে লাগিল, তাহার সার-মর্ম্ম এইরূপ ঃ—

"বালকটী ব্রাহ্মণকুমার"। রায়পুরের প্রসিদ্ধ রমানাথ রায়ের দৌহিত্র। অল্প বয়সে পিতার মৃত্যু হইলে, শোকাতুরা বিধবা মাতা সেই তিন বৎসরের শিশুটীকে ক্রোড়ে লইয়া পিত্রালয়ে আসিলেন। তখন বৃদ্ধ রায়-মহাশয় জীবিত ছিলেন। তাঁহার একটী পুত্র ও একটী মাত্র কন্যা। জামাতা—তাঁহার জীবদ্দশাতেই নিজের যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইয়া, একপ্রকার পথের ভিখারী হইয়াছিলেন। সুতরাং কন্যার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে, এখন তিনি ব্যতীত আর কেহই ছিলেন না। যদিও রায়-পরিবার এখানের বুনিয়াদি ঘর, জমিদার-বংশ, কিন্তু তাঁহার সময়ে সেই পুরাতন নাম-ডাক ব্যতীত আর বিশেষ কিছুই ছিল না। তবে কোনওরূপে মোটা ভাত-কাপড়ে পৈত্রিককর্ম্ম বজায় রাখিয়া, তাঁহাদের চলিয়া যাইত। সে জন্য সংসারে তেমন দুঃখ-কষ্টও ছিল না।

তাঁহার সেই পুত্রটী বেশ সৎ, তিনি ইংরাজী লেখাপড়া যথেষ্ট শিখিয়াছেন, এক্ষণে সরকারী-আফিসে মোটা মাহিনায় চাকরী করেন। ক্রমে তাঁহাদের অবস্থা পুনরায় ফিরিতে পারিবে, সে বিষয়ে বৃদ্ধের এখন স্থির বিশ্বাস হইয়াছে। তাঁহার সেই পুত্রেরও একটী খোকা হইয়াছে, তাহারও বয়স প্রায় চারি বৎসর হইবে। তাঁহার সংসারে একটী মাত্র শিশুসন্তান ছিল, এখন দুইটী হইল। দুইটীই প্রায় সমবয়সী, উভয়ে একত্র বেশ খেলাধূলা করে। বৃদ্ধ পৌত্র ও দৌহিত্রকে লইয়া, বড়ই আনন্দে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

দুই বৎসর এমনই ভাবে চলিয়া গেল, সহসা দেশব্যাপী ভীষণ

কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব হইল। বৃদ্ধ রায়মহাশয় তাহাতে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। রোগ-যন্ত্রণায় তাঁহার সেই আনন্দ-ক্রীড়ার বুঝি অবসান হইল! অনতিকালমধ্যে তাহাতেই বৃদ্ধের লোকান্তর ঘটে।

তিনি শেষ সময়ে পুত্র চন্দ্রনাথকে ডাকিয়া বিশেষ করিয়া বলিয়া গেলেন যে, তোমার একমাত্র বিধবা ভগিনী "নন্দরাণী" ও তোমার ভাগিনেয় "গঙ্গাধর"কে একটু যত্ন করিও। ছেলেটা যাহাতে মানুষ হয়, তাহা করিও; তাহা হইলে, নন্দর কতকটা দুঃখ-কষ্ট দূর হইবে, সে শেষ-বয়সেও হয় ত একটু সুখী হইতে পারিবে। চন্দ্রনাথ পিতার সেই শেষ আদেশ অবহেলা করেন নাই। তিনিও অতি সৎপ্রকৃতির লোক, বেশ বুদ্ধিমান, ভগিনী ও ভাগ্‌নেকে সুখী করিতে তিনি কিছুমাত্র ক্রটী করেন নাই। কিন্তু নন্দরাণীর ভাগ্যে সে সুখ অধিক দিন সহিল না! সেও তাহার পিতার পরলোক গমনের ঠিক দুই বৎসর পরে—কাল বসন্তরোগে যখন মারা গেল, তখন বালকটী মাত্র সাত বৎসরের। মাতৃ-বিয়োগের শোক-দুঃখ বেচারা তেমন অনুভব করিতে পারিল না। চন্দ্রনাথ তখন পিতৃবাক্য স্মরণ করিয়া, সেই অনাথ বালকটীকে অধিকতর যত্নপূর্ব্বক মানুষ করিতে লাগিলেন। নিজের পুত্রের জন্য যেমন ব্যবস্থা, ভাগিনেয়ের জন্যও ঠিক তেমনই ব্যবস্থা করিতেন। উভয়কে তিনি একচক্ষে দেখিতেন, তাহাদের এক বিদ্যালয়ে একত্র ভর্ত্তি করিয়া দিলেন, উভয়েরই কাপড় চোপড় পোষাক পরিচ্ছদ একই রকম দিয়া বড় যত্ন করিয়া, লালন-পালন করিতে লাগিলেন।

বিদ্যালয়ে বালকদিগের যেমন বার্ষিক পরীক্ষা হয়, এ বৎসরও তেমনই হইল। তাহাতে গঙ্গাধর এবার সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার

করিল। সে যেমন সুশীল, তেমনই বুদ্ধিমান। প্রতি বৎসরই তাহার মামাতো-ভাই তাহার সতীশদাদার অপেক্ষা সে উচ্চস্থান অধিকার করে, পারিতোষিকও পায়। এবার সে প্রথম পারিতোষিক পাইয়াছে, কিন্তু তাহার সতীশদাদা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া, কত কাঁদাকাটা করিয়া, তবে পরবর্ত্তী উচ্চশ্রেণীতে উঠিতে পারিয়াছে। এ বিষয় চন্দ্রনাথবাবু জানিতে পারিয়া, সতীশকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন এবং গঙ্গাধরকে খুব আদর করিয়া উৎসাহিত করিলেন।

সতীশের পাঠে আদৌ মনোযোগ নাই; সে পিতার শাসনে কিছুমাত্র সুধ্‌রাইল না,—অধিকন্তু সে নিত্য বিদ্যালয়ের ছেলেদের সহিত একটা না একটা গণ্ডগোল, ঝগড়া বা মারামারি করিবেই করিবে! চন্দ্রনাথবাবু এ সমুদায় কিছুই জানিতে পারেন না। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর তাঁহার আফিস্‌ হইতে আসিয়া, ক্লান্ত হইয়া পড়েন, সংসারেরও কোন খবর তিনি লইতে পারেন না। কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে কেবল ছেলেদের লইয়া, তাহাদের পড়াশুনা দেখিতেন। তাহাতে সতীশ প্রায়ই তাঁহার নিকট তিরস্কৃত হইত, কিন্তু তাহাতে সতীশের কোনও ফল হইল না।

তিনি আফিসে চাকুরী করেন, দশটার সময় তাঁহাকে আফিসে পৌঁছিতে হয়, কাজেই বাধ্য হইয়া প্রত্যহ আট্‌টার সময়, তাঁহাকে তাড়াতাড়ি দুটী অন্ন যেন নাকে মুখে গুঁজিয়া ছুটীতে হয়। গ্রাম হইতে আফিস্‌ অনেক দূর, সে কারণ নিত্য নৌকা করিয়া তাঁহাকে যাইতে হইত। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা-বৃষ্টি সকল সময়েই যথাকালে আফিসে পৌঁছিবার জন্য বড়ই ব্যস্তসমস্ত হইয়া, তাঁহাকে তাঁহার নিত্যকর্ম্ম সাধিতে হইত। সুতরাং সংসারের যাহা কিছু কর্ত্তব্য,

সমস্ত তাঁহার স্ত্রীকেই সম্পন্ন করিতে হইত। পূর্ব্বে পিতা ছিলেন, ভগিনী ছিলেন, তাঁহারা সব দেখিতেন—শুনিতেন। এখন তাঁহার স্ত্রীই সে গৃহের একমাত্র গৃহিণী ও সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। তিনি যাহাকে যাহা দেন, সে তাহাই পায়, তিনি যাহা করেন, তাহাই হয়। কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার বা কাহাকেও ভয় করিয়া কোন কাজ করিবার পক্ষে তাঁহার কেহ ছিল না। যাহা হউক এমন অবস্থায় তিনি কেন যে, দিন দিন হতভাগ্য গঙ্গাধরের উপর ক্রমে বিরক্ত হইতে লাগিলেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না।

তাঁহার ছেলে সতীশ দুষ্ট, পাঠে অমনোযোগী, ঘরে বাহিরে তাহার উপদ্রবে সকলে উৎপীড়িত, ছোট ভাই-ভগিনীগুলি তাহার ভয়ে সদাই ত্রস্ত—কিন্তু তিনি তাহাকে কিছুই বলেন না, একটুও শাসন করেন না। তাহার সকল দোষ গোপন করিয়া, ভাগ্নে গঙ্গাধরের উপরেই সব চাপাইয়া দেন, যেন সেই সকল অনর্থের মূল এবং সেই কারণ তাহাকে অনবরত দূর-ছাই ও তিরস্কার করেন। তাঁহার ইচ্ছায় গঙ্গাধরের খাওয়া পরাও, আজ কাল সতীশ বা অন্যান্য ছেলে মেয়েদের অপেক্ষা অনেক ইতর-বিশেষ হইতে লাগিল। চন্দ্রনাথ তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। বরং তিনি গঙ্গাধরের বিরুদ্ধে প্রত্যহ একটা না একটা দোষারোপ করিয়া, তাহার দুষ্টামী ও বদ্‌মাইসীর কথা কতরকমে চন্দ্রনাথের কাণে তুলিতে লাগিলেন। সে যে একটী ভয়ানক "মিট্‌মিটেডান্‌" হইয়া উঠিয়াছে, স্ত্রীর কথায় চন্দ্রনাথ ক্রমে যেন তাহা বুঝিতে পারিলেন।

প্রথম প্রথম তিনি বালককে কখন বুঝাইয়া, কখনও বা ধমকাইয়া দিতেন, কিন্তু সে যে নির্দ্দোষ, তাহা কোনরূপে তাহার

মামাকে বুঝাইতে যাইলে—তাহার মামীমা, তখন এমনভাবে তাহার উপর ক্রোধ প্রকাশ করিতেন ও একটার পরিবর্ত্তে পাঁচটা দোষ দেখাইয়া, এমন গুছাইয়া বলিতেন যে, সে বেচারা একেবারে ভয়ে জড়সড় হইয়া যাইত, আর কোন কথাই বলিতে পারিত না। কখন বা চন্দ্রনাথবাবুর সম্মুখে কোন কথা না বলিয়া, সময়ান্তরে তাহাকে নানারূপে নির্য্যাতন করিতেন—তাহাকে হয় ত তখন পেট ভরিয়া খাইতে দিতেন না--ছেলে মেয়েদের উচ্ছিষ্ট এঁটো-কাঁটাই প্রায় তখন তাহার ভাগ্যে জুটিতে লাগিল! অন্য ছেলেদের ছেঁড়া-ফোঁড়া কাপড়চোপড়ই তখন তাহাকে পরিতে হইত। চন্দ্রনাথ-বাবুকে তিনি সদাই শুনাইয়া বলিতেন—"নতুন কাপড়গুলো ছিঁড়ে পাঁই পাঁই করে ফেল্‌লে, এমন আবাগে ছেলে ত্রিভুবনে কেউ কখনও দেখে নি!"

বালক এত কষ্টেও একটী কথাও তাহার মামার নিকট বলিতে আর সাহস করিত না—সদাই ভাবিত, "আবার যদি কোন পীড়ন করে!" একদিন বিশেষ কষ্ট পাইয়া, সে তাহার মামার নিকট কিছু বলিতে যাইয়া, তাহার ভাগ্যদোষে বিপরীত ফল হইয়াছিল—তাহার মামা সেই সময় স্ত্রীর কথায়, তাহাকে "গোবেড়েন্" করিয়া পিটিয়াছিলেন। সে রাত্রি মনের দুঃখে সে আর আহার করে নাই, কিন্তু সে জন্যও পর দিবসে তাহাকে কিছু নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। এই ভাবে সে তাহার মাতুলের সমগ্র স্নেহটুকু যেন হারাইতে বসিল। আহা, ছেলেমানুষ, একেবারে অনাথ, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কেহই তাহার দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করে না, কেহ তাহাকে এতটুকু স্নেহ ক'রে কাছে ডাকে না, সে বড়ই কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে আরও কয়েক বৎসর অতীত হইল, গঙ্গাধর একাদশ বৎসর বুঝি অতিক্রম করিয়াছে। চন্দ্রনাথবাবু—পুত্র সতীশ ও গঙ্গাধরের উপনয়নের ব্যবস্থা করিলেন। সতীশের জন্য—ভাল বেনারসী জোড়, জরির জুতা ও ছাতা ইত্যাদি কত কি আসিল, কিন্তু স্ত্রীর পরামর্শে গঙ্গাধরের জন্য তিনি একখানি লালপাড়ের ধুতি লট্‌কান দিয়া ছুপাইয়া দিলেন ও একজোড়া কেবল কাঠের খড়ম কিনিয়া দিলেন। বালক তাহার সতীশদাদার সাজসজ্জা দেখিয়া একটু বিচলিত হইল। সে মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিল—"মামী-মা, সতীশদাদার কেমন জরিরপাড় চেলি, জরির জুতো হয়েছে, আমার হবে না"? তাহার উত্তরে মামীমা যাহা বলিলেন—তাহাতে বালকের দুই নয়ন বহিয়া বক্ষ ভাসিয়া গেল। তিনি বলিলেন—"সতীশের সঙ্গে তোর তুলনা! তুই দীন দুঃখী ভিখিরী হতভাগ্য—আর সতীশ কে?" ইত্যাদি তীক্ষ্ণ-বাণের মত কথায় তাহার মামীমা তাহার সেই ক্ষুদ্র কোমল মর্ম্মস্থলটুকু যেন ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিলেন। বালক তখন গভীর দুঃখ ও ক্ষোভে গোপনে কেবল অশ্রু-বর্ষণ করিয়াই নিরস্ত হইল।

সেই কথা লইয়া তাহার মামীমা, চন্দ্রনাথবাবুর কাছেও এমন সাজাইয়া গুছাইয়া, তাহার হিংসা, দ্বেষ আদির কত কথাই যে বলিলেন, তাহার ঠিক নাই। চন্দ্রনাথবাবু সেকারণেও তাহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। এইরূপে সে যথার্থই যেন চন্দ্রনাথবাবুর অতি অপ্রিয় হইয়া পড়িল। জন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফল, মানুষের ভাগ্যের বিষয়, বাস্তবিক কেহই বুঝিতে পারে না!

উপনয়নান্তে দুইটি বাল-ব্রহ্মচারী দণ্ডীঘর হইতে বাহির হইবার একদিন পরে, সতীশ তাহার ছোট-ভাইকে এমন প্রহার করিল যে,

তাহার মাথায় দুই আঙ্গুল গভীর কাটিয়া গেল, অবিরত রক্ত পড়িতে লাগিল, দীনার-মা তখনই কতকগুলা দূর্ব্বা ছেঁচিয়া চন্দনের মত বাটিয়া, সেই ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিয়া বাঁধিয়া দিল, তাহাতেই অবিলম্বে সেই রক্তধারা বন্ধ হইয়া গেল। ছেলেটী কাঁদিতে কাঁদিতে অত্যন্ত কাতর হইয়া, ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল বটে, কিন্তু তাহার তাড়সে কিয়ৎপরেই ছেলেটীর খুব জ্বর আসিল।

সন্ধ্যারপর চন্দ্রনাথবাবু বাটীতে আসিবামাত্র তাঁহার স্ত্রী সেই আসল কথা গোপন করিয়া, সকল দোষ গঙ্গাধরের উপর চাপাইয়া, তাঁহাকে সেই সব ঘটনা বলিতে লাগিলেন, আর সেই সঙ্গে অতি ক্রোধভরে ইহাও বলিলেন যে,—"ও ডাকাতে-ছেলেকে আমি আর ঘরে রাখ্‌বো না, তোমার আদরের ভাগ্‌নেকে তুমি নিয়ে আদর কর, তুমি যেখানে হয় ওকে রাখো, আমি ত জ্বলেপুড়ে খাক্ হলুমই, আবার বাছাধন ছেলে-মেয়েদের উপর ওর এত হিংসে, এত অত্যাচার! কোন্ দিন কার যে প্রাণ যাবে, তার ঠিক নেই। আমায় রক্ষা কর, তোমার পায়ে পড়ি; না হয় বল, আমিই কোথাও চলে যাই। তুমি দয়া করে আমার বাপের বাড়ীতে আমাদের রেখে এসো—ইত্যাদি ইত্যাদি।"

চন্দ্রনাথবাবু সমস্ত দিনের পর খেটেখুটে ক্লান্ত হয়ে এসেই, এই সব ব্যাপার দেখেশুনে, একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন ও তখনই গঙ্গাধরকে ধরিয়া নির্দ্দয় প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। সে বেচারা একেবারেই নির্দ্দোষ, কিছুই জানে না, সহসা তাহার উপর এই ভীষণ অত্যাচার!

প্রথমে সে ত কেবল চীৎকার করিয়া কাঁদিতেই লাগিল, পরক্ষণে তাহার উপর এই মিথ্যা অভিযোগের কারণ জানিতে

পারিয়া, সে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার প্রতিবাদ করিতে যাইলে, আরও নির্য্যাতীত হইল। তখন সে আর উপায়ান্তর না দেখিয়া, অধিকতর ভয়ে পলাইয়া নিকটস্থিত এক প্রতিবেশীর বাটীতে যাইল ও তাহাদের গোয়াল-ঘরের মধ্যে লুকাইয়া রহিল। সে রাত্রিতে সে আর বাটীতে আসিতে সাহস করিল না। যদিও সে এইরূপ ভাবে প্রায়ই অন্যায় তিরস্কৃত হইত, কিন্তু এবার তাহার উপর যেন কিছু গুরুতরই হইল। সে আর বুঝি সহ্য করিতে পারে না! তাহার মনে ভারি দুঃখ ও অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল। সে সারারাত্রি আপন মনে কত কি যে ভাবিতে লাগিল, তাহার আর সীমা নাই।

প্রাতে চন্দ্রনাথবাবু শয্যা হইতে উঠিলেই, তাঁহার স্ত্রী বলিলেন —"তোমার সখের ভাগ্‌নে কাল সেই যে, কোথায় গেছেন, তার উদ্দেশ নেই; সতীশকে, ভোলাকে, দীনার-মাকে পাঠিয়ে, সকল জায়গায় খবর নিলুম, কোথাও তাঁর সন্ধান নেই। কাল থেকে তাঁর খাবারটাবার সব চাপা রয়েছে; এখন কোথায় তিনি আছেন, জান্‌তে পারলে, না হয় তাঁর পায়ে ধরে আনি—আমার কত অধর্ম্মের ভোগ্‌ গা! দোষ কর্‌বেন্‌, আবার কত অভিমান! তবু আমি তাঁকে একটীও কথা বলি নি!"

চন্দ্রনাথবাবু মুখ হাত ধুইয়াই, তাড়াতাড়ি পাড়ার এখানে সেখানে যতদূর পারিলেন অনুসন্ধান করিলেন, তাঁহার আবার আফিসের বেলা হইয়া যাইতেছে দেখিয়া, আর তিনি বেশীক্ষণ খুঁজিতে পারিলেন না, বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। প্রতিবেশী দুই এক জনের উপর তাহার অনুসন্ধানের ভার দিয়া, অতি চিন্তান্বিত হইয়াই তাড়াতাড়ি আফিসের জন্য বাহির হইয়া পড়িলেন।

এদিকে কিছু বেলা হইলে, গঙ্গাধর অতি ভয়ে ভয়ে বাড়ীর আশে পাশে আসিয়া, যখন সংবাদ পাইল যে, তাহার মামা আফিসে চলিয়া গিয়াছেন, তখন অতি সন্তর্পণে, যেন চোরটীর মত বাড়ীর মধ্যে গোপনে আসিয়া, তাহার আপনার পুস্তকাদি লইয়া, নিজের কাপড়চোপড় পরিয়া, চুপি চুপি আবার বাহির হইয়া পড়িল। প্রথমে মনে করিল—বিদ্যালয়ে যাই। এত কষ্টতেও সে কোন দিন বিদ্যালয়ে কামাই করে নাই, পড়াশুনায় সে কোন দিন অবহেলা করে নাই, কাহারও সহিত সে এক দিনও কোনরূপ অশিষ্ট আচরণ করে নাই, বুঝি বা ইহাই তাহার কাল! আজ সে বিদ্যালয়ে যাইব মনে করিয়াও, কেন সে সেইপথে যাইতে পারিল না! ফিরিয়া ঘাটের ধারে আসিয়া, পূর্ব্বকথিত অবস্থায় বটের-ছায়ায় বসিয়া, একলা আপন মনে কত কি যে সে ভাবিতে লাগিল, তাহার বুঝি আদি অন্ত নাই! কতক্ষণ যে তাহার এই ভাবেই কাটিয়া গেল, তাহাও বোধ হয় তাহার স্মরণে নাই! অনন্তর সে বুঝি আর নিজের মাথা ঠিক রাখিতে পারিল না—এই ভীষণ মর্ম্মান্তিক যাতনায় তাহাকে যেন পাগল করিয়া তুলিল, সে এই অসহনীয় অন্তরজ্বালা শান্তি করিবার মানসেই, সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল, আর কালবিলম্ব না করিয়া, সেই সদাস্নিগ্ধ ও শান্তিময়ী গঙ্গার জলে আত্মবিসর্জ্জন করিতেই যাইতেছিল। তাই সে সেই সাধু-মহাপুরুষের অতর্কিত আদেশে, প্রথমে স্তম্ভিত ও পরক্ষণেই তাঁহার করস্পর্শে বিহ্বল হইয়া, যেন পাগলের মত হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সাধু-মহারাজ বালক গঙ্গাধরের এই সব দুঃখকাহিনী শুনিয়া বলিলেন—"বেশ এই জন্যে জলে ডুবে আত্মঘাতী হয়ে, নিজের মহা-পাতক বাড়িয়ে ফল কি বাবা? তোমার মামা-মামী যদি নাই ভাল

বাসেন, তাতে ক্ষতি কি? শ্রীভগবান যে তোমায় সর্ব্বদা ভাল-বাস্‌চেন! আমি তোমায় ভাল বাস্‌বো। তুমি কিছু ভেবো না, তুমি আমার সঙ্গে চল, আমি তোমায় আদর কর্‌বো, তোমার কোনও কষ্ট হবে না।”

সাধুবাবা ছেলেটীর আপাদমস্তক সমস্ত লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, তাহার ভবিষ্যতের সকল কথাই বুঝিতে পারিলেন ও তাকে অতি মিষ্ট কথায় কত সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। মাতৃবিয়োগের পর এতটা স্নেহমাখাঁ, এতটা সহৃদয়তাপূর্ণ বাণী, বালক আর কাহারও মুখে শুনিতে পায় নাই। সে যেন তাঁহার কথায় সহসা মোহিত হইয়া গেল, সে মন্ত্র-মুগ্ধের মত তাঁহারই পরামর্শে তখনই তাহার পুস্তকাদি লইয়া, সে গ্রাম পরিত্যাগ করিল। যাইবার সময় সাধুবাবা তাঁহার ঝোলা হইতে কিছু গুড় বাহির করিয়া দিলেন, অভুক্ত বালক তাহাই খাইয়া ও গঙ্গার জল অঞ্জলি-ভরিয়া পান করিয়া, যেন কতই পরিতৃপ্ত হইল। সেই দয়ার আধার সাধুমহাত্মার পদানুসরণ করিয়া, সে আজ অন্যত্র চলিয়া গেল।

চন্দ্রনাথবাবু সেদিন শীঘ্র শীঘ্রই বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া গঙ্গাধরের অনেক অনুসন্ধান করিলেন। পল্লীর সকলেই আজ তাহার জন্য দুঃখিত, সকলেই তাহার সৎচরিত্রের অত্যন্ত প্রশংসা করিতে লাগিল। চন্দ্রনাথ আজ তাহার দুষ্টামির পরিবর্ত্তে সকলের মুখে একবাক্যে তাহার সুখ্যাতির কথা শুনিয়া, আরও বিস্মিত ও যারপর নাই দুঃখিত হইলেন। বাহিরে যাহার এত প্রশংসা, ঘরে তাহার এত দুষ্টামির কারণ কি? ভাবিতে ভাবিতে তিনি যেন কাতর হইয়া পড়িলেন—রাত্রিতে আর আহারাদি করিতে পারিলেন না, বিছানায় শুইয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন।

জীবের কর্ম্মফল, কখন যে কি সঙ্গ করাইয়া দেয়, কোন পথে টানিয়া লইয়া যায়—মানুষের সাধ্য কি যে, তাহার গতি নির্ণয় করে! চন্দ্রনাথ ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রাভিভূত হইলেন। স্বপ্নাবস্থায় তিনি পিতার সেই অন্তিম-আদেশবাণী যেন পুনরায় শুনিতে পাইলেন। তাহা স্মরণ করিয়া, লজ্জায় অধিকতর মর্ম্মপীড়িত হইতে লাগিলেন। বেচারা গঙ্গাধরের জন্য চন্দ্রনাথবাবু তাহার পরদিন হইতে নানা স্থানে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যখন তাহার কোন সন্ধানই পাইলেন না, তখন তাঁহার হৃদয়ে সেই চিন্তাশেল দৃঢ়তরভাবে আবদ্ধ হইয়া গেল ও ভীষণ যন্ত্রণায় তাঁহাকে মর্ম্মাহত করিতে লাগিল, তাঁহার সারা-জীবনে তাহা আর বুঝি অপসারিত হইল না। হায় হায়, চন্দ্রনাথ! স্ত্রীর অমূলক দ্বেষপূর্ণ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, আজ কি কাণ্ডই না করিলে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সাধু বিমলানন্দজীমহারাজ বেশ ভাল লোক। সাধারণ সাধু-সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় নিরক্ষর ও বৃথা বাক্যবাগীশ নহেন। তিনি যথার্থই ত্যাগী, বিদ্বান ও উন্নত ক্রিয়াবান যোগী মহাপুরুষ। তাঁহার আশ্রম, প্রয়াগের নিকটস্থিত গঙ্গার ধারে। সে স্থানটীও বেশ নির্জ্জন ও মনোরম; তথায় একটী শিবালয় ও তৎসংলগ্ন কয়েকখানি কুটীর আছে। তিনি অধিকাংশ সময় সেই আশ্রমেই অবস্থান করেন। কখন কখন অন্য সাধুরাও আসিলে, তথায় থাকিতে পান। চারিদিকে অশ্বত্থ, বট, পাকুড়, বেল, নিম, আমলকী, আম, জাম ও মৌয়া আদি বড় বড় বৃক্ষসমূহে আশ্রমটী সমাচ্ছন্ন, সম্মুখে তুলসীমঞ্চ ও তাহার পার্শ্বে পাথর-বাঁধান একটী পাকা বেদী আছে; তাহাতেই তিনি বসিয়া নিত্য সায়ংসন্ধ্যায় পরমাত্ম-চিন্তা করেন। আশ্রমের মধ্যে যেন সদা শান্তি বিরাজিত রহিয়াছে। অনতিদূর হইতে গ্রামবাসী লোক জন মাঝে মাঝে আসিয়া, তাঁহাকে ও সমাগত সাধুসজ্জনকে দর্শন করিয়া, নানা ধর্ম্মালোচনায় আনন্দ লাভ করিয়া যায়। কখন কখন তাহারা ভিক্ষাস্বরূপ কিছু কিছু অন্ন-বস্ত্রাদিও তাঁহাদের দিয়া যায়। প্রয়োজন হইলে, বিমলানন্দজী অথবা তাঁহার শিষ্যসেবকগণও নিকটস্থ গ্রামের মধ্যে যাইয়া ভিক্ষাদি সংগ্রহ করিয়া আনেন।

এবার পৌষ মাসে গঙ্গাসাগরের মেলায় যাইবার উপলক্ষে, বিমলানন্দজী অনেক দিন যাবৎ বাহিরে বাহিরেই ঘুরিয়াছেন। প্রথমে গঙ্গাসাগরের স্নানাদির পর, শ্রীধাম পুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের

দর্শন করিতে যান, তাহার পর নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া, আশ্রমে ফিরিবার পথে, রায়পুরে দুই এক দিন অবস্থান করেন! তথায় হতভাগ্য বালক গঙ্গাধরকে তিনি পূর্ব্ববর্ণিত অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়াই পদব্রজে প্রয়াগের দিকে অগ্রসর হইলেন। এ গ্রাম সে গ্রাম, নানা প্রদেশ ও তীর্থ পরিদর্শন করিয়া, প্রায় দুই মাস পরে, গুরু-পূর্ণিমার পূর্ব্বেই, তিনি আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময় হইতে "চাতুর্ম্মাস্য-কল্পারম্ভ" হইবে।

এখন সাধুরা প্রায় কেহই আর বাহিরে পর্য্যটন কার্য্যে ব্যপৃত থাকেন না। পূজ্যপাদ পূর্ব্বাচার্য্যগণের আদেশ-অনুসারে সকলেই স্ব স্ব আশ্রমে বা শ্রীগুরুদেবের আশ্রমে অথবা কোনও পরিচিত সাধারণ মঠ, মন্দির বা অতিথিশালায়, যথায় নিরুপদ্রবে থাকিবার ও ভিক্ষার সুবিধা হয়—তথায় আসিয়া আশ্রয় লন। বাস্তবিক বর্ষার সময় দেশ বিদেশে ভ্রমণ করা সুবিধা জনক নহে। অনেক স্থলে নদী-নালা বর্ষার সময় জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তাহাতে পথসমূহ প্রায় অবিরোধ থাকে না, কাজেই গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করা বা পর্য্যটন করা, তখন তাহাদের পক্ষে যেমন দুর্ঘট হইয়া যায়, তেমনই সাপ, বিছা ও বিষাক্ত কীটাদির উপদ্রবে সকল স্থান প্রায় নিরাকুল থাকে না। তাহার উপর অনেক স্থলেরই জল-বায়ু তখন অত্যন্ত দূষিত হইয়া যায়।

বহু পুণ্যবান গৃহস্থ বংশ-পরম্পরায় কোন্ স্মরণাতীত কাল হইতে এই চাতুর্ম্মাস্য-সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন আশ্রম ও মঠে নিয়মিতভাবে ভিক্ষার জন্য সিধা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী-সাধুরা এই সময় যে কোনও মঠ বা আশ্রমে আসিয়া, নিশ্চিন্তভাবে পঠন-পাঠন, সাধন-ভজন, দীক্ষা-অভিষেক ও সাধারণ পুরশ্চরণাদি

ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই চাতুর্ম্মাস্য-কল্পবাসের ন্যায়, তাঁহারা বৎসরের তিনটী প্রধান ঋতু, অর্থাৎ শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষার প্রতি চারি চারি মাসে, তাঁহারা স্বতন্ত্র তিন ভাবে থাকিয়া স্ব স্ব প্রারব্ধ ভোগ-কাল ক্ষয় করেন। শীতের সময়—অর্থাৎ অগ্রহায়ণ হইতে প্রায় ফাল্গুন পর্য্যন্ত চারি মাস—তাঁহারা গ্রীষ্ম-প্রধান দেশ ও সমুদ্র-তটস্থিত তীর্থাদি দর্শনসহ পর্য্যটন করেন। গ্রীষ্মকাল—অর্থাৎ চৈত্র হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত—শীত-প্রধান হিমালয় প্রদেশ ও পুরীধাম আদি সাগরতীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহ পরিভ্রমণ করেন এবং বর্ষার সময় —অর্থাৎ শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত 'বর্ষাবাস'-কালও—কোনও আশ্রমাদি স্থানে থাকিয়া, পূর্ব্বোক্ত ভাবেই তাঁহারা দিনাতিপাত করেন। এই বিধি অবশ্য প্রাচীন কাল হইতেই নির্দ্দিষ্ট আছে।

এই "বর্ষাবাস" কালকেই লোকে আবার 'চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-কাল' বলিয়াও নির্দ্দেশ করেন। সাম্প্রদায়িক-ভেদ অনুসারে, ইহার কিছু ভিন্ন-ভিন্নরূপ নিয়মও সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ —শয়ন-একাদশী হইতে, বা আষাঢ়ী-পূর্ণিমা, অথবা আষাঢ়ী-সংক্রান্তি হইতে—উত্থান-একাদশীর দিন পর্য্যন্ত, বা কার্ত্তিকী-পূর্ণিমা, অথবা কার্ত্তিকী-সংক্রান্তি পর্য্যন্ত কালই, প্রসিদ্ধ **চাতুর্ম্মাস্য-কাল,** ইহা অবশ্য অতি প্রাচীন বিধান।

আদি জ্ঞানী **শ্রীমন্মহর্ষি কপিল দেবই** এই মত সর্ব্বপ্রথম প্রচার করিয়া ও সাধারণকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। চিরকাল ধরিয়াই, এই মতে বা এই বিধান মানিয়া সকলে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করিয়া আসিতেছেন। গৃহস্থগণ সর্ব্বত্র এই মতেই এখনও কার্য্য করিয়া থাকেন, কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে ইহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত মত অধুনা প্রচলিত হইয়াছে।

শ্রীমৎ বুদ্ধদেব পূর্ব্বাচরিত সেই 'চাতুর্ম্মাস্য-কাল' কিঞ্চিৎ সংক্ষেপ করিয়া, তিন মাসে অর্থাৎ আষাঢ়ী-পূর্ণিমা হইতে আশ্বিনী-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়া দেন। তাহার কারণ আশ্বিন মাসের পরে, বর্ষার সেরূপ বেগ আর থাকে না, সুতরাং বৃথা একস্থানে অত দিন বসিয়া থাকা কেন? সেই অবধি বৌদ্ধ-সাধুরা এখনও এই নিয়মে তিন মাস-কালই 'বর্ষাবাস' সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

অনন্তর **ভগবান শঙ্কর** আচার্য্য হইয়া, তাঁহার প্রবর্ত্তিত দণ্ডী-সন্ন্যাসী-সমাজের মধ্যে এই বর্ষাবাস জন্য চাতুর্ম্মাস্য-কাল আরও সংক্ষেপ করিয়া, 'পক্ষান্তমাস' হিসাবে, চারি পক্ষে আষাঢ়ী-পূর্ণিমা হইতে ভাদ্রপদী-পূর্ণিমার মধ্যবর্ত্তী চারিটী পক্ষ-কাল মাত্র 'চাতুর্ম্মাস্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তিনি দেখিলেন—শ্রাবণ ও ভাদ্র এই দুইটী মাসই প্রবল বর্ষাকাল, আশ্বিন মাসে বর্ষার প্রকোপ প্রায় থাকে না, সুতরাং সাধুরা কেন বৃথা এক স্থানে বসিয়া কালক্ষয় করিবে? সেই অবধি 'দশনামী' সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে উক্ত চারিপক্ষ বা দুই মাস-কালমাত্রই চাতুর্ম্মাস্য বা বর্ষাবাস-কাল অথবা কল্পবাস-ব্রত-কাল বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে।

যাহা হউক এই ভাবে সাধুদের স্বাস্থ্য ও সাধনা, বেশ নিয়মিত থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের গৃহস্থরা নিজ নিজ কল্যাণের জন্য, তাঁহাদের সময় সময় সেবা করিবার অবসর পায় ও তাঁহাদের নিকট হইতে নানা শিক্ষা, উপদেশ, তাঁহাদের সৎসঙ্গ ও আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হয়। কিন্তু হায়, ভারতের সেই শৃঙ্খলাবদ্ধ বিধি-নিষেধ আর নাই! আজকাল প্রকৃতি-বিপর্য্যয় ও

যুগধর্ম্ম-বশে যেন সকল নিয়মই বিকৃত হইয়া গিয়াছে। সেই সঙ্গে দেশের লোক জনের প্রবৃত্তি ও অবস্থাও দিন দিন অতি জঘন্য এবং ঘৃণ্য হইয়া পড়িতেছে। আর্য্যসন্তানদিগের আর সেরূপ ধর্ম্মাচরণ, সাধন-ভজন, অতিথি ও অভ্যাগতের সেবা আদি কোন দিকেই কাহারও লক্ষ্য নাই। এখন প্রায় সকলের লক্ষ্য—কেবল এক অপ্রতিহত স্বার্থসিদ্ধি! কুল, শীল, জাতি, ধর্ম্ম, স্ব স্ব বৃত্তি আদি কোন বিষয়েই তিলমাত্র কাহারও দৃক্‌পাত নাই; প্রায় সকলেই যেন একই সূত্র ধরিয়া, একই ভাব-মোহে অবিরত গতিতে কোথায় ছুটিয়াছে। কেবল কি করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিব, কি করিয়া আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বন্ধু, আশ্রিত-অনাথ বা অনাথার সর্ব্বনাশ করিয়া আত্মপোষণ করিব, তাহাতেই আপনার অনিত্য-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া লইব—কেবল ইহারই অবসর অনুসন্ধান করিতেছে! কেহ কেহ আবার তাহার উপর তুচ্ছ রূপমোহে ভোগ-লালসার সুতীব্র প্রবাহে আমরণ আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে! কত লোকে পবিত্র ধর্ম্মের আবরণে এই ভাবেই নিত্য কত কদাচার ও কুৎসিত ব্যাভিচারের যে গুপ্ত-অভিনয় করিতেছে, তাহারও বুঝি ইয়ত্তা নাই!

হায় হায়, মোহান্ধতা-বশে আত্ম-প্রবঞ্চনাই যে, সকলের সার হইতেছে, কেহই ত তাহা বুঝিতে পারিতেছে না? কত আশার ধন, ভবিষ্যতের কত কল্পনার উজ্জ্বল মণি, দুদিন পরে যে নৈরাশ্যের অতল জলে কেমন করিয়া বিলীন হইবে, তখন কে তাহার ভোগ করিবে, কেই বা তাহার রক্ষা করিবে, সেই প্রবল ভাবস্রোত কোথায় গিয়া যে, সমাপ্ত হইবে, তাহার ত কোনই নিশ্চয়তা নাই! তাহার দৃষ্টান্তেরও ত অভাব হইতেছে না? নিত্যই যেন

চলচ্চিত্রের বা 'বায়াস্‌কোপের' ন্যায় সকলেরই নয়নপথে তাহা প্রতিভাত হইতেছে—মোহবশে জীব তাহা দেখিয়াও, দেখিতে পায় না! তাহারা ভাবে—জগতের সকলেই মরিয়া যাইবে, সকলের বংশ বিলুপ্ত হইবে, আমিই কেবল জগতে অমর হইয়া থাকিব, আমারই বংশ ধনে মানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা লাভ করিবে—কেহ বা মৃত্যুর কথা চিন্তাও করে, একদিন অবশ্যই তাহার মৃত্যু হইবে, সে কথাও ভাবে, কিন্তু তাহার এখনও অনেক বিলম্ব আছে, এই আশায় সে যেন নিশ্চিন্ত হইয়া, তাহার সদসৎ কর্ম্ম-প্রবাহ মন্দীভূত করিতে ইচ্ছা করে না! হয় ত সেইক্ষণে যে প্রশ্বাস বায়ু বাহির হইল —অন্তরশ্বাস বা নিশ্বাসরূপে আর তাহা অন্তরে প্রবেশ করিবে না, একথা কেহই ভাবিতে পারে না। তাই দেশে পাপ-ভার দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, সতত একটা না একটা দৈব দুর্ঘটনার সৃষ্টি হইতেছে —অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, রোগ, শোক, মহামারী ও দুর্ভিক্ষ এখন যেন সকল দেশেই জীবের নিত্য-সহচর হইয়া উঠিয়াছে। কি গৃহস্থ কি সাধু, সকলেরই যেন এক দশা, সকলেই যেন একই সূত্রে দৃঢ়বদ্ধ! দৃশ্যমান জগৎ ব্যতীত আর যে কিছু আছে, তাহা অনেকে মুখে বলিলেও, অন্তরে চিন্তা করিতেও বুঝি সকলে সমর্থ নহে। ফলে দৈব-জগতের প্রতি কাহারও তিলমাত্র বিশ্বাস নাই। কেহ প্রাণ খুলিয়া একটা সরল সত্যকথা বলিতে সাহস করে না, বুঝি বা মানুষের আর সেরূপ সত্যকথা বলিবার শক্তিও নাই। আপন পর বলিয়া নহে—কেহ কাহাকেও এতটুকু বিশ্বাস করিতে পারে না, কি ভয়াবহ পরিবর্ত্তন!

পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিতে প্রত্যেকেই এতদূর অভ্যস্থ হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা আর ভাষায় বর্ণনা করা চলে না। সকলেই

সকলকে কেবল সন্দেহের চক্ষে দেখে। রাজা-প্রজা, গুরু-শিষ্য, শিক্ষক-ছাত্র, সন্ন্যাসী-গৃহস্থ, উচ্চ-নীচ, এমন কি পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও সেই বিমল প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-শ্রদ্ধা কি ভালবাসার চিহ্নমাত্রও আর নাই। যাহা কিছু কেবল আপন আপন স্বার্থের জন্য।

প্রকৃত ভালবাসা সকলেরই অন্তর হইতে যেন অন্তর্হিত হইয়াছে, বুঝি এই অবিশ্বাসী-জগতে তাহার আর স্থান নাই! হায় হায়, কেন এমন হইল? এক বার ভাবিয়া দেখ দেখি? আমার, তোমার বা কাহার কোন্ পাপে সেই আনন্দসৌরভ কোথায় কর্পূরের মত উপিয়া গিয়াছে? পুষ্প আছে—তাহাতে গন্ধ নাই, জীব আছে—তাহাতে প্রেম নাই! তুমি এক বারটী স্থির হইয়া, এই বিষয় ভাবিতে চেষ্টা কর দেখি—তুমি নিজেই সব জানিতে পারিবে। হয় ত আবার রীতিমত এই আত্ম-চিন্তারূপ সামান্য সাধনার ফলে, তাহা ফিরিয়াও পাইতে পারিবে। অন্যকে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে, তুমি নিজেই একবার নিজেকে ভাবিতে যত্ন কর, এক বার, নিজের দিকে ফিরিয়া চাও, নিজেই নিজের সমালোচক হও, মন-প্রাণ দিয়া তুমিই নিজের আদর্শ হও; তাহা হইলেই তুমি সব কথা বুঝিতে পারিবে, তুমি তখন ধন্য হইবে!

তখন তোমারই আদর্শে তোমার অন্তরঙ্গ জনগণ শুধরাইতে থাকিবে, সকলে তোমার অনুকরণ করিবে, আর—তখনই যথার্থ ব্যষ্টির কল্যাণে সমষ্টির কল্যাণ সাধিত হইতে থাকিবে। আবার তখনই সেই ঋষি-প্রবর্ত্তিত ধার্ম্মিক ও সামাজিক আর্য্যনীতি নিবদ্ধ হইয়া অবিশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত হইবে, তোমার অন্তরজগৎও তখন একেবারে শত্রুহীন হইবে! তুমি নামে সাধুই হও, অথবা

কর্ম্মে গৃহস্থই হও, স্ব স্ব কর্ম্ম ও প্রবৃত্তি সগৌরবে পুনর্লাভ করিতে পারিবে। তাহা হইলেই তখন দেশে সর্ব্ববিষয়ক দুর্ভিক্ষ বিদূরীত হইবে। সকলেই স্ব স্ব সামর্থ্য-অনুসারে পরস্পরকে ভিক্ষা দিয়া, তখন শান্তি ও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবে। গৃহস্থ—সাধুকে "স্থূল-অন্নভিক্ষা" দিবে, সাধুও—গৃহস্থকে সদুপদেশরূপ "অভয়-অন্নভিক্ষা" প্রদান করিয়া, জগতে চিরশান্তির পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবে।

তাই বলি—তুমি সাধু, গৃহস্থ যে কেহ হও, এক বার মনে মনেও সত্য কথা বলিতে যত্ন কর, তাহার অভ্যাস কর, আপনার কর্ম্ম ও কর্ত্তব্য ভাবিয়া স্থির করিয়া লও, এক মুহূর্ত্তের জন্যও এক বার অবসর করিয়া, নিজের অতীত ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া দেখ, অনেক বিষয় তোমার চক্ষের সম্মুখেই যেন সেই চলচ্চিত্রের ন্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রতিভাত হইতে থাকিবে, তখনই তোমার প্রকৃত সাধনার সূত্রপাত হইবে।

সাধু বিমলানন্দজীর সময়ে অবশ্য সমাজের এতটা দীনতা উপস্থিত হয় নাই। সে আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীরও অনেক পূর্ব্বের কথা, তখন সন্দেহাত্মক নূতন ইংরাজী-শিক্ষিত মুষ্টিমেয় ব্যক্তি, ধর্ম্ম-কর্ম্মে কতকটা বীতশ্রদ্ধ হইলেও, সমাজ একেবারে ধর্ম্ম ও আচারভ্রষ্ট হয় নাই, দেশে প্রকৃত সাধু ও ভক্তের এতটা অভাব হয় নাই। তখন কাশীতে পরমপূজ্যপাদ তৈলঙ্গস্বামী, ঠাকুর সদানন্দদেব, মৌনীবাবা, কাঠজিহ্বা স্বামী, অঘোরীবাবা ও বিশুদ্ধানন্দ স্বামীজী প্রভৃতি মহাত্মারা আছেন; তখন দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেব সবেমাত্র বিকাশ-প্রাপ্ত হইতেছেন, বিদ্বজ্জন-সমাজে পরিচিত হইতেছেন। সকল আশ্রম ও মঠেই তখন ত্যাগী সাধু-সজ্জনে সর্ব্বদা

পরিপূর্ণ থাকিত। মহাত্মা বিমলানন্দ স্বামীজীর আশ্রম-কুটীরটীও প্রায় তখন সাধুশূন্য থাকিত না, কেহ না কেহ সেই আশ্রমে থাকিতেনই।

তিনি আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার গুরু-ভাই শিবানন্দজী আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে আরও দুইটী সাধু-শিষ্যও আছেন। বহু দিন পরে সাক্ষাতে, পরস্পরে "নমোনারায়নায়" সম্বোধনে আলিঙ্গনসহ প্রেম-বিনিময় করিলেন। গঙ্গাধর আশ্রমস্থিত সকলকে বিনীতভাবে প্রণামপূর্ব্বক পদধূলি গ্রহণ করিল। সে এই দুই মাসমাত্র সাধু-সঙ্গ করিয়া, সাধুদের সহিত ব্যবহারের ও সাধুজীবনের পবিত্র কর্ত্তব্য-বিষয়ে অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছে। নিজের পাঠ্য-অভ্যাস ব্যতীত অনেক স্তবস্তুতি সন্ধ্যাবন্দনা ও উপাসনা-বিষয়েও অনেক শিক্ষা করিয়াছে।

বিমলানন্দজী তাহাকে "নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী"রূপে থাকিবার জন্য রীতিমত শিক্ষা-দীক্ষা দিতে লাগিলেন। গঙ্গাধর স্বাভাবিক অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সুশীল, তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য স্বামী বিমলানন্দজীর তেমন বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইল না। এক বার কোনও কথা বলিলে, বা ইঙ্গিতমাত্র করিলেই সে অনায়াসে তাহা আয়ত্ত্ব করিতে পারে। শিবানন্দজীও গঙ্গাধরের আচার-ব্যবহার ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনিও সর্ব্বদা তাহাকে অনেক বিষয় শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমেই পবিত্র চাতুর্ম্মাস্য-কল্পবাস-সময়ে গঙ্গাধরের বেশ শিক্ষার সুবিধা: হইতে লাগিল।

এখন সে "গঙ্গাধর ব্রহ্মচারী" বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত হইয়াছে; ব্রহ্মচারী-সুলভ তাহার গৈরিকবাস, বিভূতি-শোভিত

অঙ্গভাল, গলায় লম্বিত যজ্ঞসূত্রে ও রুদ্রাক্ষ মালা, করে কমণ্ডলু এবং মস্তকে রুক্ষ কেশ-কলাপ তাহাকে বাস্তবিক অত্যন্ত সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন কি এক পবিত্রোজ্জ্বল জ্যোতিঃ ফুটীয়া বাহির হইতেছে। সে এখন তাহার গুরুদেব বিমলানন্দ স্বামীজীর বড় প্রিয় শিষ্য হইয়াছে। সাধুদের সঙ্গে থাকিয়া, তাহার মানসিক উন্নতিও যথেষ্ট হইয়াছে, সে তাহার মামা-মামীর আচরণ ও সেই দুঃখ-কষ্টের কথা সবই ভুলিয়া গিয়াছে, এখন তাহার আর কোনও চিন্তা নাই, সে বেশ মনের আনন্দেই আছে।

চাতুর্ম্মাস্যকাল অতীত হইবার পর, স্বামী শিবানন্দজীর ইচ্ছাক্রমে স্বামী বিমলানন্দজী আদি সকলেই একত্র হৃষীকেশের দিকে বাহির হইলেন। গঙ্গাধরও তাঁহাদের সঙ্গে নিত্য নূতন নূতন স্থান, তীর্থ ও মন্দিরাদি দেখিতে দেখিতে অতি আনন্দ-সহকারে চলিয়াছে। সকলেই বেশ নিষ্ঠাবান ও জ্ঞানালোচনা-পরায়ণ, কোন মাদক দ্রব্য, গঞ্জিকা, কি ধূমপান পর্য্যন্তও তাঁহাদের ছিল না, সে কারণ গঙ্গাধরের সাধারণ সাধুসুলভ কোনও কুশিক্ষার আদৌ সুযোগ হয় নাই। বাস্তবিক আজ কাল সাধু হইতে যাইয়া, অন্য কোনও সৎশিক্ষা ও অভ্যাস যত হউক আর নাই হউক—গাঁজা, চরস ও ভাং-বুটী ঘোঁটার অভ্যাসটা প্রথমেই বেশ পাকিয়া যায়, আর তাহাতেই ভবিষ্যতে তাহাদের চরম আত্মোন্নতির অত্যন্ত বিঘ্ন উৎপাদন করে। এই রূপ কুশিক্ষার দোষে অধুনা গৃহস্থ বা বাহ্য-সাধু-আচরণ-পরায়ণ গুপ্ত কিম্বা ব্যক্ত অবধূত, অথবা শক্তি-উপাসক-গণের অধিকাংশেরই প্রকৃত সাধনভজন ও জপতপের ছলনায় বিষয়ানন্দবর্দ্ধক কেবল বাহ্য-পঞ্চতত্ত্ব, বিশেষ 'পঞ্চমতত্ত্ব'-সেবারই

যেমন ষোড়শোপচার বিস্তার হইয়া পড়িয়াছে—বৈষ্ণব সাধুদিগেরও অনেকের তেমনই বৈরাগ্য-সাধনার মূলসূত্রই এখন যেন সেবাদাসীর 'মানভঞ্জনে' পরিণত হইয়াছে! আবার উদাসী ও সন্ন্যাসী নামে ত্যাগী সাধুদিগেরও অনেকের অবস্থা এইরূপেই ঘোর কলঙ্ককালিমায় পরিপূর্ণ। তাই নূতন সাধুপন্থীর প্রাথমিক শিক্ষাকাল অনেক সময় স্থল-বিশেষে বিষম বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছে। কুশিক্ষা ও কদাচার সমাজের অন্তর-বাহির বা অস্থি-মজ্জায় এমনভাবে সংক্রমিত হইয়াছে যে, তাহার নিষ্কাশন করা সহসা দুঃসাধ্য বলিয়াই বোধ হইতেছে। তবে লীলাময়ীর লীলারহস্য বুঝিবার শক্তি কাহারই নাই!

যাহা হউক গঙ্গাধরের পূর্ব্বোক্ত সাংসারিক জীবনটা অতি দুঃখ-পূর্ণ হইলেও, বর্ত্তমান অবস্থায় সে বড়ই সৌভাগ্যশালী বলিতে হইবে। সে সদ্‌গুরুর সহায়তায় যে পরে যথেষ্ট আত্মোন্নতি করিতে পারিবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

গঙ্গাধর এখন তাহার গুরুদেব ও সাধুমণ্ডলীর সহিত ক্রমে রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থল ও লীলাভূমি পবিত্র ও প্রসিদ্ধ মুক্তিক্ষেত্র অযোধ্যাপুরী বা দর্শন-নগরী, রামগয়াতীর্থ, বশিষ্ঠাশ্রম, বশিষ্ঠকুণ্ড এবং হনুমানগড় আদি পরিদর্শন করিল। পুণ্যসলিলা সরযূতে স্নানাহ্নিক করিল, তাহার গুরুদেবের আদেশ-ক্রমে এখানে তাহার পিতৃ-পিতামহ এবং মাতামহাদির উদ্দেশে যথাবিহিত তর্পনাদিও সমাপন করিল।

অনন্তর কয়েক দিবস পরে, তাঁহারা সকলে নৈমিষারণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এক সময় যে স্থানে সহস্র সহস্র ঋষি-মুনি একত্র সমাগত হইতেন, পুরাণাদি নানা শাস্ত্র-আলোচনায় যে স্থান সতত

মুখরিত থাকিত, যে পূত অরণ্যানীর পাদমূল বিধৌত করিয়া পুণ্যতোয়া গোমতীগঙ্গা অবিরত ধারায় প্রবাহিত হইয়া, ভাগীরথী-গঙ্গায় সঙ্গম-লাভ করিয়াছেন, সেই সুপবিত্র তটিনীতটে কত কত দিন কত মুনি ঋষি একতানে বেদগান করিয়া গগন পবন প্রতিধ্বনিত করিয়া রাখিতেন, আজ সে অরণ্য যেন শ্মশানসম নিস্তব্ধ, স্থির, গম্ভীর, জনমানবরহিত ও পরিত্যক্ত। সেই নদীগর্ভে স্বচ্ছসলিলদর্পণে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বৈরাগ্যপুষ্ট, তপোনিষ্ঠ মহাজনগণের আর সে পূণ্য-ময় প্রতিবিম্বচ্ছায়া পতিত হয় না, সেই প্রবাহের তরঙ্গভঙ্গে নর্ত্তিত অসংখ্য ফুল-বিল্বদল ও তুলসী-চন্দনসম্পৃক্ত পূজা-নির্ম্মাল্যের সে পবিত্র মাধুরী আর নাই! আছে—কেবল তাঁহাদের স্মৃতি-সম্মান-জড়িত নির্জ্জন কণ্টক-কঙ্করময় সেই অতীত কর্ম্মভূমি,—শ্রীমন্মহর্ষি দধিচী ও শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসের শেষ আশ্রম-চিহ্নস্বরূপ তাঁহাদের আসন-পীঠ,—আর অসঙ্কোচে বিচরণশীল বন্য পশুপক্ষী ও বানরকুল। এতদ্ব্যতীত তাহাদেরই সম-প্রকৃতিবিশিষ্ট অথবা বুঝি তাহা অপেক্ষাও অধিক হীন-প্রকৃতিপুষ্ট যাত্রী-পীড়ক কতিপয় তীর্থ-পুরোহিত-পাণ্ডার বংশধর!

নিতান্তই পরিতাপের বিষয়—অধুনা ভারতের প্রায় সকল তীর্থই এই শ্রেণীর পাণ্ডা-নামধারী অশিক্ষিত ও অত্যাচারী গুণ্ডারদলে যেন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে সনাতন-ধর্ম্মসেবার যে কি বিষম বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে, তাহা ভাবিলেও হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে। তাহাদের হস্তে গৃহস্থ বা সাধু কেহই বিনা-নির্য্যাতনে সহসা নিষ্কৃতি পান না। এক দিন যে সকল তীর্থবাসী ব্রাহ্মণের সদাচারে, তাঁহাদের আদর্শ ও সৌজন্যে, তাঁহাদের উদার অতিথিসেবা ও তীর্থ-মাহাত্ম্য-সূচক সৎব্যবহারে, সকলেই পরিতৃপ্ত হইত—তাহার বিনিময়ে,

তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, তাঁহাদের সেবায় যাহার যেমন সাধ্য, তেমনই প্রণামী আদি প্রদান করিয়া, সকলে তখন কৃতার্থ হইত ; তাঁহারাও অতি সন্তোষপূর্ব্বক সেই যজমান-প্রদত্ত দান গ্রহণ করিয়া, অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ ও শ্রীভগবানের নিকট সকলের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ প্রার্থনা করিতেন।

হায় হায়,—আজ আর সে দিন নাই—আজ সেই স্নেহের পরিবর্ত্তে স্বার্থের পীড়ন, অন্য পক্ষে শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে ভীতির আবির্ভাব হইয়াছে। ভগবন্! আপনিই যে সকল তীর্থেরস্বরূপ, আপনারই কৃপাসংস্পর্শে তীর্থের পূত-মাহাত্ম্য, আজ আপনি কোথায় আত্ম গোপন করিয়া সকলের বিশ্বাস-হীনতার কারণ হইয়াছেন—যুগধর্ম্ম বলিয়া কি এতই নির্দ্দয় হইতে হয়! না না প্রভো! এই তীর্থ-কলঙ্করাশি আর দেখিতে ইচ্ছা হয় না—ইহার প্রতিকার করুন, এই কালিমা-স্তূপ হইতে তীর্থসমূহ বিমুক্ত করুন! ভক্তবৎসল,—আপনি যে যুগে যুগে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ! তবে কি এখনও উহার পরিশুদ্ধির সময় আসে নাই? এখনও কি ঐ দুষ্ট আদর্শহীন স্বার্থপরায়ণ নামধারী-তীর্থপুরোহিতদিগের পাপ-ভার পূর্ণ হয় নাই? ঠাকুর, আর বিলম্ব করিবেন না, তীর্থমাহাত্ম্য রক্ষা করুন, উহাদের অন্তরে সৎ-বুদ্ধি জাগাইয়া দিন, সংসার শান্তিময় করুন—আপনি যে ভক্তাধীন বলিয়া, ভক্তের মানও রক্ষা করেন দেব!

গঙ্গাধর এখানেও অতি শুদ্ধ অন্তরে গুরুমণ্ডলীর সমভিব্যহারে স্নান ও তর্পণাদি সমাপন করিল। পবিত্র চক্রতীর্থে তাহার সকল কৃত্য যথাসাধ্যবিধানে সমাধা করিল। বিশ্বগৌরব ব্যাস-পীঠতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। সত্যবাক্ দয়া ও ত্যাগের অতুলনীয়

আদর্শ বিশালাত্মা মহামুনি দধিচীর আশ্রমতলে প্রণত হইয়া কৃত-কৃতার্থ হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই ঘটনার কাল, বহুদিন অতীত হইয়াছে। তখন নৈমিষারণ্যের রেলপথ হয় নাই। নৈমিষারণ্য নামের অপভ্রংশ "নিম্‌সার" বা "নিম্‌খার" ষ্টেসনের চিন্তামাত্রও সুদূর পরাহত ছিল। সুতরাং তখন তথায় যে আনন্দভাব ছিল, যে সকল প্রাচীন নিম্ববৃক্ষসমাকুল বনভূমির নির্জ্জন গাম্ভীর্য্য বিরাজিত ছিল, এখন তাহার সেই চিহ্ন আর নাই। এখন দিন দিন অন্যান্য তীর্থের ন্যায়ই ধমজন-বিলাসিতাবহুল ইষ্টকাদি-বিনির্ম্মিত গৃহ-অট্টালিকার পীড়নে ক্রমে সেই নৈমিষারণ্যের আরণ্যশোভা, তাপোবন-পবিত্রতা তিরোহিত হইয়াছে। স্থানীয় ব্যক্তিগণও ঘোর স্বার্থপর ও সহরবাসীর অনুকূল কেবল অর্থলোলুপ হইয়া উঠিয়াছে!

আমাদের গঙ্গাধর এইবার সেই সাধুদের সহিত হরিদ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। পথে কত গ্রাম, জনপদ, মন্দির ও মঠাদির নিত্য নব নব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, মনের আনন্দে চলিয়াছে। আজকাল লোকে রেলগাড়ীতে চড়িয়া, যেন এক নিশ্বাসে তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া আসে। তাহাতে তাহাদের না হয় প্রকৃত তীর্থ-দর্শনের বিশেষ কোন আনন্দ, না তাহাদের দেশ-ভ্রমণে পরিতৃপ্তিই হয়! নানা সুখ ও দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতমধ্যে সতত পতিত হইয়া, সেই অপূর্ব্ব আনন্দ-উপভোগসহ বিশেষ কোন জ্ঞানই হয় না। নানা প্রদেশের নগর ও পল্লীবাসী লোকজনের আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, ভাষা ও সাহিত্য আদি কোন বিষয়েরই অনুভব তাহাদের হয় না এবং সেই কারণ তাহাদের তীর্থ-ভ্রমণজনিত কোনরূপ বিশেষ অভিজ্ঞতাও জন্মে না। কাহারও সহিত কোনও পরিচয়, সুখ বা

পরস্পরের মধ্যে কিছুমাত্র ভাবের বিনিময়ও হয় না। কেবল কোন-রূপে "বুড়ি ছুইয়া আসা"র মত নির্দ্দিষ্ট তীর্থ ও আধুনিক বড় বড় সহরের বাহ্য চাকচিক্য দেখিয়া এবং শকুনীবৃত্তিপরায়ণ স্থানীয় পাণ্ডা ও ব্যবসায়ীদিগের উৎপীড়নে, যেন ভাগাড়ে পতিত অর্দ্ধমৃতপ্রায় জীবের ন্যায়—সেই যাত্রিগণ স্ব স্ব ব্যস্ত হইয়া, তথা হইতে পলাইবার মুখে আপনার আত্মীয়-স্বজনের জন্য দুই পাঁচটা জিনিষপত্র, যা'তা' মূল্যে খরিদ করিয়া, সদ্য সদ্য ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিতে পারিলেই, এখনকার তীর্থ-ভ্রমণ যেন সাঙ্গ হয়।

আধুনিক তীর্থ-যাত্রীদের না আছে ধৈর্য্য, না আছে সামান্য সহিষ্ণুতা, না আছে প্রকৃত তীর্থ-ভ্রমণের-সুখ ভোগ করিবার তিলমাত্র ইচ্ছা! অন্তরে শ্রদ্ধা-ভক্তির ছায়ামাত্রও অনেকের মধ্যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভ্রান্ত মোহজালে সকলেই প্রায় এমনই আবদ্ধ যে, দুই দিনমাত্র বাড়ীর পত্রাদি না আসিলে —আর তাঁহাদের রক্ষা নাই, ত্রিভুবন তখন তাঁহাদের আঁধার বলিয়াই বোধ হয়। কাজেই তখনই সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যজ্য— 'তারঘরে' বা 'টেলিগ্রাফ-আফিসে' তাঁহাদের ছুটিতে হয়। তখনই 'জবাবি তারে' বা 'প্রিপেড্ টেলিগ্রামে' সংবাদ না পাইলে, আর অন্ন-গ্রহণ করা চলে না, তাঁহাদের মুখে আর জল উঠে না।

সে কালে কিন্তু ডাকের এত সুবিধা ছিল না, বা তারেরও এত হুড়াহুড়ি ছিল না, আর সংসারী গৃহস্থ হইলেও, বুঝি অন্ধমায়ার বন্ধনেরও এতটা দৃঢ়তা ছিল না। তাঁহারা তীর্থপর্য্যটনে যখন বাহির হইতেন, তখন কিছুদিনের জন্য তাঁহাদের গৃহের ভাবনা, আত্মীয়-স্বজন ও সংসারের কোন চিন্তাই, তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইত না। সংসারের সে মায়া-মোহ, তাঁহারা বোধ হয় তখন

সংসারের গণ্ডীরমধ্যেই অন্যান্য বিষয়ের সহিত ছাড়িয়া বা ফেলিয়া যাইতেন। কেবল নিত্য অভিনব আনন্দে বিভোর হইয়া, সে পথের কত কষ্ট, পদে পদে কত বিঘ্ন, অসময়ে অনায়াসে-প্রাপ্ত যাহা কিছু আহারে, কখনও বা তাহারও অভাবে, অনাহারে থাকিয়াই, যথা তথা শয়ন ও উপবেশন আদি করিতে করিতে, অদম্য উৎসাহে চলিয়াছেন। আর কোনও দিকে যেন লক্ষ্যমাত্র নাই, কেবল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস-সহকারে একাগ্র অন্তরে —কবে কখন যে, সেই অপূর্ব্ব বিগ্রহমূর্ত্তি পরিদর্শন করিতে পারিবেন, অহরহঃ সেই চিন্তা, সেই ভাবনাতেই যেন তাঁহারা নিমগ্ন থাকিতেন। বাস্তবিক তাহাতে তাঁহাদের যে সুখ, সেই অবিরাম দুঃখ-কষ্ট ও ক্লান্তির মধ্যেও যে আনন্দ ও অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন, ভগবানের প্রত্যক্ষস্বরূপ দর্শনসম যে অপার্থিব সুখ অনুভব করিতেন, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যে কল্পনাতেও আনিতে পারিবেন না!

আহা, দিনে দিনে সেই অতি সরল প্রাকৃতিক সুখ কোথায় অন্তর্হিত হইতেছে? তাহার পরিবর্ত্তে নামে সভ্য-ভব্য, পরিধান-পরিচ্ছদে আর লৌকিক বাহ্যাড়ম্বরে, সুধু ক্ষণিক বিলাসিতা ও প্রবঞ্চনা-পরিপুষ্ট তুচ্ছ আত্মপ্রাধান্য-বৃদ্ধিতেই পরিণত হইয়াছে। বৈদেশিক ও বিজাতীয় হীন বৃত্তিগুলিরই অনুকরণে—দেশীয় দীন-দরিদ্র, দুর্ব্বল ও সন্দেহাত্মক কুটিলতাবুদ্ধিতে অনভিজ্ঞ, অতি সরল-প্রাণ ব্যক্তিদিগের প্রতি কেমন হেয় অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যতা প্রদর্শনের প্রবৃত্তিই বর্দ্ধিত হইয়াছে। পথে, ঘাটে, ষ্টেসনে বা যথা-তথায় তাহাদের উপরে অধিকাংশ সময়ে বিনাকারণে অথবা অতি সামান্য কারণেই উৎপীড়ন করিতে পারিলে, যেন আপনাকে

মর্য্যাদাবান বলিয়া, এখন অনেকেই মনে করে। আবার কোনও অধিকতর শক্তিশালীর পাল্লায় পড়িয়া, অথবা কোন হ্যাট্‌ কোট্‌ধারী কটাচর্ম্মীর সম্মুখীন হইয়া, সহসা ভিন্ন পল্লীর সারমেয়ের ন্যায়, যেন নিজ পুচ্ছসঙ্কোচনসহ মনে মনেই তাহাদের পিতৃপিতামহের আদ্যকৃত্য করিতে করিতে, অপূর্ব্ব আত্মসাহসিকতার পরিচয় দিয়া থাকেন। হায় হায় কালের কি বিচিত্র গতি! আজন্ম পরমুখাপেক্ষিতা ও বিজাতীয় হীন অনুকরণ-প্রিয়তার কি ভীষণ পরিণাম!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই সাধুর মণ্ডলী আজ হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাধর তাঁহাদের সঙ্গে প্রথমেই ব্রহ্মকুণ্ডে 'হরকীপেইড়ীর' দর্শন করিল। মনের আনন্দে সেই চিরশান্তিময়ী সুশীতল বাহিনী ও অতিপ্রবল প্রবাহিনী ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে অবগাহন করিল। সেই গঙ্গাতটে বসিয়াই গঙ্গাধর গঙ্গাস্তব ও সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে করিতে যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল। হিমালয়-পর্ব্বতপাদে প্রকৃতির সেই অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিয়া সে যেন বিমোহিত ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া গেল, আর কোন চিন্তাই এখন তাহার অন্তর অধিকার করিতে পারিতেছে না, সে কেবল নির্ণিমেষনেত্রে কখন সেই সমুচ্চপর্ব্বতমালা, কখন বা উপলখণ্ড-বিকীর্ণ সেই অনুচ্চ গঙ্গাগর্ভ, আবার কখন তাহারই পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত গঙ্গার জলস্রোতে প্রতিহত হইয়া কি এক বিচিত্র শ্রুতিমধুর জলকল্লোল অবিশ্রান্ত সমুত্থিত হইতেছে, তাহাই শুনিতে শুনিতে সে বুঝি আজ আত্মহারা হইয়া গেল!

অনন্তর তাহার গুরুদেবের আদেশে এই তীর্থ-নির্দ্দিষ্ট কৃত্যাদি যথাবিধি সমাপণপূর্ব্বক ক্রমে কন্‌খল, দক্ষরাজার যজ্ঞস্থল ও সতীর দেহত্যাগভূমি, চণ্ডীরপাহাড়, সর্ব্বনাথ ও মায়াদেবী আদি সমস্ত পরিদর্শন করিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিল।

এখানে স্বামী বিমলানন্দজীর জনৈক গুরুভাই ও সুহৃদ্ সাধুর একটী আশ্রম আছে, সকলেই সেই স্থানে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছেন। সেই আশ্রমাধিপতি সাধুমহারাজের নাম—স্বামী ত্রিপুরানন্দজী

হইলেও, স্থানীয় সাধারণ লোকজন ও ভক্তমণ্ডলী তাঁহাকে—"বুড়াবাবা" বলিয়াই জানে। তিনি বয়সে খুব প্রাচীন না হইলেও, তাঁহার স্বাভাবিক জীর্ণশীর্ণ ক্ষীণদেহ ও দন্তবিহীন মুখমণ্ডল দেখিলে, তাঁহাকে অতি বৃদ্ধ না বলিয়া পারা যায় না। তিনি সতত অতীব আনন্দপ্রিয়—খুব আমূদে লোক; ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধনভজন ও নানা বিষয়ক অভিজ্ঞতাপূর্ণ বার্ত্তালাপে সদাই সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখেন। তাঁহার নিকট কেহ ছোট বড় বলিয়া নাই, তিনি সকলকেই সমান চক্ষে দেখিতেন।

তাঁহার কয়েক জন শিষ্যও তখন এই আশ্রমে ছিলেন। সকলেই বেশ পণ্ডিত, সাধনপরায়ণ ও উদারচিত্ত। তাহাদের মধ্যে একটী বালকও ছিল, বোধহয় তাহার বয়স ষোল সতের বৎসর হইবে। তাহার নাম মনোহরদাস ব্রহ্মচারী। গঙ্গাধরের সহিত তাহারই বেশী আলাপ-পরিচয় হইতে লাগিল। সেই গঙ্গাধরকে লইয়া এখানের সমস্ত দেখাইয়া শুনাইয়া বেড়ায়, তাহাকে লইয়া এক এক দিন ভিক্ষাতেও বাহির হয়।

এখানে আসিয়া গঙ্গাধর একজন সমবয়সী সঙ্গী পাইয়া অধিকতর আনন্দিত হইয়াছে। মনোহরদাসও তাহার গুরুর অনুরূপ খুব সুরসিক ও বিমল হাস্যপরিহাসপরায়ণ। সে দেখিতেও বেশ সুন্দর, তাহার মুখে হাসি যেন লাগিয়াই আছে। সে যেমন চতুর তেমনই বুদ্ধিমান। কাহাকেও দেখিলে, তাহার মনোভাব সে অতি সহজেই বুঝিয়া লইতে পারে। শাস্ত্রজ্ঞানেও সে নিতান্ত কম নহে; অনেক সময় তাহার অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ ও উন্নত-ক্রিয়াবান গুরুভাইদিগের সহিতও সে যেভাবে দর্শনাদি শাস্ত্রবিষয়ক আলোচনা করে, তাহা শুনিলে সকলকেই বিমোহিত হইতে হয়। তাহার এই বয়সেই সে যেরূপ

অনর্গল সংস্কৃত বা দেবভাষায় বার্ত্তালাপ করে তাহা বাস্তবিক শুনিবার বিষয়! তাহার এক বিশেষত্ব এই যে, সে কিছুতেই কোন সময়ে ভীত হয় না, বেশ বিনয় ও যুক্তির সহিত তাহার অদ্ভুত অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতে সে সর্ব্বদাই সুনিপুণ! গঙ্গাধর তাহার সঙ্গলাভে যিশেষ উপকৃত হইয়াছে। সে তাহাকে 'মনোহর-দা' বা মনোহর দাদা বলিয়া ডাকিত। মনোহরদাসও আপনার ছোট ভাইয়ের মতই তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিত এবং নানা বিষয়ের শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান করিত।

বিমলানন্দজীমহারাজ অনেক দিন পরে এখানে আসিয়াছেন; মনোহরের এইরূপ উন্নতি দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ও তাহাকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিলেন। কথায় কথায় তিনি ত্রিপুরানন্দজীকে তাঁহার প্রধান শিষ্য শ্রীমান্ রাঘবানন্দের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ত্রিপুরানন্দজী বলিলেন, "সে এখন কোন বিশেষ সাধনা-উপলক্ষে হৃষীকেশের দিকে আরও নির্জ্জনপ্রদেশে অবস্থান করিতেছে। বিমলানন্দজী তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, একদিন তাঁহারা হৃষীকেশের দিকে রওনা হইলেন। এখানের অন্যান্য সাধু ও শিষ্যেরা সকলেই আশ্রমে রহিল, কেবল গঙ্গাধরের বিশেষ আগ্রহে মনোহরদাস তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চলিল।

ত্রিপুরানন্দজী সকলকে লইয়া প্রথমে সত্যনারায়ণ-মন্দিরে পৌঁছিলেন, তথায় দর্শনাদি করিয়া পরে হৃষীকেশে যাইয়া 'ঝাড়িতে' গিয়া উঠিলেন। এখান হইতে রাঘবানন্দের কুটীর প্রায় ক্রোশ-খানেক হইবে। তাঁহারা দ্বিতীয় দিনের প্রাতে তথায় পৌঁছিলেন। রাঘবানন্দ নিজ গুরুদেবকে, গুরুসখা বিমলানন্দজীকে ও গুরুভাইদের দেখিয়া ভারি আনন্দ অনুভব করিল, সকলকে যথাযোগ্য পূজা-

প্রণাম ও সম্মান প্রদর্শনে পরিতৃপ্ত করিল, সকলের সহিত কুশল আলাপনের পর ভিক্ষায় বাহির হইয়া যাইল। যথাসময়ে ভিক্ষা লইয়া ফিরিয়া আসিলে, সকলেই ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর বিশ্রামান্তে ত্রিপুরানন্দজী শিষ্য রাঘবানন্দকে যথাপ্রয়োজন উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন ও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, "তোমার এখানে কোন কোনও সময় লোকজনের সমাগম হয়, বিশেষ দুই একজন মায়েরাও আসে, দেখিতে পাই। এটা এখন তোমার পক্ষে খুব ভাল নয়। যত নিঃসঙ্গ হইয়া আপনার কাজ করিতে পার, ততই ভাল।"

রাঘবানন্দ অবনতমস্তকে সমস্ত শ্রবণ করিল ও অতি বিনয়-সহকারে নিবেদন করিল যে, "সাধ্যমত আমি ত নিঃসঙ্গই থাকি, তবে দুই একজন ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করিতে আসিলে, দুই একটা কথা মাত্র কহিয়াই, তাহাদের তখনই বিদায় দিই।"

রাঘবানন্দ সাধনায় অনেকটা উচ্চ-অধিকারী, বেশ শাস্ত্রজ্ঞানী অথচ অল্পভাষী ও বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ। তাহার বয়স প্রায় ৩০।৩২ বৎসর হইবে। তাহার দেহের ব্রহ্মচর্য্যের অমলশ্রী যেন ঢল্-ঢল্ করিতেছে। তাহাকে দেখিলে, সকলেরই শ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছা হয়। ত্রিপুরানন্দজীরও ইহার প্রতি যথেষ্ট বিশ্বাস আছে; তথাপি তাহার ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য তাহাকে উক্তরূপে সাবধান করিয়া দিতেছিলেন। তিনি আবার বলিলেন—"দেখ রাঘবানন্দ, তুমি যাহা বল্লে, সবই সত্য, কিন্তু নিজের মনকে কখনই বিশ্বাস করো না, সে কখন যে কি খেলা খেলায়, তা' বোধ হয় বিধাতারও অপরিজ্ঞাত। তুমি খুব সাবধানে থাক্‌বে, যদিও হৃষীকেশের তপোবন-মধ্যে সে সবের ভয় নেই, তথাপি বলা ত যায় না, কখন্

কি ভাবে কি ঘটনা ঘটে যায়! রাত্রিতে এখানে কাকেও আশ্রয় দিও না। খুব সাবধানে থাক্‌বে।"

রাঘবানন্দ পুনরায় অতি বিনয়-সহকারে বলিল—"বাবা, আপনার আদেশ দাসের শিরোধার্য্য, তবে আপনার আশীর্ব্বাদে বোধ হয়, এ দাসের হৃদয় কতকটা পরিপুষ্ট হয়েছে, অতটা বুদ্ধি-বিপর্য্যয় আর কখনও হবে বলে বোধ হয় না। আপনার এত দিনের শিক্ষাদান কি তবে ব্যর্থ হবে?"

কথাগুলি রাঘবানন্দ অতি বিনয়-সহকারে বলিলেও, তাহাতে অলক্ষ্যে কিছু অভিমান ও সাধনগর্ব্বের ভাব যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাহার গুরুদেবের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি পুনরায় বলিলেন—"তাই ত হওয়া চাই, তবুও বলি, সদাই সাবধানে থাক্‌বে, হাজার হোক্ তোম্‌রা ছেলেমানুষ—প্রাকৃতিক বেগ বড়ই প্রবল; দেশ-কাল-পাত্র ভেদে কখন কখন কত অঘটনও ঘটাইয়া দেয়।"

মনোহরদাস এই সময় গুরুদেবের পার্শ্বেই বসিয়া সব কথা শুনিতেছিল, সহসা যেন সেই সব কথার গূঢ়-মর্ম্ম অবগত হইয়াই, সে সহসা উঠিয়া, তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। গুরুদেব সামান্য হাসিয়া, তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহার পর নানা কথাবার্ত্তায় দিবা অবসানপ্রায় হইলে, সকলে পুনরায় 'ঝাড়িতে' আসিয়া উপনীত হইলেন।

হৃষীকেশের ত্যাগী সাধুসন্ন্যাসীদিগের এই পল্লীরূপ "ঝাড়িটী" অতি চমৎকার স্থান। গঙ্গার ধারে প্রস্তর ও বালুকাময় চড়ার মত এই উন্নত স্থানটী বহুকাল হইতেই সাধুদিগের বাসভূমিরূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। উহার প্রায় তিন দিকেই মা গঙ্গা

যেন ঘিরিয়া রহিয়াছেন, শত শত তৃণ-কুটীরে স্থানটী পরিপূর্ণ, সুবৃহৎ যজ্ঞডুম্বর ও অন্যান্য নানা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃক্ষ এবং লতাদি দ্বারা স্থানটীর স্বাভাবিক আরণ্যভাবও বেশ পরিস্ফুট। নানা দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর—সাধু-সন্ন্যাসীরা তথায় থাকিয়া স্ব স্ব সাধন-ভজনে অনুরত। প্রাতঃকাল ও সায়াহ্ন-সময়ে সেই গঙ্গার ধারে যখন তাঁহারা আপন মনে স্নান-আহ্নিক ও স্তব-স্তুতি পাঠ করিতে থাকেন, আবার যখন তাঁহারা প্রত্যেকে নিশ্চিন্ত হইয়া, শুদ্ধান্তরে ভাগবদ্‌গুণগান করিতে নিরত হন, তখন বাস্তবিক যেন কোন্ অলৌকিক-জগতে আসিয়াছি বলিয়া মনে হয়।

এ স্থানের আর একটী বিশেষ নিয়ম এই যে, এই সাধুপল্লী 'ঝাড়ির' মধ্যে কোন স্ত্রীলোক আসিয়া কোন সময়েই থাকিতে পারিবে না। যদি কোন গৃহস্থ-মহিলা সাধু-দর্শনার্থে এখানে আসিতে ইচ্ছা করেন, তবে দিনের বেলায় যে কোন আত্মীয়-স্বজনের সহিত আসিয়া, পুনরায় সন্ধ্যার পূর্ব্বেই 'ঝাড়ি' ছাড়িয়া তাহাদের বাহিরে চলিয়া যাইতে হইবে। রাত্রিকালে কোন স্ত্রীলোকই এখানে আর থাকিতে পারিবে না। এই দৃঢ়-নিয়ম থাকিবার কারণ, এখানে এ পর্য্যন্ত কোনও ব্যভিচারের সংবাদ শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ভৈরবী ও বৈষ্ণবী আদি কোন স্ত্রী-সাধিকা বা সন্ন্যাসিনী প্রভৃতি কেহই এখানে থাকিতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত ধূমপানাদি কোনও মাদক-সামগ্রীও এ স্থানের মধ্যে কেহ ব্যবহার করিতে পারিবে না। যদি কেহ সেরূপ করে, তবে স্থানীয় প্রবীন সাধুরা তাহা জানিতে পারিলে, তখনই তাহা-দিগকে ঝাড়ি হইতে দূর করিয়া দিবেন।

হৃষীকেশে এই ঝাড়ির আদর্শ—যথার্থই যেমন পবিত্র, তেমনই

মনোরম। প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্য ও পুরাণাদির মধ্যে মুনি-ঋষি-দিগের যে তপোবনের বর্ণনা জানিতে পারা যায়—কলির এই দুর্দ্দিনে ঝাড়ির মধ্যে যেন তাহা প্রত্যক্ষ বলিয়াই মনে হয়। আমরা যখন ঝাড়িতে যাইতাম, তখন যে কি আনন্দ উপভোগ করিতাম, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই!

কতদিন পরে, সে বৎসর (সন ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে) আমরা একবার হৃষীকেশে যাই। শ্রীভরতজীর মন্দিরের মহান্তজীমহারাজের আতিথ্যে তাঁহারই ধর্ম্মশালায় অবস্থান করি। তথায় শ্রীমান্ সত্যান্দতীর্থস্বামী, গিরিজী, সানন্দ, কালিকানন্দ, দুর্গানন্দ ও হরিহরব্রহ্মচারী প্রভৃতি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী যোগী-সাধুদিগের মুখে যাহা শুনিলাম ও স্বচক্ষে যাহা দেখিলাম—তাহাতে ভীষণ মর্ম্মাহত হইলাম।

আহা, সেই পবিত্র সুপ্রাচীন ঝাড়ির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত এবার নয়ন-গোচর হইল না। সেই মহীরুহসমন্বিত অরণ্যানী, সেই অসংখ্য পর্ণকুটীরশোভিত তপোবন, সেই শান্ত সাধুসন্ন্যাসীগণ-পরিপূরিত পবিত্র ঝাড়ি আর নাই! হৃষীকেশের প্রাণ, শোভা ও সৌন্দর্য্যস্বরূপ সেই ঝাড়ি আজ গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। ইহাতে প্রথমে যেরূপ দুঃখ হইয়াছিল, পরে কিন্তু তাহার অবসান হইয়াছে, শুনিলাম—ঝাড়ির সেই পবিত্রতায়, সেই বিধি-নিয়মে, অতি ঘৃণ্য ও বিকৃত পাপকীট ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়াছিল, অশ্রাব্য গুপ্ত কীর্ত্তিকলাপে সেই পবিত্র অঙ্গ আজ ক্রমে কলুষিত হইতেছিল! পতিতোদ্ধারিণী পাপকল্মষবিনাশিনী মা ভাগীরথী গঙ্গা, নিজহৃদয়ের উপর আর তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না, তাই সাধুদিগের কত যুগ-যুগান্তের সেই লীলাভূমি একেবারে বিধৌত করিয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কত শত শত সাধুও মায়ের পবিত্র ক্রোড়ে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন।

সেই সাধুমণ্ডলীর মধ্যে যাহারা বাঁচিয়াছিলেন, তাঁহাদের যত্নে হৃষীকেশে পুনরায় "নূতন ঝাড়ির" প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রাচীনের সেই গাম্ভীর্য্য, সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা তাহাতে নাই। সেরূপ উন্নত সাধুসন্ন্যাসীদিগের প্রভাবও আর পরিদৃষ্ট হয় না।

বহুদিন হইতে এখানের এক বিশেষত্ব ছিল যে, সাধুদিগের অন্ন-চিন্তা করিতে হইত না। এখনও তাহার অভাব নাই, বরং সেরূপ অন্নসত্র বা সদাব্রতের বাহুল্যই হইয়াছে। তাহাতে সকলেই এখানে নিরুপদ্রবে নিত্য ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া, আপন আপন সাধন-ভজন করিতে পারেন। সেই পুরাতন ঝাড়ির সাধুরাও তখন কেহ রন্ধনাদি করিতেন না, সত্র হইতেই তাঁহাদের ভিক্ষা মিলিত। যাঁহারা ঝাড়ির বাহির হইতেন না, অন্যান্য সাধুরা বা তাঁহাদের শিষ্য-সেবকগণ তাঁহাদের ভিক্ষা আনিয়া দিত। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মৌনিও ছিলেন, কেহ কেহ দিগম্বররূপে নগ্ন-অবস্থাতেও থাকিতেন। যাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর মহাত্মা, তাঁহাদের নিকট অনেকেই শিক্ষা-দীক্ষার জন্য সমবেত হইতেন। অধুনা আর সেরূপ ভাবের সমাবেশ দেখিলাম না। দুই চারিজন ব্যতীত অধিকাংশই নামধারী সাধু, সাধন-ভজনে বিশেষ লক্ষ্য অনেকেরই নাই। বাক্‌সর্ব্বস্ব শুষ্ক বেদান্তীর দলই অধিক। বিনা পরিশ্রমলব্ধ সত্রের প্রস্তুত ভিক্ষান্নে বর্ত্তমান সাধু-সমাজের যথেষ্টই অবনতি হইতেছে বলিয়া মনে হয়। এখন কেহ কাহাকেও যেন আর মানিতে চায় না, সকলেই স্ব স্ব প্রধান, সর্ব্বজ্ঞ ও বাঁধা বুক্‌নীবাজীতে একেবারে পরিপক্ক, সাক্ষাৎ পরমহংসসদৃশ শিখাসূত্রহীন মণ্ডিতমস্তক। উহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও দীক্ষাও হয় নাই, "স্বয়ংসিদ্ধ বা স্বয়ংপ্রবুদ্ধ" বলিয়া জানা গেল। আবার কোন কোনও ব্যক্তি এখানে আসিবামাত্রই প্রাথমিক

কোনও প্রকার সাধন-ভজন ব্যতীত, একেবারেই সন্ন্যাস দীক্ষা লইয়াছে।

অধুনা এসকল প্রদেশে সন্ন্যাস-দীক্ষা অতি সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুই চারি টাকা ব্যয় করিলে, বা কিছুদিন তদনুরূপ কোনও স্বয়ম্ভূ গুরুর সেবা করিলেই, অনেকে তাঁহাদের সন্ন্যাস-দীক্ষা দিয়াছেন। অধিকারী-অনধিকারী-বিষয়ে বিচার বা তাহার সাধনাদি প্রাথমিক ক্রিয়াবিধির কোনই প্রয়োজন হয় না। অথবা তাঁহারা যেমন শিক্ষা পাইয়াছেন, তেমনই উপদেশ দেন! কিংবা পাঁচখানা ছাপা-পুথী পড়িয়া, নিজ বিদ্যাবুদ্ধির সাহায্যে যাহা তাঁহারা কল্পনায় স্থির করিয়া লইয়াছেন, তাহাই সকলকে শিক্ষা দেন। আবার গুরুপরম্পরায় লব্ধ গুপ্তসাধন-সঙ্কেত না জানিয়াও, কেহ কেহ যোগাদি-বিষয়ে অশঙ্কিতভাবে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যাহা হউক হৃষীকেশের বর্ত্তমান সাধুসমাজ প্রাচীন মহাপুরুষগণের মাহাত্ম্য যেন বিনষ্ট করিতেই বসিয়াছে!

এইস্থানে 'মায়ীবাড়া' বা 'মায়ীপাড়া' নামে একটী সাধিকাপল্লীও প্রতিষ্ঠিত আছে, তথায় ভারতের নানা দেশীয়া মহিলারা ভিন্ন ভিন্ন কুটীরে অবস্থান করিয়া স্ব স্ব সাধন-ভজন করিয়া থাকেন। পরিতাপের বিষয়, তাঁহারা যে শান্তিলাভের জন্য এখানে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশের মধ্যে যে সে শান্তির লেশমাত্রও নাই, তাহা তাঁহাদের সহিত সামান্য আলাপ পরিচয়েই, অনুভব করিতে পারা যায়। তাঁহারাও সত্র হইতে নিত্য সদাব্রত পাইয়া থাকেন।

সত্রের এইরূপ সুবিধা আছে বলিয়া, অনেকেই এখানে সহসা আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে সাধন-ভজনে আত্মোন্নতি করিব, আশা করে; কিন্তু নিম্নশ্রেণীর বা অপুষ্ট ও মাত্র বেশধারী সাধুদিগের সংসর্গে অল্পদিনের

মধ্যে তাহারাও একেবারে উদ্দেশ্যহারা হইয়া যায়। তখন কেবল পরচর্চ্চা, পরনিন্দা, পরস্পর কলহ ও বৃথা আত্মপ্রাধান্য বৃদ্ধির চেষ্টাই তাহাদের প্রবল হইয়া উঠে। সেই কারণ সাধুদিগের উপর সাধারণতঃ স্থানীয় লোকজনের শ্রদ্ধাভক্তিও যেন আর নাই। সত্রের পরিচালক কর্ম্মকর্ত্তা প্রভৃতিরাও তুচ্ছ নিজ স্বার্থসিদ্ধির ফলে, সাধু-দিগের প্রতি কেমন যেন শ্রদ্ধাহীন। দাতাদিগের প্রদত্ত অর্থ ও সামগ্রীসমূহ গোপনে আত্মসাৎ করিয়া, অতি জঘন্য অন্নব্যঞ্জনাদির দ্বারা প্রায় সাধুদিগের ভিক্ষা প্রস্তুত করে ও লোক-দেখান যত্নপূর্ব্বক অতি অশ্রদ্ধার সহিত সকলকে ভিক্ষান্ন প্রদান করে।

আক্ষেপের বিষয়, সেই প্রাচীন সিদ্ধ-মহাপুরুষগণের অস্তিত্ব বোধ হয় এখানে আর নাই, থাকিলেও তাঁহাদের প্রভাব নাই বলিলেই হয়। নতুবা হৃষীকেশের এই শোচনীয় পরিবর্ত্তন কখনই হইত না!

যাক্ এ সকল কথা; বলিতেছিলাম—সেই প্রাচীন ঝাড়িতে সেকালে বহু কুটীর ছিল, সে সমুদায় কুটীর সাধুরাই ভিক্ষালব্ধ অর্থে নিজে নিজে প্রস্তুত করিয়া লইতেন। সময় সময় সেই সব কুটীরে কোনও সাধু না থাকিলে, এমনই পড়িয়া থাকিত। স্বামী ত্রিপুরানন্দজী প্রভৃতি সেইরূপ কোন কোনও খালি কুটীরে আসিয়া অবস্থান করিলেন। দুই একদিন থাকিবার পর, তিনি মনোহর-দাসকে সঙ্গে লইয়া, কোন কার্য্য উপলক্ষে অন্য কোথাও চলিয়া যাইলেন। অপর সকলে এই ঝাড়িতেই রহিলেন। তিনি বলিয়া যাইলেন—"আমি কাল না হয় পরশ্ব প্রাতেই ফিরিয়া আসিব, তাহার পর সকলে মিলিয়া আশ্রমে ফিরিয়া যাইব।"

গঙ্গাধর কেবল মনোহরদাসের অভাবে একটু ফাঁকা ফাঁকা

বোধ করিতে লাগিল। ছেলেমানুষ নূতন নূতন এমন হইয়াই থাকে, এ ভাবটা অবশ্য ক্রমে আর থাকিবে না।

আজ শেষরাত্রি হইতেই আকাশটা যেন মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে সেই মেঘ যেন ঘনীভূত হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পর যেমন ঝড়, তেমনই মেঘগর্জ্জন ও মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঝাড়ির সাধুরা আপন আপন কুটীরের আবরণ বন্ধ করিয়া লইলেন। বিমলানন্দজীর কুটীরের আবরণ ভাল ছিল না, অবিরত বৃষ্টির ঝাপট্ আসায় ও পুরাতন কুটীরের কোন কোন স্থান হইতে বৃষ্টি পড়ায়, গঙ্গাধরের কিছু অসুবিধা হইতে লাগিল, সে কোনরূপে তাহার মধ্যে নিজের একটু শুইবার স্থান করিয়া লইল।

রাঘবানন্দের কুটীর ঝাড়ি হইতে অনেকটা দূরে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে এবং তথায় অন্য কোন সাধুমহাত্মার আর কুটীরও নাই। সে বেচারা, একা আপন কুটীরের দ্বার ভাল করিয়া ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া লইয়াছেন। সেই দুর্য্যোগে কোথাও কোনও জীবজন্তুর সাড়াশব্দও নাই, সকলেই সুবিধামত কোন নিরাপদ আশ্রয়ে থাকিয়া, কোনরূপে যেন আত্মরক্ষা করিতেছে। এমন সময় কে অতি কাতর হইয়া কম্পিতকণ্ঠে কুটীরের দ্বারে আসিয়া বলিল— "কে আছ বাবা, রক্ষা কর, প্রাণ যায়!"

সেই কাতর স্বর শুনিয়া রাঘবানন্দ তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিতে খুলিতে বলিলেন—"কে—কি হয়েছে?"

তখন আকাশে বিদ্যুৎ চম্‌কাইতেছিল—দ্বার খুলিতেই তিনি দেখিতে পাইলেন—একটী অতিবৃদ্ধা বৃষ্টিতে ভিজিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁড়াইয়া আছেন, তাহার সঙ্গে একটী পরমাসুন্দরী ষোড়শী যুবতী, সেটীও ভিজিয়া যেন জড়সড় হইয়া গিয়াছে।

বৃদ্ধা বলিলেন—"বাবাজী, যদি একটু স্থান দাও, তবে আমার এই নাতনীটীকে নিয়ে এ যাত্রা রক্ষা পাই। আমরা হৃষীকেশে এসেছিলাম, হরিদ্বারে যাব' বলে সেই বৈকালেই বা'র হইছি, কিন্তু এই ঝড়বৃষ্টির দরুণ, আর এই অন্ধকারে পথ হারিয়ে, কত কাঁটা খোঁচা পাথর বনের মধ্যে দিয়ে, কত ঠোকর খেতে খেতে, কোথায় যে এসেছি বাবা, তার ঠিক নেই! জনশূন্য এই বনের মধ্যে এই কুটীরটী দেখে, আমাদের মনে ভারি ভরসা হয়েছে। হ্যাঁ বাবা, এ কোথায় আম্‌রা এসেছি ?"

বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর অতি ভয়-বিজড়িত, তাহার উপর বোধ হয়, তাঁহার একটীও দাঁত নাই, সকল কথাই অতি অস্পষ্ট। রাঘবানন্দ বৃদ্ধার এই দুরবস্থা দেখিয়া, বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কি যে উত্তর দিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া, কিয়ৎক্ষণ যেন স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। বৃদ্ধা দীর্ঘনিঃশ্বাস লইয়া, আবার বলিলেন—"কি বাবাজী চুপ করে রইলে যে? আমাদের একটু আশ্রয় দাও, আমাদের একটা উপায় কর, আমাদের প্রাণ বাঁচাও, আমরা আজ সম্পূর্ণ অনাশ্রয়, হায় হায়, আজ কি কুক্ষণেই যে বার হয়েছিলাম! হা ভগবান!"

রাঘবানন্দ এতক্ষণ অবাক্ হইয়া কি ভাবিতে ভাবিতে, তাঁহার কুটীরের দ্বারেই দাঁড়াইয়াছিলেন। বৃদ্ধার এই আক্ষেপপূর্ণ কথায় বলিলেন—"তা অত ভাব্‌চো কেন মা, এইখানেই খানিকক্ষণ বস, একটু পরেই আকাশ বেশ ছেড়ে যাবে, তখন আবার চলে যেও।"

তিনি এই বলিয়া তাড়াতাড়ি কুটীরের মধ্যে যাইয়া, ধুনির ধারে একখানি কম্বল পাতিয়া দিলেন ও ধুনিতে দুই এক খানা

কাষ্ঠ ঠেলিয়া দিয়া, অগ্নি জ্বালাইয়া দিলেন। তাঁহাদের সেই ধুনির পার্শ্বে আগুনের ধারে কম্বলের উপর বসিতে বলিলেন।

বৃদ্ধা নাতনীর হাতটী ধরিয়া, অবিলম্বে ধুনির ধারে যাইয়া বসিলেন ও কতই যেন আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন—"আঃ বাবাজী, আজ আমাদের বাঁচালে, আপনি সাধু—আপনাদের অশেষ দয়া! আপনারা আছেন বলেই—এখনও চন্দর সূয্যি উঠ্‌ছে।"

বৃদ্ধা অগ্নিতাপে যেন অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া পুনরায় বলিলেন—"বাবা, আজ এই ভয়ানক রাত্রিতে আর কোথায় যাব বাবা, ঘুরে ঘুরে ছুটে ছুটে হাক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যদি এতই দয়া কর্‌লেন, তবে রাতটুকু কোনরকমে এইখানেই কাটাতে দাও বাবা, ভগবান তোমার আরও উন্নতি কর্‌বেন, তোমার সাধনা সফল কর্‌বেন বাবা।"

রাঘবানন্দ বলিলেন—"মা এখানে ত কোন মেয়ে-ছেলের থাকবার নিয়ম নেই—বিশেষ আমার গুরুদেবের নিষেধ-আজ্ঞা আছে যে, রাত্রিতে এখানে কাহাকেও আশ্রয় দেবে না। মা, গুরুর আদেশ আমি কখনই অবহেলা কর্‌তে পার্‌ব না, তাঁর আজ্ঞা আমায় পালন কর্‌তেই হবে। তোমরা আরও একটু বিশ্রাম করে, অন্যত্র চলে যাও। আর এখনও রাত্রি বেশী হয় নি। আমি সিধা পথ দেখিয়ে দেবো, নিকটেই গ্রাম আছে, সেখানে কোন গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়ে থেকো।"

বৃদ্ধা—"না বাবা, আজ আর আমাদের তাড়িও না বাবা, আমরা তোমার কুঁড়ের ধারে, কোনও রকমে রাত্‌টা কাটাবো, ভোর হলেই আমরা চলে যাবো—ঐ দেখ বাবা, এখনও আকাশের কি ভয়ানক

ঘোর-ঘটা, কি ভয়ানক অন্ধকার, কি ঝড়! রক্ষাকর বাবা, বাঁচাও বাবা, তোমার খুব পুণ্যি হবে বাবা।”

রাঘবানন্দ—“না মা, আমি এখানে কিছুতেই রাত্রিতে থাক্‌তে দেব না। তোমরা নিতান্ত ক্লান্ত হয়েছ বলেই, আমি তোমাদের এখানে বস্‌তে দিয়েছি, নতুবা অন্য সময় হলে, আমি বস্‌তেও দিতাম না।”

এতক্ষণ সেই মেয়েটী কোন কথাই বলে নাই। এইবার যেন সে অতি কষ্টে অতিক্ষীণ কণ্ঠে বলিল—“এই কি সাধুর ধর্ম্ম? অনাথা, বিপদগ্রস্তা, আশ্রয়হীনা, অবলা আশ্রিতাকে এই দুর্য্যোগের সময়ে এমনি করে কি দূর করে দিতে হয়? আপনার শরীরে কি রক্ত মাংস নেই? পবিত্র সাধুর হৃদয় পাথরের চেয়েও কঠিন নাকি! আপনি আমাদের এই দুরবস্থা দেখেও, এখনও কি করে যে, অন্যত্র যেতে বল্‌চেন্—তা আমি ত কিছুতেই বুঝ্‌তে পাচ্চি না। আমার এই বয়স্, এখন এই রাত্রিতে কার বাড়ীতে যাব’ বলুন্ দেখি? কে কেমন লোক, কি করে তা জান্‌বো? ভগবানের কৃপায় আপনার মত সাধু-মহাপুরুষের আশ্রয়ে আমরা নির্ভাবনায় থাক্‌তে পাব বলে, বড় আশা করেছি—আপ্‌নি কি বলে, আমাদের তাড়াবেন বলুন দেখি?”

এই সময় ধুনির আগুনটাও বেশ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কুটীরের মধ্যে আর অন্ধকার নাই, সেই আলোকে স্পষ্টভাবে পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পাইল। ষোড়শীর সেই যুক্তিপূর্ণ কথায় রাঘবানন্দ প্রথমটা কিছুই যেন উত্তর দিতে পারিলেন না। যুবতী পুনরায় বলিল—“কি ঠাকুর, দয়া কি হবে না? আমাদের এই রাত্রিতে দূর করে দিলে যে, আপ্‌নি নিশ্চয়ই নারীহত্যার পাতকী হবেন—তা কি একবারও ভাব্‌চেন্ না?”

বৃদ্ধা বলিলেন—"বাবা, না হয় ঐ কুটীরটার মধ্যে আজ আমাদের থাকতে দাও। ওটী কি তোমার রসুইঘর বাবা ?"

রাঘবানন্দঃ—"হ্যাঁ মা, ওটী আমার রান্নাঘরই বটে। কিন্তু আমার গুরুর নিষেধ আজ্ঞা—আমি কিছুতেই তোমাদের রাত্রিতে এখানে থাকতে দিতে পারি না।"

যুবতী তখন যেন অধিকতর কাতর হইয়া, পুনরায় বলিল—"ভগবান !" তাহার পর বৃদ্ধার হাত ধরিয়া বলিল—"চল, তবে যা' আমাদের অদৃষ্টে আছে, তাই হবে, আর বেশী রাত করে লাভ কি ?"

এই সময় সে কেমন যেন একটু মুচ্‌কি হাসিয়া, রাঘবানন্দের দিকে কি এক ভাবে কটাক্ষ করিয়া, বলিল—"একান্তই আমাদের যেতে হবে ?"

রাঘবানন্দের মুখে যেন কোন কথাই নাই, তিনি চিন্তাভারে যেন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়প্রায় হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে, তিনি বৃদ্ধাকে বলিলেন—"মা, তোমরা আজ রাত্রিটা ঐ রান্নাঘরে থাক্‌বে বল্‌ছ, তাই না হয় থাক। কিন্তু খুব সাবধান, দরজাটা ভিতর দিক হতে ভাল করে বেঁধে নিও, জঙ্গল জায়গা, হিংস্র জীব-জন্তুরও উপদ্রব আছে।"

এই কথা শুনিয়াই বৃদ্ধার দেহে যেন পুনরায় প্রাণসঞ্চার হইল। বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি বলিলেন—"তা বাবা, আমরা খুব ভাল করে ভেতর থেকে বেঁধে রাখ্‌বো, কিছুতেই কোন জীবজন্তু উপদ্রব কর্‌তে পার্‌বে না। আর ভগবানই রক্ষা কর্‌বেন।"

রাঘবানন্দ তাহাদের সেই সম্মুখের কুটীরঘরে যাইতে বলিলেন ও এক টুকরা মজবুৎ দড়ি তাহাদের হাতে দিয়া বলিলেন—"দেখ,

এই দড়িটা দিয়ে ভিতর হতে দরজা বেঁধে রাখ্‌বে; আর দেখ, এখানে এক অতি দুষ্ট ও ভয়ানক ব্রহ্মদৈত্য আছে, সে অনেক সময় নানা রকম রূপ ধরে, নানা লোকের মত ভিন্ন কণ্ঠে কথা কয়, কখন কখন আমারই হুবহু রূপ ধরে আমারই কণ্ঠস্বরের ঠিক নকল করে, কত বলে, কত কাণ্ডকারখানা করে। তোমাদের কোন ভয় নেই, আমি এই ঘরের চারিদিকে গণ্ডী দিয়ে দিচ্চি। সে আর কিছুই কর্‌তে পার্‌বে না। যদি সে তোমাদেরকে কিছু ভয় দেখায়, আমার রূপ ধরে, আমার মত কণ্ঠে কুটীরদ্বার খুলে দিতে বলে, তোমরা ভুলেও খুল্‌বে না; খুব সাবধান, তাহলে তোমাদের কোন বিপদ হবে না। নতুবা নিশ্চয়ই কোন না কোন বিপদ হবার সম্ভাবনা। ভুলো না, যাও মা, কুটীর বন্ধ করে নাও।”

তাহারা যাইলে রাঘবানন্দও নিজের কুটীরদ্বার বন্ধ করিয়া লইলেন, কিন্তু কি যেন কি চিন্তায় বিচলিত হইয়া, ঘন ঘন শ্রীগুরু-পাদুকা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি যেন ভীত, ত্রস্ত ও অতীব চঞ্চলচিত্ত হইলেন। এমন ভীষণ দুর্ভাবনা ও চিত্তবৈকল্য তাঁহার জীবনে কোন দিন মুহূর্ত্তমাত্রের জন্যও হয় নাই। তিনি পুনঃ পুনঃ শ্রীগুরুচরণ স্মরণ করিয়া, ভয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ক্রমাগত নিদ্রিত হইবার জন্য চেষ্টা করিলেও, কিছুতেই নিদ্রা আসিল না, সাধন-ক্রিয়াতেও ঠিক চিত্ত স্থির করিয়া অধিকক্ষণ বসিতে পারিলেন না, বেচারা তখন যেন অস্থির হইয়া পড়িলেন।

কিয়ৎপরে সেই প্রলয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টি কমিয়া গেল, গগনমণ্ডল পুনরায় মেঘমুক্ত হইল, কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীর রাত্রি; সুতরাং স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় চারিদিক যেন পুলকিত হইয়া উঠিল। অতিশয় ভীতা ও পরিশ্রান্তা বৃদ্ধা নাত্‌নীকে লইয়া, নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।

রাত্রিশেষে, বোধ হয় তিনটার পর হইবে, সহসা তাঁহাদের কুটীরদ্বারে কে আঘাত করিল, অতি ধীরে ধীরে বলিল—"কেমন, তোমাদের কোন নিদ্রার ব্যাঘাত হয় নাই ত?"

বৃদ্ধা শশঙ্কিতে বলিলেন—"কে গা, আমরা বেশ আছি।"

কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ, পুনরায় সেইরূপ অনুচ্চকণ্ঠে ঠিক রাঘবানন্দের স্বরে উক্ত হইল—"তবে আর ভয় নেই, দ্বার খুলে দাও, আমি এসেছি।"

বৃদ্ধা সাধুর কথিত সেই ব্রহ্মদৈত্যের কথা স্মরণ করিয়া, যেন ভয়ে জড়সড়, তাঁহার মুখে আর কথাটী নাই, তিনি নিস্তব্ধ হইয়া, বুঝি পড়িয়া বা বসিয়াই আছেন। ক্রমে দ্বার খুলিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ হইতে লাগিল। বৃদ্ধা তখন যেন অতি সাহসভরে বলিলেন—"না আমরা সাধুবাবার মুখে সব শুনেছি, তুমি ব্রহ্মদৈত্য বাবা, আমরা এ রাত্রিতে আর দ্বার খুল্‌বো না, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর।"

তখন বাহির হইতে নানা প্রকারের অনুনয় বিনয়সহকারে দ্বার খুলিবার জন্য অনুরোধ হইতে লাগিল। তিনি যে "ব্রহ্মদৈত্য নন্, স্বয়ং সেই ব্রহ্মচারী বাবা", এই কথা তিনি পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু বৃদ্ধা সেকথায় কিছুতেই কর্ণপাত করিবার পাত্র নহেন, তিনি কিছুতেই কুটীরের দ্বার খুলিলেন না। তখন বাহির হইতে ক্রমে ক্রোধপূর্ণ স্বরে, নানাবিধ তাড়নাসহ, দ্বার খুলিবার জন্য ভীতিপ্রদর্শন ও অবিরত উপদ্রব হইতে লাগিল। বৃদ্ধা কিন্তু অটল অচল! কিছুতেই ভিতর হইতে দ্বার খুলিলেন না। এইভাবে রাত্রিও প্রায় শেষ হইয়া আসিল; তখন অগত্যা যেন উন্মাদের ন্যায় বাহির হইতেই, সেই দ্বারটী খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা

আরম্ভ হইল। আর রক্ষা নাই দেখিয়া, তখন বৃদ্ধা যেন কণ্ঠস্বর বদলাইয়া কিঞ্চিৎ কঠোর স্বরে বলিলেন—"আচ্ছা একটু অপেক্ষা কর, দ্বার খুল্‌ছি।"

সেই স্বর শুনিয়াই রাঘবানন্দের মস্তিষ্ক যেন কিরূপ বিবশ হইয়া গেল। এদিকে ঊষার আলোকে চারিদিক তখন বেশ পরিষ্কার হইয়াছে, সবই দেখা যাইতেছে। বৃদ্ধা দ্বার খুলিয়াই, সম্মুখে সেই ব্রহ্মদৈত্যরূপী রাঘবানন্দকে দেখিয়া, তাঁহার গণ্ডদেশে একটী চপেটাঘাত করিলেন—আর বলিলেন,—"কেমন বাবা, বলিয়াছিলাম না, রাত্রিতে কিছুতেই কাহাকেও আশ্রয় দিও না! স্থান, কাল, পাত্র বা অবসর হইলে—মুনিরও মতিভ্রম হয়, ব্রহ্মারও মাথার ঠিক থাকে না! তুমি ত কলির জীব, নবীন যুবাপুরুষ, দুদিনের সাধনাভিমান, তোমার সাধ্য কি, এমন অবস্থায় প্রাকৃতিক-বেগ সহ্য করিতে পার? তবে তোমার যথেষ্ট সাবধানতা ও আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখে, আমি যথার্থই সন্তুষ্ট হয়েছি কিন্তু দেখলে ত, এত চেষ্টাও তোমার সবই পণ্ড আর ব্যর্থ হতে বসেছিল।"

ইতোমধ্যে সেই যুবতীও বাহিরে আসিয়া, হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া ফেলিল ও বৃদ্ধার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল, পরে রাঘবানন্দকেও প্রণাম করিয়া, তাহার চরণধূলি লইল রাঘবানন্দ তখন লজ্জায় ও আত্মগ্লানিতে কাঁপিতে কাঁপিতে বৃদ্ধাবেশীর চরণে পতিত হইয়া, বালকের মত হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি তখন আদর করিয়া রাঘবানন্দের হাত ধরিয়া উঠাইলেন ও বার বার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পার্শ্বস্থিত সেই যুবতীবেশীকে বলিলেন—"মনোহর,

যাও, রাঘবানন্দের কমণ্ডলুটী আন, তোমার দাদার মুখ হাত ধুইয়ে দাও।”

রাঘবানন্দের সে দিনকার অভিমান ও অস্ফুট সাধনদর্পের কথা শুনিয়াই তাঁহার গুরুদেব ত্রিপুরানন্দ স্বামিজী ভাবিয়াছিলেন যে, শিষ্যকে একটু রকমারি শিক্ষা দিতে হইবে। মনোহরদাসও গুরুদেবের সেভাব তখনই বুঝিয়াছিল। তাই সেই সময় সে সহসা উঠিয়া, তাহার গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়াছিল। অনন্তর সেই দিন হইতেই, তাঁহারা পরামর্শ করিয়া, তাহার উদ্‌যোগ আয়োজন ও অবসর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। গত দিবস সেই কারণেই তাঁহারা ঝাড়ির কুটীর হইতে বাহির হইয়া আসেন ও যথাযথ পরিচ্ছদ দ্বারা বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া, সেই দুর্য্যোগের মধ্যে বৃদ্ধা পিতামহী ও যুবতী নাত্‌নীর বেশে রাঘবানন্দের কুটীরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হন্। তাঁহারা এমন নিপুণতা ও সাবধানতার সহিত এই অভিনয়-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে, রাঘবানন্দ কিছুতেই তাহা ধরিতে পারেন নাই। অপিচ মনোহরদাসের হাব-ভাবপূর্ণ ও কটাক্ষময়ী যুবতী-লীলায়, দৃঢ়হৃদয় রাঘবানন্দেরও সামান্য চিত্তচাঞ্চল্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পক্ষান্তরে রাঘবানন্দও, এই ব্যাপারে পাছে তাঁহার কোনওরূপ প্রমাদ উপস্থিত হয়, তিনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন, এই কারণ তিনি পূর্ব্ব হইতেই সম্পূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া ছিলেন—তাঁহাদের কুটীরদ্বার ভিতর হইতে বাঁধিয়া বন্ধ করিবার জন্য দড়ি দিয়াছিলেন, তাঁহাদের ব্রহ্মদৈত্যের ভয় দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর ও পরিচয় পাইয়া, যদি তাঁহারা সরলান্তরেই দ্বার খুলিয়া দেন, সেকারণ ব্রহ্মদৈত্যের অলৌকিক মায়া ও শক্তির কথা অর্থাৎ ঠিক তাঁহারই মত রূপ ও

স্বর নকল করিবার কথাও তাঁহাদের বলিয়া, সব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। হয় ত তাঁহার মোহ-বিপর্য্যয়ে পরে নানারূপ উপদ্রব করিয়াও ফেলেন—এইসব ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া, প্রকৃত সাধুপ্রকৃতি রাঘবানন্দ পূর্ব্ব হইতেই যথেষ্টরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার এতাধিক সাবধানতা দেখিয়াই—তাঁহার গুরুদেব তাই তখন আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

ক্রমে বেলা হইতে লাগিল—তাঁহারা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, ভিক্ষার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্নে ত্রিপুরানন্দজী রাঘবানন্দকে আরও অনেক কথা বুঝাইয়া বলিলেন। রাঘবানন্দ আজ লজ্জায় আর মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না। সায়াহ্নে তাঁহারা ঝাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন। বিমলানন্দজী ও আর আর সকলেই তাঁহাদের মুখে এই লীলার কথা শুনিয়া, চমৎকৃত ও আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বালক গঙ্গাধরও অবাক্ হইয়া সকল কথা শুনিল। তাহার সুকুমার হৃদয়ের মধ্যে এই অপূর্ব্ব উপদেশ যেন অতি গভীরভাবে প্রস্তরে খোদিতবৎ হইয়া গেল।

দর্পহারী ভগবান কাহারই কোন দর্প রাখেন না, সময় পাইলেই চূর্ণ করিয়া দেন। এ সংসারে কাহারই শক্তি-সামর্থ্য ও বিদ্যা-জ্ঞান আদি কোন বিষয়েই দর্প বা অভিমান করিবার কিছু নাই। সর্ব্বদা অতি কুণ্ঠিতভাবে 'তাঁহাতে' আত্মসমর্পণ করিয়া, নিজ প্রারব্ধ-কর্ম্ম-সমূহ সাঙ্গ করিয়া যাইতে হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, গঙ্গাধর তাহার গুরুদেবের সহিত আরও কত দেশ ও তীর্থাদি পরিভ্রমণ করিয়াছে, সম্প্রতি সে একাই প্রয়াগের নিকটস্থিত তাহার গুরু-দেবের আশ্রমে আছে। তাহার গুরুদেব সম্প্রতি তাহাকে আশ্রমে রাখিয়া কৈলাস ও মানসরোবরের দিকে যাত্রা করিয়াছেন। সে দুর্গম পথে বালক গঙ্গাধরকে লইয়া যাইতে তিনি সাহস করেন নাই। তিনি কতদিনে যে ফিরিয়া আসিবেন, তাহার কোনই ঠিক নাই। গঙ্গাধর এখন একাই বেশ থাকিতে পারে, আর ভীত হয় না। কখন কখন দুই একজন বাহিরের সাধুও আশ্রমে আসিয়া থাকেন। সে নিজে নিজেই এখন ভিক্ষা করিয়া আনে, নিত্য শ্রীগুরু-নির্দ্দিষ্ট সাধন-ভজন ও আপনার পাঠ্যপুস্তক আলোচনা করে; বেশ নিশ্চিন্ত-মনে সে এখন দিনযাপন করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে ক্রমে দুই মাস, চারি মাস, ছয় মাস কাটিয়া, বৎসরকালও অতিবাহিত হইয়া গেল, তাহার গুরুদেবের কোনও সংবাদ না পাইয়া ক্রমেই সে একটু চিন্তিত হইতে লাগিল। তিনি যে কোথায় কি ভাবে আছেন, তাহার কোনও সংবাদ নাই, তাঁহার কোন ঠিকানাও জানা নাই যে, পত্র দ্বারা তাঁহার সংবাদ জানিতে পারিবে। সমাগত সাধুদের মধ্যেও সময় সময় জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহার কোনও সংবাদ পাইল না। ক্রমেই তাহার দুশ্চিন্তা বাড়িতে লাগিল।

মাঘ মাস পড়িয়াছে, আজকাল প্রয়াগে মাঘমেলা আরম্ভ হইয়াছে। বহু তীর্থযাত্রীতে প্রয়াগতীর্থ পরিপূর্ণ। কত সাধু-সন্ন্যাসী ও গৃহস্থগণ এই সময় প্রয়াগে এক মাসকাল কল্পবাস করেন। গঙ্গাধর সেই সাধুদিগের নিকট যাইয়া, তাহার গুরুদেবের কোনও সংবাদ পাইবার আশায়, সকাল সন্ধ্যা নিত্য ঘুরিয়া বেড়ায়।

এক দিন সন্ধ্যার সময় গঙ্গারঘাটে সে বেড়াইতে বেড়াইতে দূরে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইল। তাহাকে দেখিয়া একবার তাহার দিকে অগ্রসর হইল, আবার ফিরিয়া কিছু দূর অন্যদিকে চলিয়া যাইল—পুনরায় কি ভাবিয়া তাহার নিকট আসিয়া বলিল—"দিদিমা, কেমন আছ? আমায় চিন্‌তে পার?"

বৃদ্ধা প্রথমটা একটু ইতস্ততঃ করিয়া, পরে বলিল—"কে গঙ্গাধর! আহা, কেমন আছিস্ বাবা? তুই সাধু হয়ে গেছিস্! তোর মামা, তোর জন্যে ভারি মনোকষ্টে আছে, কত খোঁজ কর্‌ছে, কোথাও তোর সন্ধান কর্‌তে পারে নি। চল্ বাবা, একবার চল্, তোকে দেখ্‌তে পেলে, তারা ভারি খুসী হবে।"

বৃদ্ধা রায়পুরের চন্দ্রনাথবাবুর প্রতিবাসী, একজন প্রজার বিধবা-পত্নী, সে জাতিতে সদ্‌গোপ্। মাঘ মাসে প্রয়াগে স্নান করিতে আসিয়াছিল, সঙ্গে গ্রামবাসী আরও তিন চারিটী স্ত্রীলোক আছে। সকলেই এক "সেথো-পাণ্ডার" সঙ্গে আসিয়াছে। এই বৃদ্ধা, গঙ্গাধরের মাকে কোলে-পিঠে করিয়া, নিজের মেয়েটীর মত মানুষ করিয়াছিল, তাই নন্দরাণী ইহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিত। গঙ্গাধর সেই সম্পর্কেই ইহাকে 'দিদিমা' বলে। বৃদ্ধাকে এই স্থানে বসাইয়া, তাহার সঙ্গীরা অন্যত্র কার্য্যান্তরে গিয়াছে। গঙ্গাধর তাড়াতাড়ি মামার-বাড়ীর ও

গ্রামবাসীর প্রায় সকলেরই যথাসম্ভব সংবাদ লইল, কিন্তু সে নিজের আশ্রমের পরিচয় আদি কোন কথাই বলিল না, তবে সে যে আর রায়পুরে যাইবে না, বৃদ্ধাকে সেই কথাটী বলিয়া, সত্বর মেলার ভিড়ের মধ্যে সরিয়া পড়িল, বৃদ্ধা আর তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিল না।

গঙ্গাধর বৃদ্ধার মুখে অবগত হইয়াছিল যে, তাহার মামারবাড়ীর সকলে ভালই আছে। তাহার সতীশদাদার অত্যাচারে পাড়ার সকলে অস্থির, সে আর স্কুলে যায় না, তাহার একটী ছোট ভাই গত বৎসরে মারা গিয়াছে। তাহার মামা সাংসারিক অশান্তিতে যেন সদাই বিমর্ষ, ক্রমে তিনি দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছেন। গঙ্গাধর আশ্রমে আসিয়া শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার শান্তি ও স্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করিল। তাহার সতীশদাদার জন্য একটু দুঃখ হইল, কি আর করিবে? কিন্তু সে মামীমার কথা স্মরণ করিয়া, সহসা যেন কাঁপিয়া উঠিল!

দুই চারি দিন যায়, সে সাবধানেই ঘাটে যাইয়া, স্নানাদি সমাপন করিয়া আসে। সাধুদের নিকট তাহার গুরুদেবের সংবাদ লইতে নিত্যই যত্ন করে। এক দিন এক অপরিচিত সাধুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়, তিনি আশ্রমের দিকেই আসিতেছিলেন। তাঁহার মুখেই তাহার গুরুদেবের যে সংবাদ পাইল, তাহাতে সে একেবারে বিচলিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তিনি তখনই তাহার মুখে জল সিঞ্চনাদি দ্বারা তাহাকে সুস্থ ও সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন—"তাহার গুরুদেব বিমলানন্দজীর সহিত তিনিও হরিদ্বার হইতে একত্র 'মানসরোবর' ও 'কৈলাসাদি' দুর্গম হিমতীর্থসমূহ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এই আশ্রমের বিষয় ও তোমার কথা, তিনি

সমস্তই আমাকে বলিয়াছিলেন। আমরা অতীব আনন্দেই সর্ব্বদা একত্র থাকিতাম, তাঁহার সহিত সৎসঙ্গে আমি যেমন আনন্দে থাকিতাম, তেমনই অনেক নূতন বিষয় তাঁহার নিকট শিক্ষালাভও করিয়াছি, তিনি যথার্থই মহাপুরুষ ছিলেন। আমরা কৈলাস প্রদক্ষিণ করিয়া, যখন এদিকে ফিরিব মনে করিতেছি, সেই সময় তিনি বলিলেন—"এমন পবিত্র স্থান আর পরিত্যাগ করিয়া আমার যাইতে ইচ্ছা হয় না। তোমরা যাও।" যে কথা সেই কাজ—সঙ্গে সঙ্গেই তিনি একটী মনোরম স্থানে বসিয়া পড়িলেন ও পরমানন্দে তথায় সমাধিলাভ করিলেন। তিনি স্থূল-দেহ ত্যাগ করিয়া, অনায়াসেই ব্রহ্মীভূত হইলেন। আমরা যথাবিধি সমারোহে তাঁহার সেই পবিত্র দেহের অন্তিম অনুষ্ঠান সমাপন করিলাম।"

বালক গঙ্গাধর, তাঁহার যত্নে ও সান্ত্বনা-বাক্যে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে, আশ্রমে যাইয়া শয়ন করিল। তাহার নয়নে আজ অবিরত অশ্রু-ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে রাত্রি সে আর জলবিন্দুও স্পর্শ করিল না। সেই সাধুটী তাহাকে আশ্রম পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াই, অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। ঘটনাচক্রে সে দিবস আশ্রমে অন্য কোনও সাধুর সমাগম না হওয়ায়, সে একাই পড়িয়া পড়িয়া কত চিন্তা করিতে লাগিল, সামান্য তন্দ্রা আসিলেই, কত স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। সে যেন দেখিল—তাহার গুরুদেব আসিয়া তাহাকে কত সান্ত্বনা করিতেছেন, কত আদর করিতেছেন,—বলিতেছেন—"শ্রীভগবান তোমায় সদাই ভাল বাস্‌বেন, আমিও তোমায় ভালবাস্‌বো, তোমার কোনও চিন্তা নাই, তোমার কোনও কষ্ট হবে না।" সে সহসা তন্দ্রাভঙ্গে চাহিয়া দেখিল—কৈ, গুরুদেব কোথায়? চারিদিকে অনুসন্ধান করিল, তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, আবার শয়ন করিল।

আবার কত স্বপ্ন, কত ভীতি, কত শান্তি, কত সান্ত্বনা, কত অদ্ভুত ও বিচিত্র ঘটনা সে যেন প্রত্যক্ষ পরিদর্শন করিতে লাগিল।

সে সেইভাবে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না। তখন প্রায় ভোর হইয়াছে, সে উঠিয়া গঙ্গার ধারে চলিয়া গেল, তথায় স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য কোনরূপে সম্পন্ন করিল। অনন্তর যখন সে আশ্রমে ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল—তাহার 'মনোহরদাদা' তথায় আসিয়াছে, কিন্তু সে বড়ই অসুস্থ, ভারি দুর্ব্বল, তাহার যেন নড়িবার শক্তি নাই। সে অতি ক্ষীণস্বরে বলিল—"ভাই গঙ্গাধর, আমি এবার মরে বেঁচেছি, কথা বল্‌তে পার্‌ছি না, একটু জল দাও।" গঙ্গাধর ব্যস্ত হইয়া, তাহার হস্তস্থিত কমণ্ডলু হইতে তাহার মুখে জল দিল, তাহার পর তাহাকে প্রণাম করিয়া, তাহার শয়নের জন্য ভাল করিয়া কম্বলাদি বিছাইয়া দিল। মনোহর তাহাতে উঠিয়া শয়ন করিল ও কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর, বলিল—"ভাই আমি কাশিতে একাই এসেছিলাম, হঠাৎ ভেদ্‌বমি হয়, একজন মহাত্মা দয়া করে আমার রীতিমত চিকিৎসা ও যত্ন শুশ্রূষা করে' আমায় বাঁচিয়েছেন। পাঁচ ছয় দিন থেকে একটু ভাল আছি, পথ্যও করেছি, তোমার কাছে আস্‌বার ভারি ইচ্ছা হওয়ায়, তাঁহারই চেষ্টায় প্রয়াগযাত্রীদের একখানা গরুর গাড়ীতে এখানে আজ ভোরে এসেছি, তাদেরই লোক জন এখানে আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেল, নতুবা আমার নড়বার শক্তি নেই। তোমায় আশ্রমে না দেখ্‌তে পেয়ে, বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম, কত কি যে ভাব্‌ছিলাম, তার ঠিক নেই। যা'হোক্ ভাই, তোমাকে দেখে, আমার প্রাণে বল এলো, বড় আনন্দ হলো, কিন্তু তোমার মুখ-চোখ এমন কালিমাখা কেন ভাই? এত ম্লান হয়ে গেছ কেন, তোমার শরীর কেমন?"

গঙ্গাধর বলিল—"দাদা, শরীর খুব ভালই আছে, তবে মনটার কথা আর কি বল্‌বো—বাবা আমাদের ছেড়ে গেছেন।"

বলিতে বলিতে তাহার নয়নে অবিরত অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। মনোহরও সেই কথা শুনিয়া, প্রথমটা যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল, সেও এ সংবাদ পূর্ব্বে কাহারও মুখে শুনে নাই। সে বলিল—অ্যাঁ, পূজ্যপাদ মহারাজজীর সমাধি হয়ে গেছে? কোথায়, কবে তিনি দেহত্যাগ করেন?"

গঙ্গাধর যতদূর যাহা শুনিয়াছিল, সমস্তই মনোহরদাসকে বলিল। সে সমস্ত শুনিয়া বলিতে লাগিল—"আহা, তিনি অসাধারণ মহাপুরুষ ছিলেন—তাঁহার প্রারব্ধকালের সাঙ্গ হল, তিনি যেমন সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ ছিলেন, তেমনই কৈলাসেই চির-সমাধি লাভ কর্‌লেন।"

মনোহরদাস তাঁহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিল। তাহার পর গঙ্গাধরকে বুঝাইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিল। গঙ্গাধর, মনোহরদাসকে এরূপ অসুস্থ-অবস্থায় পাইয়া, তাহার সেবা-কার্য্যে ও সতত তাহার সহিত নানা সৎকথায়, সেই বিষাদক্লিষ্ট তাহার চিন্তিত-ভাব সহজেই দূর হইল। মনোহরও তাহার সেবা ও যত্নে চার পাঁচ দিনের মধ্যেই শরীরে বেশ বল পাইল। তখন গঙ্গাধরের সহিত ধীরে ধীরে এদিক ওদিক কিছু কিছু পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই সঙ্গে সেই সাধুটীর অনুসন্ধানে, তাঁহার সহিত তাহাদের পুনরায় সাক্ষাতে, মনোহরদাসও প্রকৃত ঘটনা সমস্তই জানিতে পারিল।

গঙ্গাধর—সেই সাধুটীর ও তাহার মনোহরদাদার উপদেশক্রমে, গুরুদেব—বাবা বিমলানন্দজী-মহারাজের উদ্দেশে শীঘ্রই একটী 'ভাণ্ডারা'

অর্থাৎ সাধুভোজন করাইবে, স্থির করিল। সেই কারণ নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীদিগের নিকট তাহার এই কথা প্রস্তাব করিবামাত্র, সকলেই সাধুবাবার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল ও অতি আনন্দের সহিত তাহাতে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল। নিকটস্থিত অন্যান্য গ্রাম হইতেও যথাসাধ্য সাহায্যের আশা পাইল।

সাধারণ গৃহস্থদিগের ন্যায় প্রকৃত সন্ন্যাসী-সাধুদিগের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডাদি প্রদান-কার্য্য হয় না, তাহার পরিবর্ত্তে এইরূপ ভাণ্ডারাই সর্ব্বত্র হইয়া থাকে। তাহার প্রকৃত মূল কারণ এই যে, তাঁহাদের সন্ন্যাস-গ্রহণের সময়—যথারীতি 'দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের' শ্রাদ্ধ করিয়া, পরে নিজেরও অর্থাৎ আত্মশ্রাদ্ধও সম্পন্ন করিতে হয়। তাহার পর শ্রীগুরু-প্রদত্ত অন্তিম সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ হইয়া থাকে। অধুনা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সকল বিধি-ব্যবস্থা ও সংস্কারাদি যথাযথরূপে আর প্রায় প্রতিপালিত হইতে দেখা যায় না, এখন যে কেহ স্বইচ্ছায়—আপনার রুচি, প্রয়োজন ও অভিলাষানুরূপ কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াই লয়, কাজেই সেই প্রাচীন রীতি-নীতি অনেকেরই আর পরিজ্ঞাত নাই।

যাহা হউক পূজ্যপাদ স্বামী বিমলানন্দজী-মহারাজের ভাণ্ডারার উপলক্ষে নির্দ্দিষ্ট দিবসের পূর্ব্বেই আটা, ঘৃত, চিনি ও দধি আদি নানা উপকরণ-সামগ্রী ভারে ভারে আশ্রমে আসিতে লাগিল। বহু লোকজনও আসিয়া সেই সমুদায় দ্রব্যে লাড্ডু, মিঠাই ও মালপুয়া আদি মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে লাগিল। এদিকে 'মাঘমেলা'-উপলক্ষে প্রয়াগে সাধু-সজ্জনগণের পূর্ব্ব হইতেই বিপুল সমাগম হইয়াছিল। গঙ্গাধর তাঁহাদের সমাদরে আহ্বান করিয়া আনিল।

আজ ভাণ্ডারা হইবে, ধীরে ধীরে সেই সমুদায় সাধুদিগের সমাগম হইতে লাগিল। গ্রামবাসীরা পূর্ব্বাহ্নেই শতরঞ্চি আদি দ্বারা আশ্রমে একটা আশর বিছাইয়া রাখিয়াছিল। অনেকেই তাহার উপর উপবেশন করিলেন, কেহ বা নিজ নিজ স্বতন্ত্র আসনও বিছাইয়া লইলেন। আশ্রমের চারিদিকে আজ সাধু-সজ্জনে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অনেকে দলবদ্ধ হইয়া, ভজন-গান সুরু করিয়া দিলেন। বালক গঙ্গাধরকে শ্রীগুরুর কৃপায় এত বড় আয়োজনের কিছুই করিতে হইতেছে না। মনোহরদাসই এই সমুদায় ব্যবস্থা বিষয়ে গ্রামবাসী ভক্ত-জনকে যথা প্রয়োজন সহায়তা করিতেছে। বাস্তবিক গ্রামবাসীরা বড়ই উৎসাহ-সহকারে এই সমারোহ ভাণ্ডারা-ব্যাপারে মনোযোগী হইয়াছে।

এখনও মধ্যাহ্নকাল অতিবাহিত হয় নাই, সাধু-ভোজনের এখনও কিছু বিলম্ব আছে—কাজেই সাধুরা কেহ বসিয়া বা শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছে, কেহ ধূমপান করিতেছে, কেহ বা গল্প-গুজব বা আপন মনে ভজন-গান করিতেছে, তখনও দুই একজন করিয়া সাধু আসিতেছেন। বোধ হয় এ পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ শত সাধুর সমাবেশ হইয়া থাকিবে। তাঁহাদের জন্য উপকরণ সামগ্রীও যাহা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে সাত আট শত লোকেরও অধিক ব্যক্তি পরিতোষভাবে সেবা করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়। সাধুদিগের সেবার পর গ্রামবাসী ও দীন-দুঃখীদেরও সেবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

মনোহরদাস কতিপয় সাধুদিগের সহিত অতি উৎসাহের সহিত সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। এমন সময় বিশাল জটাজুট-ধারী অতি সুন্দর কান্তি-বিশিষ্ট একজন সাধু সেই বিপুল জন-

সঙ্ঘ ভেদ করিয়া কুটীরের দিকে আসিতেছেন দেখিয়া, মনোহরদাস অগ্রবর্ত্তী হইয়া, অতি সমাদরে তাঁহাকে প্রণাম ও অভ্যর্থনা করিল। গঙ্গাধরও তাহা দেখিয়া, অতি ভক্তিভাবে প্রণাম সহযোগে অভিবাদন করিল। তিনি তাহাদের আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ করিয়া, কুটীরে যাইয়া উপবেশন করিলেন। গঙ্গাধর তৎপূর্ব্বেই তাঁহার জন্য আসন বিছাইয়া দিয়াছিল। তিনি মনোহরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এটী কে?" মনোহরদাস বিনীতভাবে উত্তর দিল—"আপনারই গুরু-ভাই," ইহার নাম গঙ্গাধর, বড় ভাল ছেলে, পূজ্যপাদ ইহাকে বড়ই ভালবাসিতেন।

গঙ্গাধর তাহার গুরুদেবের নিকট ইহাঁর নাম শুনিয়াছিল—ইতঃপূর্ব্বে সে আর কখনও ইহাঁকে দেখে নাই। ইনি এতকাল দক্ষিণে রামেশ্বর-তীর্থেই ছিলেন, কোন বিশেষ শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য তথায় এক মহাপুরুষের নিকট গুরুদেব ইহাঁকে পাঠাইয়াছিলেন। ইহাঁর নাম বিদ্যানন্দজী-মহারাজ। ইনি এখন অসাধারণ পণ্ডিত ও যোগাদি-সাধনক্রিয়ায় পূর্ণ-অভিজ্ঞ হইয়াছেন। ইনিও গঙ্গাধরের পরিচয় পাইয়া, খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। পরে শ্রীগুরুদেবের চির-সমাধির কথা শুনিয়া, আর তাঁহার শ্রীচরণ-দর্শন করিতে পারিলেন না বলিয়া, অত্যন্ত দুঃখ-প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক তাঁহার ভাণ্ডারার দিবসেও যে, ইনি আশ্রমে উপস্থিত হইতে পারিয়াছেন, ইহাও কতকটা আনন্দের বিষয়! গঙ্গাধর ও মনোহরদাসও আজ এমন দিনে সহসা তাহাদের বিদ্যানন্দ দাদাকে পাইয়া, আরও উৎসাহিত হইল। গ্রামবাসীদের মধ্যে যাহারা তাহাকে চিনিত, তাহারা সকলেই আজ তাঁহাকে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইল, সকলেই তাঁহাকে সভক্তি প্রণাম করিতে লাগিল।

আশ্রমের মধ্যে যথায় পূজ্যপাদ স্বামী বিমলানন্দজী-মহারাজ নিত্য উপবেশনপূর্ব্বক পরমাত্ম-চিন্তা করিতেন, গ্রামবাসীদিগের উদ্যোগে সেই বেদীর উপর, একটী ছোট পাথরের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে ও তাহাতে "বিমলেশ্বর" নামকরণে একটী বাণলিঙ্গ শিবেরও যথাবিধি প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এবং তাহারই নিম্নে তাঁহার পাদুকা ও বস্ত্র আদি রাখিয়া, আজ তাঁহার "সমাধিমন্দির" প্রতিষ্ঠিত হইল। বিদ্যানন্দজী এই সমস্ত ব্যবস্থা দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা ও সমবেত বহু সাধুসজ্জন সকলে মিলিয়াই অতীব শ্রদ্ধা ও আনন্দ-সহকারে তথায় তাঁহার উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন, শঙ্খ ঘণ্টাদি বিবিধ বাদ্য-সহযোগে পূজ্যপাদের আরত্রিকাদি সমাপন হইল। সকলের উৎসাহ ও আনন্দে গগন পবন যেন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহাদের সেই সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হইল—

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেব বিশিষ্যতে॥"

"ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ।"

"ওঁ হ্রীঁ ওঁ, ওঁ হরি ওঁ॥"

"ওঁ সত্যং শান্তং সর্ব্বানন্দং চৈতন্যাভরণং।
কর্ম্মাধ্যক্ষং কেবলং সর্ব্বান্তর্ভূতং ওঁ॥"

"ওঁ জ্ঞানগঙ্গা হর হর মহাদেব ওঁ।"

"মন্ত্র সত্যং পূজা সত্যং সত্যদেব নিরঞ্জনঃ।
গুরোর্বাক্যং সদা সত্যং সত্যমেব পরং পদং॥"

"ধ্যানমূলং গুরোর্ম্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃপদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃকৃপা॥"

"গুরুর্ব্রহ্মা স্বয়ং সাক্ষাৎ সেব্যো-বন্দ্যো-মুমুক্ষুভিঃ।
নোদ্‌বেজনায় এবায়ং কৃতজ্ঞেন বিবেকিনা ॥১॥
যাবদায়ুস্ত্রয়ো বন্দ্যা বেদান্তো গুরুরীশ্বরঃ।
মনসা কর্ম্মণা-বাচা শ্রুতিরেবৈষ নিশ্চয়ঃ ॥২॥
ভাবাদ্বৈতং সদা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং ন কর্হিচিৎ।
অদ্বৈতং ত্রিষুলোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণাসহ ॥৩
"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥"
*   *   *   *   ইত্যাদি।
"ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ।"

ইহার পর সাধু-ভোজনরূপ ভাণ্ডারার কার্য্য আরম্ভ হইল। পূজ্য-পাদের পুণ্য ও আশীর্ব্বাদে সমুদায় কার্য্যই নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। কোন বিষয়েই কিছুমাত্র ত্রুটী হইল না। মহাপুরুষের নামে কোন বিষয়ে অপ্রতুল হইবে কেন ?

এখন সকলের অনুরোধে বিদ্যানন্দজী-মহারাজই আশ্রমের গুরুর-আসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। গঙ্গাধর তাঁহাকে তাহার সেই গুরুর ন্যায়ই শ্রদ্ধা ও সেবা করিতে লাগিল। তাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া পাঠাদি ও সাধনভজন সমুদায় অভ্যাস করিতে লাগিল। ইহার কিছুদিন পরে, মনোহরদাস তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া নিজেদের আশ্রমের দিকে চলিয়া গেল। গঙ্গাধর বহু দূর পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে যাইয়া, তাহাকে আগাইয়া দিল। সে তাহাকে ছাড়িয়া যেন আর ফিরিতে পারে না। মনোহর তাহাকে কত বুঝাইয়া, তাহার নিকট হইতে বিদায় লইল। যতক্ষণ তাহাকে গঙ্গাধর দেখিতে পাইল,

ততক্ষণই একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। অনন্তর আশ্রমে আসিয়া নিজের নিত্যকর্ম্মসমূহ সম্পন্ন করিতে লাগিল।

গঙ্গাধর তাহার বিদ্যানন্দদাদার নিকট সেই অবধি প্রায় দুই বৎসরকাল থাকিয়া, সংস্কৃত-ভাষা বেশ দখল করিয়াছে, সে এখন দেব-ভাষায় কথাবার্ত্তাও কহিতে পারে। বিদ্যানন্দজী, তাহার ধীর স্বভাব, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সাধনপ্রিয়তা ও শিক্ষাভিলাষের বিষয় দেখিয়া, অতি মনোযোগের সহিত তাহাকে সকল বিষয়ে শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাহার আর কোন বিষয়েই দুঃখ নাই, তবে তাহার মনোহরদাদার জন্য মাঝে মাঝে প্রাণটা কেমন করে। অনেক দিন হইয়া গিয়াছে, একবার তাহাকে দেখিবার জন্য যেন তাহার কিছু ব্যস্ততাও হইয়াছে। বিদ্যানন্দজী তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়া, নিজেই হরিদ্বারের দিকে যাইতে মনস্থ করিলেন। তাঁহারও ঐ অঞ্চলে অনেকদিন যাওয়া হয় নাই। সম্মুখে গ্রীষ্মকাল আসিতেছে দেখিয়া, তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়াই আশ্রম হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। গ্রীষ্মের সময়ে প্রয়াগে অত্যধিক গরম পড়ে। এ সময় অধিকাংশ সাধুসজ্জনই উত্তরাঞ্চলে হিমতীর্থে যাইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিদ্যানন্দজী গঙ্গাধরকে সঙ্গে লইয়া যথাসময়ে হরিদ্বারে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ত্রিপুরানন্দজী-মহারাজ বা বুড়াবাবার আশ্রমে আসিয়া পৌছিলেন। বৃদ্ধ মহাত্মা তখন আশ্রমেই ছিলেন, তাঁহারা অতীব ভক্তিসহকারে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন, তিনি উভয়কেই অত্যন্ত স্নেহপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন ও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার আশ্রম-সখা বিমলানন্দজীর শিষ্যদ্বয়কে তিনি নিজ শিষ্যগণ হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন না। ইহাঁরাও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ গুরুস্বরূপেই সর্ব্বদা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সাধু ও গুরুভাইদিগের সহিতও ক্রমে তাঁহাদের যথাযোগ্য অভিবাদনাদির বিনিময় হইল। সুরসিক সদানন্দময় মনোহরদাস তাঁহাদের দেখিয়া সর্ব্বাপেক্ষাই আনন্দ অনুভব করিল ও উভয়কে আপ্যায়িত করিল।

এইস্থানে কিয়দ্দিবস থাকিবার পর, বিদ্যানন্দজীর পরামর্শে মনোহরদাস ও গঙ্গাধর তিন জনে মিলিয়া উত্তর-প্রান্তীয় জলন্ধরখণ্ড পরিভ্রমণের জন্য পূজ্যপাদের চরণপ্রান্তে আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। তিনি আদেশ প্রদানের সহিত ওদিকের দর্শনীয় স্থান ও তীর্থাদির বিষয় সমুদায় বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট দিবসে পূজ্যপাদের শ্রীচরণ-বন্দনা করিয়া, তাঁহার আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণপূর্ব্বক যথাসময়ে হিমতীর্থান্তর্গত জলন্ধরখণ্ড পরিদর্শনে যাত্রা করিলেন।

ভারতের উত্তর প্রান্তস্থিত চির-হিমানিমণ্ডিত তীর্থগুলি পাঁচটী বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত, তাহা বোধ হয় অনেকেরই জানা নাই। কাশ্মীরের পশ্চিম সীমা হইতে নেপাল প্রদেশেরও পূর্ব্বে সদূর প্রাকজ্যোতিষপুর

বা আসাম প্রদেশ পর্য্যন্ত, সমগ্র পার্ব্বত্যভূমিই হিমালয়পর্ব্বতশ্রেণী বা উত্তরাখণ্ড বলিয়া পুরাকাল হইতে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এমন সমুচ্চ সদা-বিচিত্রতাময় পবিত্রভূমি জগতের আর কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। পূর্ব্বাচার্য্য আর্য্যঋষিমণ্ডলী ইহাকে দেবভূমি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। মানবদেহ ধারণ করিয়া, ভক্তিভরে তদ্‌গতচিত্তে যাঁহারা এমন পবিত্র স্থান আংশিকভাবেও কোনদিন দর্শন করিবার অবসর পান নাই, তাঁহারা নিশ্চয়ই অতি হতভাগ্য বলিতে হইবে। যদিও কলির প্রাবল্যে দিন দিন জীবের আয়ু ক্ষীণ হইতেছে, বুদ্ধিও মলিন ও চিত্ত ভক্তিহীন হইতেছে, সেই কারণ প্রত্যক্ষ অলৌকিক দৈবী-লীলাও ক্রমে যেন গুপ্ত ও সেই সমুদায় ভাব যেন কল্পনার বস্তুতে পরিণত হইতেছে। তথাপি তাহার যাহা কিছু এখনও অতি ক্ষীণ ছায়ারূপে পরিদৃষ্ট হয়, তাহাও কেবল দেবভূমি হিমারণ্যেরই সম্পূর্ণ উপযোগী বলিতে হইবে। বাস্তবিক যেমন নব নব বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্যসমাহারে ইহা পরিপুষ্ট, তেমনই ইহার প্রায় সর্ব্বত্রই এখনও অসাধারণ সরলতা, সত্য, শান্তি ও অতুলনীয় গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ!

বলিতেছিলাম, হিমালয়-পর্ব্বতমালা পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম—কাশ্মীরখণ্ড, দ্বিতীয়—জলন্ধরখণ্ড, তৃতীয়—কেদারখণ্ড, চতুর্থ—কূর্ম্মাচলখণ্ড ও পঞ্চম—নেপালখণ্ড। এখন সাধারণে এই পাঁচের মধ্যে কেবল তৃতীয় বা মধ্য-খণ্ডকেই উত্তরাখণ্ড বলে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। প্রাচীনকালে উক্ত পঞ্চ-খণ্ডের সমষ্টীকেই 'উত্তরাখণ্ড' বলা হইত।

পবিত্র-সলিলা ও মোক্ষপ্রদা গঙ্গা ও যমুনার উৎপত্তি বা অবতরণ-স্থল, যথাক্রমে গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী-তীর্থ। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম বা প্রধান শ্রীকেদারনাথ প্রসিদ্ধ শিবতীর্থ

এবং তৎসহ শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুতীর্থ শ্রীবদরি-নারায়ণের জন্য হিমালয়ের এই মধ্যখণ্ড বা 'কেদারখণ্ড'-প্রদেশ হিন্দুমাত্রেরই অতিশয় প্রিয় ও দর্শনীয়। এই প্রদেশ-মধ্যেই দক্ষ-প্রজাপতির সেই প্রাচীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, এই স্থানেই শিব-বর্জ্জিত তাঁহার যজ্ঞস্থলে পতিপ্রাণা দাক্ষায়ণী শিবরাণী 'শ্রীশ্রীসতী দেহত্যাগ' করেন; এই স্থানেই গিরিরাজ হিমালয়-দুহিতা গিরিজায়া হৈমবতী বা গৌরীর বিবাহ-উৎসব সম্পাদিত হয়। এখনও 'ত্রিযুগী-নারায়ণের' সম্মুখে সেই শিব-বিবাহের পূত-কুশণ্ডিকার যজ্ঞাগ্নি অতি যত্নের সহিত সংরক্ষিত আছে। এই পথেই যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ-পাণ্ডব দ্রৌপদীসহ 'মহাপ্রস্থানের পথে' স্বর্গারোহন করিয়াছিলেন।

মহামুনি ভৃগুও এই পথে কেদার-শৃঙ্গের উপর হইতে 'ভার্গবহ্রদে' আত্মসমর্পণরূপ ঝম্প-প্রদান-পূর্ব্বক মাতৃহত্যার মহাপাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এই অংশের মধ্যেই বদরিকাশ্রমস্থিত 'ব্রহ্ম-কপাল-তীর্থ অবস্থিত, যথায় স্বয়ং শিবকেও ব্রহ্মহত্যা পাতকজনিত ব্রহ্মকপাল-কলঙ্কিত-কর শোধন করিতে হইয়াছিল।

হিমালয়ের এই অংশেই মন্দাকিনী-ধারা-সমন্বিত স্বর্গভূমি। ইহারই অন্তরে অলকনন্দা চিরদিন অবিরত ধারে প্রবাহিতা হইতেছে—এই স্থানেই শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস বাদরায়ণ নিজ আশ্রম—প্রসিদ্ধ 'বদরীকাশ্রম' নামে প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্ত্তী সময়ে জগদ্গুরু ষট্ শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যদেব মহারাজ এই অংশমধ্যেই বসিয়া নিজগুরু ষট্ শ্রীমদ্ গোবিন্দনাথ-পূজ্যপাদের আদেশে ও তাঁহার পরমগুরু ষট্ শ্রীমদ্ গৌড়-পূজ্যপাদের 'আগম' বা 'আদি অদ্বৈত-কারিকা'-অবলম্বনে, তাঁহার পরমেষ্টিগুরু ষট্ শ্রীমদ্ ব্যাসদেব-বিরচিত প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসূত্রের অপূর্ব্ব 'শারীরক-ভাষ্য' রচনা করিয়া, 'বেদান্তার্ক'

নামে তিনি বিখ্যাত হইয়া ছিলেন। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ম্মঠ বা 'যোশীমঠ' এই স্থানেই প্রতিষ্ঠা করিয়া, হিমালয়ের এই মধ্যখণ্ডের মর্য্যাদা আরও বাড়াইয়া গিয়াছেন। এই সকল কারণেই সাধারণে 'উত্তরাখণ্ড' বলিলে, হিমালয়ের এই অন্তরস্বরূপ মধ্যখণ্ডকেই প্রথমে মনে করিয়া থাকে।

ইহারই পাদমূলকে বা প্রবেশ-দ্বারকে এখন লোকে 'হরদ্বার' বা 'হরিদ্বার' বলে, তাহার কারণ এই পথ বা এই দ্বার দিয়াই উক্ত 'হর' বা 'হরি'-তীর্থে অর্থাৎ উক্ত কৈলাস, স্বর্গ, কেদার ও বদরী-নারায়ণ আদি তীর্থ-দর্শনে গমন করিতে হয়। এই জন্য শিবোপাসকদিগের নিকট ইহা প্রথমে—'হরদ্বার', পরে বিষ্ণু-উপাসকদিগের নিকট ইহা—'হরিদ্বার' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে —কিন্তু অতি প্রাচীনকালে ইহা কেবল 'গঙ্গাদ্বার' বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল। সে নাম এখনও আর্য্যের পুরাণাদির মধ্যে লুকান আছে। শাস্ত্রে—"গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে" গঙ্গার এই তিনটীই মোক্ষপ্রদ মহাতীর্থ বলিয়া কথিত আছে। অধুনা এই নামের সহিত স্থানিয়-তীর্থ পুরোহিতগণ ব্যতীত সাধারণ-লোকের আর তেমন পরিচয় নাই।

যাহাহউক এই গঙ্গাদ্বার বা হরদ্বার অথবা হরিদ্বার হইতে হিমালয়ের শেষ উত্তর-প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্তই কেদারখণ্ড। ইহাই পূর্ব্ব পশ্চিমে বহুদূর বিস্তৃত, সমগ্র হিমালয়ের মধ্যে প্রধান বা মধ্যখণ্ড। ইহারই ঠিক পশ্চিমে—'জলন্ধরখণ্ড'। এই প্রদেশটীকে শ্রীশ্রীভগবতীর 'শক্তি-খণ্ডও' বলা যাইতে পারে। এতদ্‌সম্বন্ধে পরে পাঠকের বিশেষ পরিচয় হইবে। কারণ বিদ্যানন্দজী, মনোহরদাস ও গঙ্গাধর এই বিচিত্র তীর্থসমূহ দর্শনের জন্যই এবার বাহির হইয়াছেন। তাঁহাদের

সঙ্গে প্রত্যেক পাঠককেই সেই সকল স্থান ও তীর্থাদি পরিভ্রমণ করিতে হইবে।

জালন্ধরের আরও পশ্চিমে—'কাশ্মীরখণ্ড'। তথায় সর্ব্বপ্রধান তীর্থ—"শ্রীশ্রীঅমরনাথ"। সেও এক অপূর্ব্ব স্থান! সদা তুষার-মণ্ডিত পর্ব্বতমালার মধ্যে—বাবা অমরনাথের অপূর্ব্ব মন্দির-গুহা। তাহার আশে পাশে যতদূর মানবের দৃষ্টিগোচর হয়, কেবলই ঈষৎ নীলাভ শুভ্রোজ্জ্বল বরফরাশিতে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন—আশ্চর্য্যের বিষয়, কেবল বাবার মন্দিরসংলগ্ন অতি সামান্য ভূমিখণ্ডের মধ্যে বরফের চিহ্নমাত্রও নাই। বৎসরে এক দিনমাত্র 'রাখীপূর্ণিমার' দিন বাবা অমরনাথের যথাবিধি অর্চ্চনা হইয়া থাকে। সেই দিনে মন্দিরের মধ্যে অসংখ্য সাধু-সন্ন্যাসী, যোগী গৃহস্থ ও ভক্ত নরনারীর-সমাগম হইয়া থাকে। কত পরমহংস-মহাত্মাও নগ্নদেহে বাবার দর্শন ও পূজা করিয়া থাকেন। অমরনাথ-দর্শনার্থী যাত্রীরা যখন দলে দলে সেই তুষারাবৃত দুর্গম পার্ব্বত্য-পথে গমন করে, তখন প্রায় সকলকেই মৃত্তিকাভাণ্ডে অগ্নিপূর্ণ করিয়া বক্ষস্থলে বাঁধিয়া যাইতে হয়, নতুবা কাহারও কাহারও হৃদয়ের ক্রিয়া-বেগ সহসা স্থগিত হইয়া, মৃত্যু ঘটিয়াও থাকে। কিন্তু আনন্দের বিষয় তাহাতেও ভক্তজনের বিন্দুমাত্র চিন্তা বা ক্ষোভের কারণ থাকে না।

কেদারখণ্ডের পশ্চিমস্থিত জলন্ধর ও কাশ্মীরখণ্ডের ন্যায় কেদারখণ্ডের পূর্ব্বপ্রান্তে 'কুর্ম্মাচাল' ও 'নেপালখণ্ড' বিদ্যমান আছে, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কূর্ম্মাচলখণ্ডে—নৈনীতালস্থিত 'নয়নাদেবী' ও ভামতাল আদি প্রদেশেও বহু প্রাচীন তীর্থ বিরাজিত আছে। কেদার-বদরী হইতে ফিরিবার পথে বঙ্গ, বিহার ও

উৎকল-প্রদেশীয় প্রায় সমস্ত যাত্রীই এই সমুদায় তীর্থাদি দেখিবার অবসর পায়।

ইহার পর 'নৈপালখণ্ড'—তথায় পশুপতিনাথ, গুহ্যকালী-পীঠ প্রধান তীর্থ। দুর্জ্জয়লিঙ্গ বা দার্জ্জিলিং, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাদি বাণরাজ্যাদি স্থানেও বহু তীর্থ আছে। তাহাও নেপালখণ্ডেরই অন্তর্গত। নেপালের মধ্যেও স্বতন্ত্র জ্বালামুখী আদি বহু দর্শনীয় বস্তু আছে।

যাহাহউক আমরা এক্ষণে সেই সমুদায় প্রদেশের আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যানন্দজী আদির সহিত জলন্ধরখণ্ডের দিকেই অগ্রসর হইয়া, প্রকৃত বিষয়ের বর্ণনায় মনোযোগী হইব।

তাঁহারা হরিদ্বার হইতে বাহির হইয়া, কয়েক দিন পরে 'আম্বালা-ছাউনী'তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানের কালীবাড়ীতে পূজারী ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের যত্নে কয়েক দিন তাঁহাদের অতি আনন্দেই অতিবাহিত হইল। পূজারীমহাশয় বেশ ভাল লোক, অতিথি, সাধু-সজ্জনের প্রতি তাঁহার ভারি শ্রদ্ধা, সকলকেই তিনি পরম আত্মীয়ের ন্যায় সেবা যত্ন করেন। পশ্চিমে প্রবাসী বাঙ্গালী-দিগের এই কালীবাড়ী-প্রতিষ্ঠা প্রকৃতই এক অদ্ভুত কীর্ত্তি। এই কালীবাড়ী পূজা, ভোগ, অতিথিসেবাদি যাবতীয় ব্যয়, স্থানীয় ব্যক্তি-গণের সাধারণ চাঁদা দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সময় সময় যাঁহারা দেশ-ভ্রমণে আসিয়া, এইরূপ কালীবাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারাও যাইবার সময় দেবীর প্রণামীরূপে কিছু কিছু সহায়তা করিয়াও যান। ইহাতে বাঙ্গলা দেশ হইতে এত দূর-প্রদেশে, প্রবাসী বাঙ্গালী নরনারীর ধর্ম্ম-কর্ম্ম আচার-ব্যবহার নিত্য-

নৈমিত্তিক সকল কর্ম্মই বেশ সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। কোন বিষয়েই কাহারও কিছু অভাব ও আপত্তি হয় না।

আজ পূর্ণিমার নিশি—কালীবাড়ীতে সত্যনারায়ণের সিন্নির ব্যবস্থা হইয়াছে। স্থানীয় লোকজনের সহিত আজ বাঙ্গালী মেয়েছেলেতে কালীবাড়ী পরিপূর্ণ। সকলেই অতি ভক্তিভাবে মায়ের দালানে বসিয়া আছে। ভট্টাচার্য্য-মহাশয় ও অন্যান্য লোকের অনুরোধে বিদ্যানন্দজী ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয় আজও এই মন্দিরেই অতিবাহিত করিতেছেন। মায়ের পার্শ্বেই স্বতন্ত্র বেদীতে শ্রীশ্রীসত্য-নারায়ণের 'মোকাম' স্থাপনা করিয়া, ভট্টাচার্য্য-মহাশয় যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। পরে সত্যনারায়ণের কথা আরম্ভ করিলেন। এই সুদূর পঞ্জাব প্রদেশে সত্যনারায়ণের সেই 'বাঙ্গলা-ব্রতকথা' এক অপূর্ব্ব বস্তু। সকলেই যেন তদ্গত হইয়া সেই কথামৃত পান করিতেছেন। বাঙ্গালীদের ত কথাই নাই, এ দেশীয় ভক্তমণ্ডলী, তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও, বেশ ধীর হইয়াই সেই কথা শ্রবণ করিতেছে। তাহাদের সে অবস্থা দেখিলে, বাস্তবিক বেশ আনন্দ হয়।

'কথার' পর প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হইল। সর্ব্বপ্রথমেই আমাদের বিদ্যানন্দজীদের প্রসাদ দেওয়া হইল, তাহার পর সমাগত ব্রাহ্মণদের ও পরে অন্যান্য সকলকেই প্রসাদ দেওয়া হইল। বিদ্যানন্দজীরা কয় দিবস এই স্থানে থাকায়, বহু ধর্ম্ম-প্রাণ ব্যক্তি তাঁহাদের সহিত নানা ধর্ম্মালোচনা ও সৎসঙ্গ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। আজও অনেক রাত্রিপর্য্যন্ত নানা বিষয়ক সৎসঙ্গে সকলের অতিবাহিত হইল। তাঁহাদের আরও কয়েক দিবস এখানে থাকিবার জন্য সকলে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাহাতে আর সম্মত হইলেন

না। সুতরাং সেই রাত্রিতেই সকলের নিকট তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পরদিন প্রভাত হইতে না হইতে তাঁহারা সেই স্থান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্যত্র যাইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলেন। 'ছাউনী' পার হইয়া কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়াছেন—তখন সূর্য্যকিরণ বেশ প্রকাশ হইয়াছে, তাঁহারা সম্মুখে পথের ধারে এক বিচিত্র কুটীর দেখিয়া, যেন চমৎকৃত হইয়া পড়িলেন। কুটীর-গৃহটী কাঁচা হইলেও, বেশ মজবুৎ ভাবে নির্ম্মিত, তাহার আশে পাশে আর কোনও গৃহ নাই, কেবল কুটীরের সংলগ্ন আর এক খানি চালা ঘর আছে। তাহা পাকের জন্যই বলিয়া বোধ হয়। তাহার পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড নিমগাছ, যেন সেই কুটীরখানিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কুটীরটীর পিছন দিকে একটী ক্ষুদ্র গবাক্ষ, তাহার মধ্য হইতে একটী যুবতী যেন অতি সন্তর্পণে উঁকি মারিয়া বাহিরের দিকে দেখিতেছিল। তাঁহারা সেই গবাক্ষের নিকটবর্ত্তী হইলে, মেয়েটী অতি ভয়ে ভয়ে অনুচ্চস্বরে বলিল—"বাবা, আপনাদের মুখে বাংলা কথা শুনে আমার ভারি আনন্দ হচ্চে, অনেক দিন বাংলা শব্দ শুনিনি, কোনও বাঙ্গালীকে দেখিওনি—আপনারা কোথায় যাবেন?" আর কোন কথা বলিতে না বলিতে মেয়েটী বুঝি কাঁদিয়া ফেলিল, সে চক্ষু মুছিয়া পুনরায় বলিল—"বাবা, আপনারা ভালকরে দেখুন দেখি, ওদিকে আর কেউ নেই ত?"

ইহাঁরা একটী বাঙ্গালীর মেয়েকে সেই অবস্থায় দেখিয়া, যেন অবাক্ হইয়া যাইলেন ও একবার এদিক ওদিক ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন—"না মা, কেউ নেই।"

তখন মেয়েটী আরও আবেগভরে ক্রন্দনজড়িত-স্বরে তাড়াতাড়ি

বলিতে লাগিল—"বাবাগো, আমি এখানে প্রায় সাত মাস আবদ্ধ আছি, আমার দুঃখের কথা জানাবার কাকেও পাইনি। একজন শিখ কুলীর-সর্দ্দার আমাকে এখানে এম্‌নি করে রেখেচে। আমি বাঙ্গালীর মেয়ে বাবা, তা বুঝ্‌তেই পারবেন। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছি। হুগলীতে আমার বড় ভাই আদালতে কাজ করেন, আমি প্রতীবাসী আত্মীয়দের সঙ্গে তীর্থদর্শনে বার হই, অনেক তীর্থ দেখে, আমরা 'অমরনাথ' যাবো বলে, এদিকে আসি, পথে আমার ভারি পেটের অসুখ হয়, দুর্ব্বল শরীরে পথ চল্‌তে আমার কষ্ট হতে লাগ্‌লো, সঙ্গীরা তাই দেখে, আমায় ছেড়ে ফাঁকি দিয়ে কোথায় যে লুকিয়ে চলে গেল, তা আর ঠিক কর্‌তে পারলুম্‌ না। আমি ত একা ভয়ে কেঁদে আকুল, তখন একটী পাঞ্জাবী মেয়ে-মানুষ পথের ধারে আমাকে সেই অবস্থায় দেখে, দয়া করে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। সে খুব যত্ন সেবা করে। বাবা, আমার তখন মরণ হলো না—আমি আবার বেঁচে উঠ্‌লুম! আমার অদৃষ্টে যে কত দুঃখ আছে, তা ভগবানই জানেন।"

মেয়েটী এই কথা বলিয়া আবার চক্ষু মুছিল, তাহার পর আবার বলিতে লাগিল—"বাবা গো, আমি বড়ই মহাপাতকী—তাদের বাড়ীর একটা লোক আমাকে দেশে পৌছে দেবে বলে, কোন্‌ দেশে যে, নিয়ে গেল, তা আমি জানিনি। সেইখানে এই শিখ্‌টার কাছে বোধ হয় আমাকে বেচে গিয়েছে। এ লোকটা তারপর আমাকে এখানে এনে রেখেচে, আমি সেই অবধি এইভাবে আবদ্ধ আছি। সে লোকটা আমায় খুব যত্ন করে। ভাল খাওয়া পরা দিতে কিছু মাত্র ক্রুটী করে না, কিন্তু আমি যেন তার পিঁজ্‌রের পাখী হয়ে রয়েছি। আমার প্রতি সে কোনরূপ অত্যাচার বা অসদ্‌ব্যবহারও

করে না বটে, কিন্তু কারুর সঙ্গে একটী কথাও বল্‌তে দেয় না। তবে সে যখন আসে, তখন ঘরের তালা খুলে দেয়, আবার কাজে যাবার সময়, এই রকম তালা-বন্ধ করে যায়। রোজ দুপুরবেলা এসে তালা খুলে দেবে, তখন রান্নাবান্না করি, খাওয়া দাওয়া হয়। তার সঙ্গীরা অন্যান্য শিখ্‌-কুলীরা এসে বাজার-হাট, জল-কাঠ সব এনে দেয়। বাবা, আপনারা কি আমার কোনও উপায় কর্‌তে পারেন ?

"আপনারা সাধু মহাপুরুষ, ইচ্ছা কর্‌লে, হয়ত সবই কর্‌তে পারেন, হা ভগবান্‌! বাবা, সে লোক্‌টা আবার ভারি দুর্দ্দান্ত, তার ভয়ে কেউ এর ত্রিসীমানায় আসে না। সকলেই তাকে ভয় করে। দেখুন দেখি—আশে পাশে বাইরে কেউ নেই ত ? আমার কথা কেউ শুন্‌চে না ত ? তা হলে, হয় ত আমার সর্ব্বনাশ হবে। আপনারা একটু সাবধান হন্‌! না, আমার দুঃখ দূর কর্‌বার কেউ নেই—আপনারা যান্‌। যদি কেউ দেখে, তাকে খবর দেয়—তা হলে হয় ত আপনাদেরও দুর্দ্দশা হবে! আপনারা মহাত্মা—অপমানিত হবেন। এই হতভাগিনী পাপীর জন্যে আপনারা কষ্ট পেলে, আমার পাপের আর পরিসীমা থাক্‌বে না। না বাবা, আপনারা যান্‌, শিগ্‌গীর করে চলে যান্‌, হয় ত কেউ এসে পড়্‌বে।"

মেয়েটী আর কথা বলিতে পারিল না। এইবার ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বিদ্যানন্দজী গম্ভীর লোক, যেন অবাক্‌ হইয়া, কি কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিতে পারিতেছেন না। মনোহরদাস তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল—"মা, তোমার কোন্‌ ভয় নেই, আম্‌রা তোমার উদ্ধার কর্‌বো, তুমি কেঁদো না, কোনও চিন্তা করো না।" তাহার পর বিদ্যানন্দজীর প্রতি চাহিয়া বলিল—"দাদা, এ মায়ের উদ্ধার কর্‌তেই হবে, চলুন এখনই কোন উপায় স্থির করা যাক্‌।

তবে এখানে আর বেশীক্ষণ এ ভাবে আমাদের দাঁড়িয়ে থাকা ভাল নয়। মা ঠিক্‌ই বলেছেন—যদি কেউ দেখ্‌তে পায়, তা হলে হয় ত কাজে ব্যাঘাৎ ঘট্‌তে পারে—চলুন।" বিদ্যানন্দজীও তদুত্তরে বলিলেন—"বেশ, তাই চল।" মেয়েটীকে বলিলেন—"মা, আমরা এখন যাই, কোন চিন্তা করো না, আমরা সব বুঝ্‌তে পেরেছি। আমরা শীঘ্রই কোনও ব্যবস্থা করে এখানে আস্‌বো, এখন যাই।"

মেয়েটী আর কোনও কথা বলিতে পারিল না।

তাঁহারা সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আবার ছাউনীর দিকে চলিলেন। মনোহরদাস বলিল—"দাদা, চলুন কালীবাড়ীতে যাই, সে স্থানে ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে, এর্ একটা বিহিত কর্‌তেই হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মেয়েটীকে আমরা উদ্ধার কর্‌তে পার্‌বো।" গঙ্গাধর বলিল—"দেখুন মহারাজ্, কাল কালীবাড়ীতে সেই যে একটী ভদ্রলোক, যিনি আমার কথা বার বার আপনাদের জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেন, তিনি পুলিসে না কোন্ কোর্টে কাজ করেন বল্‌ছিলেন, তিনি বেশ ভাল লোক বলেই আমার মনে হয়। তাঁকে দিয়েই এ কাজ ঠিক সম্পন্ন হবে বোধ হয়।"

বিদ্যানন্দজী বলিলেন—"হাঁ, সে লোক্‌টী ব্রাহ্মণ ও বেশ দৃঢ়চিত্ত বলেই বোধ হলো। লোকটীর নাম—রাজেন্দ্র কুমার না রাজচন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য বলেছিল। যাক্, পূজারীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেই হবে—আর সব খবরও পাওয়া যাবে।" গঙ্গাধর বলিল—"মহারাজ, আমার মনে হয়, এ-ঘটনা এখন পূজারীমহাশয়কে বলে কাজ্ নেই, কেন না, সে লোক্‌টা তেমন গম্ভীর নয়, কথাটা যদি তার মুখ থেকে কোনরূপে কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ে, তবে মেয়েটীর উদ্ধারের পক্ষে হয়ত গোলযোগ হতেও পারে।"

বিদ্যানন্দজী বলিলেন—“সে ভাল কথা, পূজারীর নিকট কেবল সেই ভদ্রলোকটীর ঠিকানা জেনে নিলেই হবে। তারপর তাঁর সঙ্গে দেখা করে, সকল বিষয় পরামর্শ করে, যেমন হয় করা যাবে।” তাঁহারা এইভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে পুনরায় কালীবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও পূজারীমহাশয়ের নিকট তাঁহার সবিশেষ পরিচয় ও ঠিকানা লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন।

তাঁহারা সেই ঘটনা তাঁহাকে যথাযথ ভাবে বলিলে—তিনি শুনিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া পড়িলেন। তখনই বাসা হইতে বাহির হইলেন ও তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার এক বন্ধু ‘কোর্ট ইনিস্‌-পেকটারের’ বাসায় যাইলেন। ইনিস্‌পেকটারবাবু পাঞ্জাবী, ইহাঁকে বেশ শ্রদ্ধা-সম্মান করেন; তিনি ঘটনাটী সবিশেষ শুনিয়া বলিলেন—“যদি ব্যাপার সত্য হয়, তবে এখনই তাকে গ্রেফ্‌তার করে হাজতে পুর্‌তে হবে, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম ব্যতীত তা অসম্ভব, তিনি আজ এখানে নেই, মফঃস্বলে আছেন, তাই ত কি করা যায়?”

রাজন্‌বাবু বলিলেন—“দেখুন, সাধুরা এই সংবাদ দিচ্ছেন বলে, ইহাঁদের মাম্‌লার সঙ্গে জড়ান চল্‌বে না। আমার মনে হয়, যদি কোনরূপে লোকটাকে ধমকাইয়া সেই মেয়েটীকে উদ্ধার করা যায়, তাই প্রথমে করা দরকার, আর এঁদেরও সেইরূপ অভিমত।”

এই ভাবে নানা পরামর্শপূর্ব্বক তাঁহারা কেবল দুইজন পুলিস্‌কনষ্ট-বলকে সঙ্গে লইয়া, সাধুদের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। সাধুরা দূরে থাকিয়া, সমস্ত দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহারা অন্তরালে থাকিয়াই সাবধানে সমস্ত ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন।

সেই সময় সেই লোকটাও সবেমাত্র আসিয়া নিজেদের রান্না-বান্নার যোগাড় করিয়া দিতেছে—তখন কুটীরের দ্বারে তালা নাই, মেয়েটী অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও বাধ্য হইয়া রান্নার উদ্যোগ করিতেছে। সহসা এই লোকজন—বিশেষ পুলিসের পাহারাওয়ালাদের সঙ্গে দেখিয়া লোকটা যেন বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া আছে। ইত্যবসরে মেয়েটী তাড়াতাড়ি ঘোম্‌টা দিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। ইনিস্‌পেক্‌টারবাবু ঘটনাস্থলে আসিয়াই, সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তিনি একেবারেই যেন রুদ্রমূর্ত্তিতে পাঞ্জাবী ভাষায় তাহাকে গালি দিতে আরম্ভ করিলেন এবং সেইসঙ্গে বলিলেন—"ঘরের মধ্যে ও কে ছুটে পালিয়ে গেল ?"

সে বলিল—"ও আমার স্ত্রী।"

ইনিস্‌পেকটার—"বদ্‌মাস্, এখনই সব বেঁধে নিয়ে যাব, ঠিক করে বল, ও কে ?"

শিখ্—"ঠিকই বল্‌চি ও আমার স্ত্রী।"

ইঃ—"মিথ্যা কথা—চোর, কাকে চুরি করে এখানে লুকিয়ে রেখেচিস্, শীঘ্র বল্, নতুবা এখনই চালান দেবো।"

শিখ্ পুনরায় দৃঢ়স্বরে বলিল—"ও আমারই স্ত্রী, আমি চুরি করে ওকে লুকিয়ে রাখ্‌বো কেন ?"

ইঃ—"ফের্ মিথ্যে কথা বল্‌চিস্—ও কাদের মেয়ে ? কোথায় বিয়ে করেচিস্ ? ওর বাপের নাম কি ?"

শিখ্ এবার আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল—আমি ওর বাপের নাম জানি না, আমি ওকে কিনে এনেছি।"

ইত্যবসরে রাজেনবাবু ঘরের দরজার কাছে যাইয়া, মেয়েটীকে দেখিলেন। মেয়েটী ভয়ে জড়সড় হইয়া, ঘরের এক কোণে লুকাইয়া

দাঁড়াইয়া আছে। তিনি খুব স্নেহভরে বাঙ্গালায় বলিলেন—"মা, তুমি বেরিয়ে এস, আমরা তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি, তোমার কোনও ভয় নেই।"

মেয়েটী তাঁহাকে বাঙ্গালী জানিতে পারিয়া এবং তার উদ্ধারের কথা শুনিয়া, একেবারে যেন বিহ্বল হইয়া ছুটিয়া আসিল ও তাঁহার চরণের উপর মাথা দিয়া অবিশ্রান্ত ক্রন্দন করিতে লাগিল।

তিনি অতি স্নেহপূর্ণ বাক্যে তাহাকে পুনরায় বলিলেন—"কেঁদো না মা, এখন আমরা যা যা জিজ্ঞাসা করি, পরিষ্কার করে সব কথার ঠিক ঠিক উত্তর দাও, তা হলেই তোমার উদ্ধার করা আমাদের সহজ হবে, তোমার কোনও ভয় নেই, আজ এখনই তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারবো,—তোমার নাম কি মা।"

মেয়েটী বলিল—"শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।"

তখন ইনিস্‌পেকটারবাবু সেই শিখকে আবার গালি দিয়া বলিলেন—"এত বাঙ্গালীর মেয়ে, এ তোর স্ত্রী হলো কি করে?"

শিখ্ কিছু বলিতে যাইতেছিল, ইনিস্‌পেকটার ধমক দিয়া চুপ করিতে বলিলেন। তাহার পর ডায়েরী বাহির করিয়া, রাজেনবাবুর প্রশ্নে মেয়েটীর উত্তর সমুদয় লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজেন-বাবু মেয়েটীর বাংলা কথার পাঞ্জাবীতে অনুবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন।

প্রশ্ন—"তোমার বাড়ী কোথায়?"

উত্তর—"হুগলী, আমি বিধবা, তাই এখন বাপের বাড়ীতে থাকি। আমার বড় ভাই হুগলীর আদালতে কাজ করেন, আমি

তাঁর কাছেই হুগলীতে থাকি। শ্বশুর বাড়ীতে আমার কেউ নেই।”

প্র ঃ—“তুমি এখানে কেমন করে এলে ?”

উ ঃ—“আমি প্রতিবেশীদের সঙ্গে তীর্থ করতে আসি, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র এই সব দেখে অমরনাথ দেখ্‌তে যাচ্ছিলাম। পথে আমার ভারি পেটের অসুখ হয়, খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়ি।—সঙ্গীরা আমার জীবনের আশা নেই দেখে, আমায় ফেলে, ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়। একজন পঞ্জাবী মেয়েমানুষ আমার সেই দুরবস্থা দেখে, দয়া করে তাদের বাড়ী নিয়ে যায়; সে খুব সেবা করে, আমি সে যাত্রা যমের হাত থেকে বেচে উঠ্‌লুম। সেই বাড়ীতে একটা লোক আমায় দাদার ঠিকানায় পৌছে দেবে বলে, ফাঁকি দিয়ে আমাকে নিয়ে আসে, তার পর এই লোক্‌টার কাছে দিয়ে সরে পড়ে। আজ প্রায় সাত মাস এখানে এনে আমাকে আবদ্ধ করে রেখেছে।”

প্র ঃ—“এ লোক্‌টা তোমায় কি বলে ?”

উ ঃ—“এ আমাকে খুব যত্ন করে, বলে—আমাকে টাকা দিয়ে কিনে এনেচে, আর কত কি বলে, তা সব বুঝ্‌তে পারিনি।”

প্র ঃ—“তুমি কি ওর সঙ্গে থাক্‌তে চাও, না—তোমার দাদার কাছে যেতে চাও ?”

উ ঃ—“আমি বাঙ্গালী, বামুনের মেয়ে, বিধবা, সেখানে আমার দাদা আছেন, আত্মীয় স্বজন আছে! আমার প্রাণ মন সর্ব্বক্ষণ সেই খানে পড়ে আছে, এখানে আমি পাখীর মত পিঁজ্‌রেয় বাঁধা পড়েছি! এখানে আমার একমুহূর্ত্তও থাক্‌তে ইচ্ছা হয় না।” এই বলিয়া মুখে আঁচল দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

শিখ্‌টা এই সব ব্যাপার দেখিয়া, যেন হতভম্ভ হইয়া গেল।

দারোগাবাবু বলিলেন—“কিরে? ও তোর স্ত্রী নয়? ও কি বলে?”

শিখ্‌ আর বেশী কথা বলিতে পারিল না। সে বলিল—“আমার অনেক টাকা এর পিছনে খরচ হয়েছে। আমি সত্যি কথা বল্‌ছি।”

দারোগা—“তা ত বুঝ্‌লুম্‌, এখন তোর মৎলব্‌ কি? এরে ছেড়ে দিবি, না থানায় যাবি? শিগ্‌গির্‌ বল্‌।”

সে তাহার উত্তরে হাঁ, না, কিছুই বলিতে পারিল না, কেবল একবার সেই মেয়েটার দিকে চায়, আর একবার দারোগার দিকে চায়, আর কেবল তার নিজের মাথা চুল্‌কায়!

দারোগাসাহেব পুনরায় তাহাকে তাড়া দিলেন। তখন সে তাঁহার দিকে হাতযোড় করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল ও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—“আমি অনেক টাকা এর জন্য খরচ করেছি হুজুর, আমি গরীব লোক, দয়া করে আমায় রক্ষা করুন।”

দা ঃ—“তোকে এখন হাজতে রক্ষা কর্‌বো, চল্‌ বদমাস্‌।”

সে দারোগার পায়ে পড়িয়া চিৎকার করিয়া অবিরত কাঁদিতে লাগিল। পাহারাওয়ালারা তার হাত ধরিয়া তাড়নাসহ সরাইয়া লইল ও তাহাকে থানায় লইয়া যাইবার উপক্রম করিল। তখন রাজেনবাবু তাহাকে ঠাণ্ডাভাবে সব কথা বুঝাইয়া বলিলেন। সে তাহাতে নিতান্ত ভয় পাইয়া, যেন বাধ্য হইয়াই, তখন মেয়েটীকে ছাড়িয়া দিতে রাজী হইল। অনন্তর রাজেনবাবু দূরস্থিত সেই সাধুদের তখন ডাকাইয়া, মেয়েটীকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর দিকে ফিরিলেন। দারোগাবাবু তাহার একটা টিপসই লইয়া, পাহারাওয়ালাদের

তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন ও সেই সঙ্গে সকলে চলিয়া আসিলেন। শিখ্‌টা তখন যেন অবাক্ হইয়া তাঁহাদের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল!

রাজেনবাবু পথে আসিতে আসিতে বলিলেন—"এত সহজে যে, কর্ম্মসিদ্ধ হইবে, তা' আমি ভাবিনি। আপনারা মহাপুরুষ, আপনাদের দয়ায় সবই হয়! এখন মেয়েটীকে কেমন করে ওর ভায়ের কাছে পাঠান যায়—তাই চিন্তার বিষয়!"

দারোগাবাবু বলিলেন—"সে উপায়ও হয়ে যাবে, চিন্তা নেই, শান্ত্‌লোকের কৃপা হলে, কোনওঅভাবই থাকে না।" তিনি মেয়েটীর ভাইয়ের নাম ধাম অদি সমুদায় পরিচয় লইয়া, তখনই তাহার যথাযথ ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেলেন।

রাজেনবাবু নিজের বাড়ীতে মেয়েটীকে লইয়া যাইলেন, সাধুদেরও তাঁহারই বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়া লইয়া যাইলেন। সকলকে সমাদরে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন।

গঙ্গাধর পথে আসিবার সময়—মেয়েটীকে ভাল করিয়া দেখিয়া ও তাহার ভাইয়ের সবিশেষ পরিচয় পাইয়া, যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল, পরে গোপনে বিদ্যানন্দজীকে বলিল—"মহারাজ, এ মেয়েটীকে আমি চিন্‌তে পেরেছি, কি আশ্চর্য্যের বিষয়—কি ভীষণ প্রারব্ধ! এটী আমার মামীমার আপন ভাইঝি। আমি ওকে অনেকবার দেখিছি। তখন ও অনেকটা ছোট ছিল, এখন খুব বড় হয়েছে, চেহারাও যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। তাই প্রথমটা আমি ওরে ভাল চিন্‌তে পারিনি। যাক্—ভালই হয়েছে, এখন আর কোনও গোলযোগ না হইলেই হয়। এখন ভালয় ভালয় বেচারী ঘরে পৌঁছিতে পারিলেই হইল। তবে

মেয়েটা কিন্তু আমাকে এখনও চিন্‌তে পারিনি, বেশ হয়েছে। আমি মনে কর্‌ছি, একটু সরে যাই, আপনি কি বলেন ?”

বিদ্যানন্দজী বলিলেন—“তা তুমি না হয় কালীবাড়ীতেই গিয়ে অপেক্ষা কর। আর কোনও চিন্তা নাই। রাজেনবাবু অতি ভদ্রলোক, সমস্তই ভাল বন্দোবস্ত করে দেবেন। দারোগাবাবুটীও বেশ বুদ্ধিমান ও কর্ম্মীলোক দেখা গেল, অন্তরেও ভক্তি বিশ্বাস যথেষ্ট আছে—কোনই গোলযোগ হবে না।”

গঙ্গাধর চলিয়া যাইবার কিয়ৎক্ষণ পরেই দারোগাবাবু আসিয়া বলিলেন—“সব ঠিক হয়েছে, আমি পুলিস-সাহেবকে বলেই সব ঠিক করেছি—এক জন বিশ্বাসী লোক দিয়ে, পুলিসেরই হ্যাঁপাজাতে কালই এখান হতে তাকে রওয়ানা করিয়ে দেবো। সে লোকটী মেয়ের ভাইয়ের বাড়ীতেই তাকে পৌঁছিয়ে আস্‌বে। এখন সাহেবের সাম্‌নে মেয়েটীকে একবার হাজির করা দরকার, আপ্‌নিও চলুন।”

রাজেনবাবু এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, বিদ্যানন্দজীও খুব খুসী হইলেন। রাজেনবাবু মেয়েটীকে সঙ্গে লইয়া দারোগাবাবুর সহিত সাহেবের বাংলায় যাইলেন। বিদ্যানন্দজী ও মনোহরদাসও এই সময় বিদায় লইয়া কালীবাড়ীতে আসিলেন।

পরদিন প্রভাতে যখন ইঁহারা পুনরায় রওনা হইতেছেন, সেই সময় রাজেনবাবুর সহিত মেয়েটী তাঁহাদের প্রণাম করিতে আসিল। তাঁহাদের যত্নে যে, সে উদ্ধার পাইয়াছে, সে বিষয়ে সে কোনও কথা বলিয়া নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিল না বটে, কিন্তু তাহার প্রত্যেক আচরণে, অতি স্পষ্টভাবেই তাহা প্রকাশ হইতেছিল।

বিদ্যানন্দজীরা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, সকলের নিকট বিদায় লইলেন।

পথে সেই কুটীরের নিকট দিয়া যাইবার সময় দেখিলেন, ঘরের দ্বারে আজ আর তালা বন্ধ নাই, দ্বার ভিতর হইতেই বন্ধ বলিয়া বোধ হইল। ঘরের মধ্যেও কাহারও সাড়াশব্দ নাই। তাঁহারা তথায় আর অপেক্ষা না করিয়া, সত্বর অগ্রসর হইয়া যাইলেন। তাঁহারা হতভাগী মেয়েটীর উদ্ধার হইল বলিয়া, খুবই আনন্দিত হইয়াছেন। পথে যাইতে যাইতে তারই বিষয় লইয়া তাঁহাদের অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা চলিতে লাগিল।

"হিন্দুর ঘরের এইরূপ কত বিধবা কন্যাই যে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে সঙ্গের সাথী ও যাত্রীদিগের দ্বারা পরিত্যক্ত ও বিদেশে কত বিধ প্রকারে যে লাঞ্ছিত হইয়া থাকেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।" বিদ্যানন্দজী এই ভাবের আরও একটী হিন্দুবিধবার কথা বলিলেন। সেটী দাক্ষিণাত্য প্রদেশের ঘটনা "তাহার সঙ্গে পাঁচ বৎসরের একটী কুমারী-কন্যাও ছিল, তাহারা কোনও অবস্থাপন্ন ভদ্রঘরের মেয়ে, রামেশ্বর দর্শনার্থ যাইয়া, সঙ্গীদিগের দ্বারা এইভাবে পরিত্যক্ত হইয়া, ভীষণ দুরবস্থায় পড়িয়াছিল। সে দেশের লোক ত তাহাদের একটা কথাও বুঝিতে পারে না, সে বেচারীও কাহারও কথা একটুও বুঝিতে পারে না! মহামুস্কিল; তাহারা কেবল কাঁদিয়াই অস্থির! তখন তিনি (বিদ্যানন্দজী) এই দেশে আসিতেছিলেন। তাহাদের এই দুরবস্থা দেখিয়া, কত আশ্বাস দিয়া, তবে সঙ্গে করিয়া পুরীতে লইয়া আসিলেন। তাহার পর তাহাদের পাণ্ডাদের বাড়ীতে পৌছাইয়া দিলেন। পাণ্ডারা অতি যত্ন করিয়া তাহাদের খুব সেবা

যত্ন করিতে লাগিল ও দুই দিন পরে নিজেদের গমস্তাকে সঙ্গে দিয়া মেয়ে দুটীকে তাহাদের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল।

পাড়া-প্রতিবাসী ও সেথোদের সঙ্গে তীর্থ যাওয়ায় কেবল মেয়েছেলে বলিয়া নহে, অনেক অনভিজ্ঞ বা অল্পবুদ্ধি গ্রামবাসী পুরুষকেও সময় সময় অত্যন্ত নির্য্যাতিত হইতে হয়। মেয়েছেলেরা প্রায়ই অতি সরল বিশ্বাসে তীর্থ-দর্শনের প্রলোভনে সময় সময় যেন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্যা হইয়া পড়েন, কিন্তু বিশেষ আত্মীয়-স্বজন ও যথার্থ সুখ-দুঃখের সঙ্গী-সাথী না পাইলে, কিছুতেই তাঁহাদের বাড়ীর বাহির হওয়া উচিত নহে।

মোসলমান্ সমাজের প্রভাব পরিপুষ্ট ভারতের এই অবরুদ্ধ ও অশিক্ষিত নারী জাতির বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথা ভাবিলে, যথার্থই হৃদয় যেন শিহরিয়া উঠে। ভারতের সেই আদর্শ আর্য্য-মহিলাকুলের অন্তর এক দিন যে তেজঃ, পবিত্রতা ও ধর্ম্মানুকূল-শিক্ষার বিমল প্রভায় উদ্ভাসিত ছিল, আবার এই জননীকুলের অন্তরে সেই সদাচার-পুষ্ট পূত তেজোবহ্নির উদ্বোধন করিয়া দিন্ প্রভো!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আজ গঙ্গাধর, বিদ্যানন্দজী ও মনোহরদাসের সঙ্গে জলন্ধরে আসিয়াছে। স্থানীয় এক পঞ্জাবী ভদ্রলোকের আতিথ্য-গ্রহণ করিয়া, সকলে সেই স্থানেই অবস্থান করিতেছেন। সেই লোকটী বেশ ভক্তিমান্ এবং তাহার বাড়ীর মেয়েরাও তদনুরূপা ভক্তিমতী। তাঁহাদের অত্যন্ত সেবা ও যত্নে তাঁহারা কয়দিবস তাঁহাদের বাটী হইতে অন্যত্র যাইতে পারেন নাই। এই অবসরে তাঁহারা সহরের অন্তর্গত নানা দর্শনীয় স্থান দেখিলেন। অনেকেই তাঁহাদের নিকট সদালাপ করিতে আসিতে লাগিল। পঞ্জাবের সাধারণ গৃহস্থ-হিন্দুমাত্রেই বেশ ধর্ম্ম-বিশ্বাসী ও সাধুসজ্জনের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সেবাপরায়ণ, বিশেষ পঞ্জাবী-মায়েদের ত কথাই নাই।

পঞ্জাবের মধ্যে এই 'জলন্ধর' সহরটী দেখিতে মন্দ নয়। জলন্ধর-বিভাগ ও এই জেলার মধ্যে এইটীই প্রধান সহর। পথ ঘাট উত্তম, লোকজনের বসতিও যথেষ্ট। অতি প্রাচীন কাল হইতে জলন্ধর নানা কারণে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—হিমতীর্থসমূহের মধ্যে এই জলন্ধর খণ্ড অন্যতম। এই খণ্ডের অন্তর্গত 'জলন্ধর' একটী প্রধান শক্তি-পীঠ বলিয়াও প্রসিদ্ধ। ইহা মহামায়ার একান্ন (৫১) মাতৃকা পীঠেরই অন্তর্গত। এস্থানে দেবীর প্রথম স্তন পতিত হয়। এই পীঠদেবী—"ত্রিপুরমালিনী" এবং ভৈরব—"ভীষণ" বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে।

অধুনা শুষ্ক-বেদান্তমূলক মৌখিক শাস্ত্রসমূহের প্রচার-বাহুল্যে, দেবতার বা দেবমূর্ত্তিসমূহে যেন লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা ক্রমশঃ

কমিয়া আসিতেছে। সুতরাং স্থানীয় ভক্তের অভাবে দেবীর তেমন প্রসিদ্ধি নাই। তবে এই জলন্ধর-খণ্ডের অন্তর্গত অন্যতম প্রধান তীর্থ "জ্বালামুখী"-পীঠ অতি প্রসিদ্ধ স্থান—তথায় দেবীর জিহ্বা পতিত হইয়াছিল। তথায় যাইতে হইলে—এইস্থান হইতে হয় "হোসিয়ারপুর" হইয়া বা "পাঠানকোট্" হইয়া যাইতে হয়। "জ্বালামুখীই" এখন যেন জলন্ধর-খণ্ডের মধ্যে প্রধান তীর্থপীঠ।

যাহা হউক এই জলন্ধর-নগর অতি প্রাচীনকালে—শিবানুচর জনৈক যক্ষের রাজধানী ছিল বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়—পুরাকালে ইন্দ্রের অজ্ঞানতা বশতঃ একদা তাঁহার নিক্ষিপ্ত বজ্রে সহসা রুদ্রকপাল আহত হইয়াছিল, তাহা হইতে তখন এক ভীষণ অনল-প্রবাহ বাহির হইতে থাকে। অনন্তর সেই অনল, দেবাদিদেব কর্ত্তৃক সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইলে, একটী অত্যদ্ভুত সুকুমার শিশুর আবির্ভাব হয়। সমুদ্র তখন সেই শিশুটীকে নিজ পুত্ররূপে ভগবান ব্রহ্মার নিকটে অর্পণ করিয়া, তাহার জাতকর্ম্মাদি নির্ব্বাহের জন্য অনুরোধ করেন। ব্রহ্মা তাহাতে স্বীকৃত হইয়া, শিশুটীকে আপনার ক্রোড়ে লইবামাত্র, সে যেন তাহার স্বভাব-সুলভ কর্ম্মেই ব্রহ্মার শ্মশ্রুরাশি ধরিয়া এমন ভাবে আকর্ষণ করিল, যাহাতে ব্রহ্মার চক্ষু হইতে তখন জলধারা পতিত হইতে লাগিল। সেই হেতু শিশুটির নাম "জলন্ধর" রক্ষিত হইল। সেই পুরাকাল হইতে এই প্রদেশটী উক্ত জলন্ধরেরই রাজ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

কালনেমীতনয়া শ্রীমতী বৃন্দার সহিত তাঁহার পরে পরিণয় হইয়াছিল। তিনি কালে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া, স্বর্গরাজ্য পর্য্যন্ত অধিকার করিবার মানসে, স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের সহিত সমর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইন্দ্র তাঁহার ভয়ে দেবাদিদেব মহাদেব শিবের

স্মরণাপন্ন হইলেন, তাহাতে শিবের সহিতও তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জলন্ধর কঠোর সাধনার বলে, পূর্ব্ব হইতেই "কেবল শিব ব্যতীত অন্য সকলের হস্তেই অবধ্য" এইরূপ বর-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পতিপ্রাণা বৃন্দা দেখিলেন—এইবার তাঁহার পতি "জলন্ধরের" আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে, কেন না তিনি যে কেবল শিবহস্তেই বধ্য, অতএব তাঁহার স্বামীর আর নিস্তার নাই। বৃন্দা অত্যন্ত শঙ্কিতা হইয়া, তখন বিষ্ণুর উপাসনামূলক তপস্যা করিতে নিরতা হইলেন। ভগবান বিষ্ণু তদীয় তপস্যায় অতীব প্রীত হইয়া বর দিলেন যে,—"তাঁহার তপস্যাকালের মধ্যে জলন্ধর শিবেরও অবধ্য হইবেন। এদিকে শিব-জলন্ধরের অবিরত ভীষণ রণরঙ্গে ত্রিভুবন বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম হইল। দেবগণ তখন সমস্বরে বিষ্ণুর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে বিষ্ণু অনন্যোপায় হইয়া, দেবকল্যাণার্থে যেন বাধ্য হইয়াই জলন্ধরের রূপ-ধারণপূর্ব্বক বৃন্দার তপোভঙ্গ করিলেন, ওদিকে তাহার স্বামী জলন্ধর তৎক্ষণাৎ শিবের হস্তে নিহত হইলেন।

স্বাধ্বী বৃন্দা পতিবিহনে অত্যন্ত কাতরা হইয়া, যেন জ্ঞানশূন্যা হইয়া পড়িলেন ও বিষ্ণুর এই আচরণে নিতান্ত ক্ষুব্ধা হইয়া, বিষ্ণুর প্রতি অভিসম্পাৎ করিতে উদ্যতা হইলেন। বিষ্ণু তখন বৃন্দাকে নানাবিধ উপায়ে বুঝাইয়া, তাঁহার পতির সহিত সহমৃতা হইতে আদেশ করিলেন ও বিশেষ বর প্রদান করিলেন যে,—"তোমার সেই চিতাভস্ম হইতে আমার অতি প্রিয় বা আমারই অনুরূপ, অতি পবিত্র তুলসী, ধাত্রী, পলাস ও অশ্বত্থ এই চারিটী পুণ্য বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে—তাহা চিরকাল তোমারই পতিব্রতার স্মৃতিরূপে সকলে পূজা করিবে।

জলন্ধরে সেই প্রাচীন আর্য্য-সভ্যতার স্মৃতি-সাক্ষ্যরূপে, অধুনা আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না, কেবল "দেবীতলাও" বলিয়া অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ এক প্রকাণ্ড পুষ্করিণী এখনও আছে এবং একটী দেবীর মন্দিরও আছে। প্রতিবৎসর তথায় এক মেলা হয়।

এই জলন্ধর-খণ্ড এক সময়ে রাজপুত কোটারাজদিগের রাজ্য ছিল। তাহা আলেকজাণ্ডারের ভারতাগমনেরও পূর্ব্বের কথা বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

এক্ষণে এই স্থানে তিনটী প্রধান মেলা হয়। তন্মধ্যে একটী প্রথম—কালোয়াৎ বা সঙ্গীতজ্ঞদিগের সম্মিলন। শুনা যায়, পূর্ব্বে এখানে এক হিন্দু-সাধুমহাত্মা অবস্থান করিতেন, তিনি অদ্বিতীয় সঙ্গীতাচার্য্য বলিয়াও সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। বোধ হয় তাঁহার নাম—"বাবা হরবল্লভজী" হইবে, কারণ এই সঙ্গীতের যে মজলিস বা মেলা হয়—তাহা "হরবল্লভ মাইফেল্" বলিয়া এখন প্রসিদ্ধ। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশ হইতেই প্রতি বৎসর ভাল ভাল সঙ্গীতবিদ্গণ আসিয়া স্ব স্ব গুণপনা প্রদর্শনসহ সঙ্গীতের প্রতিযোগিতা করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর শীতকালে (এক্ষণে—বড়দিনের সময়) এই মেলা হয়। কর্পূরতলার মহারাজ-দরবার এই বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকেন। এই উপলক্ষে এই সময়ে জলন্ধরে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়—"দশহারা-উৎসব", তাহাতে গো-প্রদর্শনীর একটী বিরাট মেলা হয়।

তৃতীয়—ইমাম নস্রুদ্দিন নামে এক খ্যাতনামা ফকির কোন সময়ে এইস্থানে বাস করিতেন। তাঁহারই স্মৃতি-সম্মানার্থ আর একটী বিরাট মেলা হয়। তাহাতেও সহস্র সহস্র লোকের সমাগম

হইয়া থাকে। এই সকল কথা বিদ্যানন্দজীরা স্থানীয় লোকজনদিগের নিকট ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিলেন। গঙ্গাধর এই সমুদায় প্রাচীন বা ঐতিহাসিক-বিষয় জানিবার জন্য যেন স্বভাবতঃ বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিল। অনেক কথা তাহারই প্রশ্নে সকলে জানিতে পারিলেন। সে একখানি ছোট খাতায় তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে লাগিল। তাহার বিশেষ প্রশ্নে জলন্ধরের আর এক পরিচয় পাইয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন।

বিদ্যানন্দজীরা যাঁহার বাটীতে আতিথ্য-গ্রহণ করিয়াছেন—তিনি ভারতের একজন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহৎ ব্যক্তির বংশধর। দিল্লীশ্বর সম্রাট আকবরের সুপ্রসিদ্ধ রাজস্বসচীব ও সেনাপতি মহানুভব টোডরমল সাহেব তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। সম্রাট তাঁহার গুণে অতীব প্রীত হইয়া, পুরস্কারস্বরূপ এই "জলন্ধর" তাঁহাকে জায়গীররূপে প্রদান করিয়াছিলেন। টোডরমলের স্বহস্তরচিত এক প্রকাণ্ড উদ্যান এখনও বিদ্যমান আছে। সেই ভদ্রলোকটী তাহা বিদ্যানন্দজীদের দেখাইয়া আনিলেন। তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ বৃক্ষ টোডরমলের স্বহস্তরোপিত, তাহাও তিনি নির্দ্দেশ করিলেন।

টোডরমল পঞ্জাবী হইলেও, তিনি বাঙ্গালীরও বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনিই বঙ্গ-বিজয় করিয়া, বাঙ্গলার পাঠান-রাজাদিগের হস্ত হইতে সমগ্র বাঙ্গলা-প্রদেশ মোগল-শাসনাধীন করিয়া দেন। তিনি যেমন নীতিজ্ঞ ও ধীর ছিলেন, তেমনই অতিশয় ধর্ম্মাত্মা, নির্লোভ ও অমায়িক ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। সেই কারণেই তিনি আজও সর্ব্বত্র চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। তাঁহারই কৃত ভারতের ভূমি-বন্দোবস্ত ও রাজকর-নির্দ্ধারণ সম্রাট আকবর কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

ভদ্রলোকটী তাঁহার সেই পিতৃপুরুষের এইরূপ পরিচয়-গর্ব্বে আনন্দিত হইয়াও, নিজেদের বর্ত্তমান হীনাবস্থার কথা, বলিয়া কত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিদ্যানন্দজী তাঁহার সরলতা ও আদর আপ্যায়নে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তিনি যে তোডরমলের বংশের উপযুক্ত সন্তান, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক পাঞ্জাবীদের চিরপ্রসিদ্ধ আতিথ্যসৎকার, বিশেষ সাধু-শাক্তসেবারূপ গার্হস্থ্যব্রতের তিনি যেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহার অবস্থা এই সময়ে পূর্ব্বের তুলনায় নিতান্ত দীন হইলেও, তিনিই গঙ্গাধরআদি সাধুত্রয়ের জ্বালামুখী তীর্থ-দর্শনের যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

জ্বালামুখী যাইবার—দুইটী পথ আছে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বিদ্যানন্দজীরা বর্ত্তমান পাঠানকোটের পথে না যাইয়া, সেই ভদ্রলোকেরই ইচ্ছাক্রমে প্রাচীনপথ হোসিয়ারপুর হইয়াই যাত্রা করিলেন। অধুনা জলন্ধর হইতে হোসিয়ারপুর যাইবার 'নর্থ-ওয়েষ্ট-রেলওয়ের' শাখা রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছে। অমৃতসর হইয়া পাঠানকোট্ যাইবারও স্বতন্ত্র শাখা-রেলপথ আজকাল হইয়াছে। যাত্রীরা এখন যাহার যেদিক দিয়া ইচ্ছা যাইতে পারে। উক্ত পাঠানকোট্ হইতে এক্ষণে মোটারলরিও চলিতেছে, তাহাতে কাঙ্গড়া হইয়া জ্বালামুখী যাইবার বেশ সুবিধা হইয়াছে। আবার হোসিয়ার পুর হইতে এক্কা বা এদেশীয় ভাষায় "জেক্কায়" করিয়াও জ্বালামুখী যাওয়া যায়।

বিদ্যানন্দজীদের পদব্রজে আর যাইতে হইল না, সেই ভদ্রলোকটী নিজের গাড়ী করিয়া তাঁহাদের হোসিয়ারপূরে পৌঁছাইয়া দিবার

ব্যবস্থা করিলেন। জলন্ধর হইতে হোসিয়ারপুর প্রায় বার তের ক্রোশ হইবে।

তাঁহারা যথাসময়ে হোসিয়ারপুরের সহরের বাহিরে এক ধর্ম্ম-শালায় আসিয়া পৌঁছিলেন। এখানে একটী সুন্দর জলাশয় আছে। এদেশের ভাষায় তাহাকে "বাউলী" বলে। একটী গোলাকার কূপ বা স্বল্পগভীর জলের কুণ্ড, তাহার চারিদিকে পাথর দিয়া সুন্দর করিয়া বাঁধান রহিয়াছে। পার্শ্বে একটী দেবমন্দির ও ধর্ম্মশালা আছে। সহরের অধিকাংশ নর-নারী প্রত্যহ প্রাতে এই বাউলীতে স্নান করিতে আসে। গঙ্গা-সমীপবর্ত্তী গ্রামগুলি হইতে যেমন অনেকে নিত্য গঙ্গাস্নান করিতে যায়, হোসিয়ারপুর অঞ্চলের অধিকাংশই সেইরূপ এই বাউলীতে আসিয়া স্নানাহ্নিক করিয়া শান্তি ও আনন্দ লাভ করে। ইহার বিশেষত্ব এই যে, বাউলীর একদিক হইতে অবিরত-ধারে, ধীরে ধীরে জলপ্রবাহ আসিতেছে, আর অন্যদিক দিয়া সেই জল ক্রমাগত ধীরে ধীরে বাহির হইয়া যাইতেছে। এইটী কেবল পুরুষ-দিগের স্নানের জন্যই নির্দ্দিষ্ট, স্ত্রীলোকদিগের জন্য নিকটে আর একটী বাউলী নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহার চারিদিক বেশ গাছপালা দিয়া ঘেরা। বাহির হইতে তাহার মধ্যে কিছুই দেখা যায় না। তবে বাহির হইতে সতত নারীকণ্ঠের কলরব, সেই স্থানে বাউলীর অস্তিত্বের পরিচয় দেয়। নিকটে ও দূরে আরও কয়েকটী বাউলী আছে। কোন কোন বাউলীতে নির্জ্জনতাপ্রিয় সাধুসন্ন্যাসীরাও স্থায়ীভাবে তাহার পার্শ্বে কুটীরাদি নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করেন। যাহা হউক এই বাউলীটীর মধ্যে কেহই অবতরণ করিয়া স্নান করে না, দেখা গেল। সকলেই ঘটী বা লোটা অথবা এদেশীয় ভাষায় "গড়্‌বী" করিয়াই জল তুলিয়া স্নান করে। মোটের উপর ইহার

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিতে সকলকেই বিশেষ মনোযোগী দেখিতে পাওয়া যায়।

গঙ্গাধর, বিদ্যানন্দজী ও মনোহরদাস তিনজনেই সেই বাউলীতে স্নানাদি করিয়া, তাহারই পার্শ্বে এক বেদীর উপর বসিয়া সন্ধ্যাআদি কৃত্যসমূহ সমাপন করিতেছেন। তাঁহাদের সেই পবিত্রোজ্জ্বল কান্তি ও সৌম্যভাব দেখিয়া, সকলেই যেন নির্নিমেষ নেত্রে শ্রদ্ধান্বিত অন্তরে তাঁহাদিগকে দর্শন করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একটী প্রৌঢ়বয়স্ক পঞ্জাবী ভদ্রলোক অত্যন্ত ভক্তিভাবে তাঁহাদের প্রণাম করিয়া নিকটে উপবেশন করিলেন ও তাঁহাদের সাধন-পূজাদি সমাপ্ত হইলে, কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতে এবং তাঁহাদের গমনাগমনাদি বিষয়েও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তিনি 'অমৃতসর'-নিবাসী এক ক্ষত্রীয় মহাজন। কোন কার্য্যোপলক্ষে হোসিয়ারপুরে আসিয়াছেন। লোকটী খুব সৎসঙ্গ-প্রয়াসী, ইহাঁদের পাইয়া নানা প্রশ্ন-যোগে ধর্ম্ম-বিষয়ের আলোচনায় যেন পরম আনন্দ-লাভ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনিই তাঁহাদের সেদিনকার ভিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। স্থানীয় মন্দিরের পূজারীকে দিয়া সেই সকল বস্তুর ব্যবস্থা-পূর্ব্বক তাঁহাদের ভিক্ষান্তে নিজেও তথায় প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

এখানে সাধু-সন্ন্যাসীরা আসিলে, কেহ না কেহ এইভাবে তাঁহাদের সেবা-সৎকার করিয়া থাকেন। পাঞ্জাবী মায়েরা পুরুষদিগের অপেক্ষাও অধিক ভক্তিমতী ও সাধু-সেবাপরায়ণা। তাঁহারাও অধিকাংশ সময়ে স্ব স্ব গৃহ হইতে নানাবিধ ভোজ্য-সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া সাধুদের ভিক্ষা করাইয়া যান। সময় সময় তাঁহাদের বাটীতেও আমন্ত্রণ

করিয়া সাধু-শাক্তদিগকে লইয়া যান ও অতি পরিতোষরূপে তাঁহাদের সাধ্যমত সেবা করান।

বিদ্যানন্দজীরা তাহার পরদিবস এই ভাবে এক ব্রাহ্মণ-গৃহস্থের বিশেষ অনুরোধে তাঁহারই বাটীতে যাইয়া, মধ্যাহ্ন-ভিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। রাত্রিকালেও তাঁহারা বাটী হইতে দুগ্ধ ও অন্যান্য আহার্য্য দ্রব্যাদি তাঁহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া গেল।

এই অঞ্চলে ডাল-রুটী ও অন্ন-ব্যঞ্জনাদির স্পর্শাস্পর্শের সেরূপ বাঁধাবাঁধি কোনও নিয়ম নাই। সদ্‌জাতীয় হিন্দুমাত্রেই প্রায় একত্র বসিয়া ভোজনাদি করে, তাহাতে কাহারও জাতি-নাশ হয় না। এই সব প্রদেশে বাজারে জলখাবার বা মিষ্টান্নাদির দোকানের ন্যায় ডাল, ভাত, রুটী, তরকারীর সারি সারি দোকান দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় সকল জিনিষ প্রায় সর্ব্বসময়েই গরম গরম তৈয়ার হইতেছে ও বিক্রয় হইতেছে। সেই সমুদায় দোকান সাধারণতঃ "তোন্দুর" বলিয়া পরিচিত। 'তোন্দুর' অর্থে একপ্রকার 'উনান' বা 'চুলা'। তাহার মধ্যে পূর্ব্ব হইতে কাষ্ঠাদি জ্বালাইয়া অগ্নিপূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। প্রয়োজন মত তাহার মধ্যেই রুটী দিয়া সেঁকিয়া বাহির করিয়া লইতে হয়। সেই রুটী যেরূপ কোমল ও সুস্বাদু হয়, চাটুতে সেঁকা রুটী সেরূপ হইতেই পারে না। অনেক ভদ্র-গৃহস্থ-বাড়ীতেও তোন্দুরের ব্যবস্থা আছে। দোকানে যে কেহ রুটী খাইতে আসিলে, খাটিয়ার উপর, তক্তার উপর বা জমীতে বিস্তৃত চ্যাটাইয়ের উপর বসিয়াই, আহার করিয়া চলিয়া যায়। দোকানদারের লোক তাহা পরিষ্কার করিয়া লয়। সেই সমুদায় আচার সম্পূর্ণ ম্লেচ্ছভাবাপন্ন; তাহা দেখিলে, নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণ অবশ্যই ঘৃণাবোধ করিবেন।

হিন্দু ও মোসলমানদের ভিন্ন ভিন্ন তোন্দুর আছে। নূতন লোক এখানে আসিয়া, সহসা তাহার পার্থক্য সহজে বুঝিতে পারে না। হয় ত ভুল করিয়া কোন হিন্দু, মোসলমানের দোকানে যাইলে, সে দোকানদারই "হিন্দুর দোকান নহে" বলিয়া, খরিদ্দারকে বুঝাইয়া দেয়। তবে এখানে তাহাদের পার্থক্য-পরিচায়ক চিহ্ন এই যে, হিন্দুদিগের তোন্দুর বা দোকানের সম্মুখে কতকগুলি পিতলের হাঁড়ি উপর উপর সাজান থাকে এবং মোসলমানদিগের দোকানে কলাই-করা ডেক্‌চিগুলি উপর্য্যুপরি সাজান থাকে। এই চিহ্ন মাত্র দেখিয়াই হিন্দু বা মোসলমানগণ আপনাদের আপনাদের তোন্দুরে যাইয়া আহারাদি করে।

এই অঞ্চলে সাধারণ লোক প্রায় অনেকেই ঘরে নিত্য অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করে না, এই তোন্দূরে আসিয়াই ভোজন করিয়া যায়। ভদ্র-গৃহস্থগণও পথে-ঘাটে বা গ্রামান্তরে যাইলে, এইরূপ তোন্দুরে খাইতে দ্বিধা বোধ করেন না। বঙ্গদেশ ও তাহার বাহিরে, বেহার হইতে কনৌজ-প্রান্ত পর্য্যন্ত যেমন উৎকট স্পর্শাস্পর্শীভাবই সনাতন আর্য্য-আচার-ধর্ম্মের এখন যেন সার অনুষ্ঠানরূপে পরিণত হইয়াছে, পঞ্জাব-প্রদেশটী তেমনই তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানের হিন্দুদের মধ্যে সে সবের যেন কোনই বালাই নাই!

সারা বেহার, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা ও কনৌজ আদি অঞ্চলে এক্ষণে যেন সনাতন-ধর্ম্মের চারিটী প্রধান অঙ্গ—১। **'লোটা'**, ২। **'ফোঁটা' (তিলক)**, ৩। **'ছিটা'** ও ৪। **'চৌকা'তেই** পরিণত হইয়াছে। এই চতুর্ব্বিধি বাহ্য-আচার একেবারেই অপরিত্যজ্য বিষয় বলিয়া, তাহা যেন সমাজের অস্থিমজ্জায় সংজড়িত। তাই "বারা (দ্বাদশ) কনৌজিয়ার

তেরা (ত্রয়োদশ) চুলা বা চৌকা” বলিয়া এক প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে।

ধর্ম্মের মূল বা সার বস্তু অঙ্গহীন হইলে, তাহার বহিরঙ্গের স্থূল অসার আচারটীও অতি বিকৃত হইয়া যায়। উক্ত প্রদেশের আচারগুলি ভীষণ বিকৃত হইয়াও, এখনও কিছু আছে, কিন্তু এই পঞ্জাব প্রদেশে সেই আচারের আজ যেন চিহ্নমাত্রও নাই, সবই একাকার। উত্তর-পশ্চিম দেশের প্রত্যেক গ্রামের এমন কি সহরেরও অধিকাংশ ব্রাহ্মণ-সন্তান এক্ষণে ‘গায়ত্রী’ পর্য্যন্তও জানে না, নিজেদের গোত্র-প্রবরেরও কোন সংবাদ রাখে না, পূজা-পাঠ জপ-তপ ত অতি দূরের কথা! জিজ্ঞাসিত হইলে, অতি গর্ব্বভরে হয় ত বলিবে,—“আমাদের গোত্রাদি আমার ঠাকুরদাদা জানিত” অথবা “আমাদের গ্রামের বা অমুক গ্রামের অমুক ব্যক্তি জানেন।” অথচ তিনি “পণ্ডিতজী”, চাষাভূষার ন্যায়ই অতি সাধারণ নীচ-কর্ম্ম-পরায়ণ। দেখিলে—ব্রাহ্মণের কোন লক্ষণই সহসা তাঁহাতে বোধ হইবে না। কিন্তু বঙ্গদেশীয় কোন উচ্চকুলশীল-সম্ভূত সুবিজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী, অতি নিষ্ঠাবান, পবিত্রচেতা কোন ব্রাহ্মণের অন্ন ত গ্রহণ করিবেই না, অধিকন্তু তাহাদের সেই কয়লার আঁচড় পাড়া বা মাটীর লেপ দেওয়া **‘চৌকার’ বা গণ্ডীর** মধ্যে পা বাড়াইলেই তাহাদের সব নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহার মধ্যে তাহাদের স্ব-শ্রেণীয় বা স্বদেশীয় অন্য ব্রাহ্মণও প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাহাদের চৌকার এতই কড়াকড়ি বিধান! অন্যের জলের ‘ছিটা’ মাত্র পড়িলেও, সে ‘চৌকা’ নষ্ট হইয়া যাইবে।

মূত্র-ত্যাগান্তে জলশৌচ করা, অতি নিষ্ঠাবান শিক্ষিত ব্রাহ্মণেরও উক্ত প্রদেশে পরিজ্ঞাত নাই, সুতরাং অভ্যাসও নাই। বর্ত্তমান

সময়ের ইংরাজী-শিক্ষিত বা তদ্ভাবাপন্ন ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতীয় বাঙ্গালীরাও তাহা ক্রমে ভুলিয়া গিয়াছে। তবে জর্ম্মানী ও আমেরিকার সুবিজ্ঞ ডাক্তারগণ আজকাল তাহার উপকারিতার বিষয়ে আলোচনা ও তাঁহাদের সেই অভ্রান্ত উপদেশসমূহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া, কেহ কেহ মূত্রত্যাগান্তে জলশৌচ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান-যুগের যেন বেদব্যাস পাশ্চাত্য-প্রদেশের সুধীমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত-বাক্য ব্যতীত আমাদের ঋষিবাক্য এক্ষণে কেহই আর বিশ্বাস করিতে পারেন না। কিন্তু হিন্দুর চক্ষে ঘোর অনাচারী, অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত মোসলমান-সমাজ তাঁহাদের ধর্ম্মের আচারানুগত প্রস্রাব-ত্যাগান্তে জলশৌচের প্রাচীন ব্যবহার এখনও পরিত্যাগ করেন নাই। শিক্ষাগর্ব্বীদিগের ইহাও অবসরমত চিন্তার বিষয় নহে কি?

মলত্যাগের পর শৌচ করিয়া উক্ত 'চৌকা'বাদীরা হস্তে "হাতে মাটী" না করিয়াই, সেই হস্তে **'লোটা'টী** হয় ত ধরিয়া আনিবেন, অথবা সেই হস্তেই তাঁহার সাধের লোটাটী প্রাণভরিয়া মাজিতে বসিবেন, অনন্তর এই ভাবে পবিত্রীকৃত লোটাটী রজ্জু-সহযোগে নির্ব্বিকারে কুঁয়ার মধ্যে নামাইয়া দিবেন। তাহাতেই লোটা পবিত্র হইয়া যাইবে, তখন তাহাতে পুনঃ পুনঃ জল তুলিয়া তাঁহার হাত মুখ ধুইবেন। অথচ অন্য কেহ সেই লোটা পবিত্র হস্তে স্পর্শ করিলেই, তাহা অপবিত্র হইবে ও পুনরায় মাজিয়া লইতে হইবে। লোটা ধরিয়া আলগোছে জল খাইলেও, তাহা তখনই নষ্ট হইবে ও পুনরায় তাহা না মাজিলে, কাহারও কোনরূপ ব্যবহারে আসিবে না।

'চৌকা' ও লোটার কথা হইল, এইবার 'ফোঁটা' অর্থাৎ

তিলকের কথা। যা'তা' ছাই মাটী বা চন্দনাদি কোন বস্তুদ্বারা কপালের উপর একটা তিলক বা ত্রিপুণ্ড্রক আদি দেওয়া চাই। আর্য্য-আচারের ইহা অবশ্যই একটী পূত বিশিষ্টতা। অনার্য্য সমাজের সহিত এই **তিলক, শিখা ও সূত্রাদি** পার্থক্যসূচক আর্য্যত্বের পরিচায়ক। ইহা হিন্দু বা আর্য্যমাত্রেই চিরকাল নির্ব্বিচারে যথাস্থানে ধারণ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে অন্যান্য আচারের প্রতিও সকলের সমান লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। কেবল ফোঁটা কাটিলেই যে অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু হওয়া যায়, তাহা নহে। তবে সেই আচারহীন 'চৌকা' ও 'লোটা'বাদীরা —তুমি যেই হও না, "তুম্ ভরাষ্ট্" বা ভ্রষ্টাচারী, বলিয়া যখন তোমার প্রতি ঘৃণার চক্ষু দেখায় বা ভ্রুকুটী করে, তখন যেন ভীষণ বিষদৃশ বলিয়া বোধ হয়!

যাহা হউক হিন্দুর আচাররূপে 'যাহা কিছু—তাঁহাদের এখনও আছে, এই পঞ্জাবে কিন্তু তাহার কিছুই নাই। পোষাক পরিচ্ছদেও ভিন্ন প্রান্তীয় ব্যক্তি সহসা বুঝিতে পারিবে না যে এ দেশের কে হিন্দু বা কে মোসলমান! তবে ইহাদের মধ্যে হিন্দুত্বের যে যথেষ্ট **আন্তরিকতা** আছে, তাহা দেখিলে, হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যায়। প্রয়োজন হইলে, ইহারা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে তিলমাত্রও বিলম্ব করিবে না। সাধু-শান্ত্‌জনের প্রতি ইহাদের যে প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা আছে, তাহা ত পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

আরবে মোস্‌লেম ধর্ম্মের প্রচারের পর, আফ্‌গান্‌স্থান ও বেলুচি-স্থান আদি প্রদেশের হিন্দুগণ ক্রমে সেই নবীন-ধর্ম্মে অনুপ্রাণীত ও অধিকাংশ পরাক্রান্ত ব্যক্তির সহিত সেই সেই দেশের নরপতি-গণও যখন তাহাতে দীক্ষিত হইলেন, তখন হইতেই পঞ্জাব-প্রান্তীয়

হিন্দুগণ সেই ধর্ম্মান্তর-বিশ্বাসী প্রতীবেশীদের অত্যধিক সম্পর্কে ক্রমে এতদূর আচারভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর বহু কালাবধি সেরূপ শক্তিশালী আচারবান আদর্শ শিক্ষকেরও যথেষ্ট অভাব বিধায়, ইহাদের ধর্ম্ম-সম্পদের এতই হানতা উপস্থিত হইয়াছে। সেই কারণেই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের শাখা-প্রশাখাস্বরূপ "শিখধর্ম্ম" ও "আর্য্যধর্ম্ম" আদি কোন কোন উপধর্ম্ম দেশ-কাল-পাত্রের অনুকূল-রূপে মধ্যে মধ্যে সাময়িকভাবে পঞ্জাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

অতীব আনন্দের বিষয়, অধুনা সনাতন-ধর্ম্মের রহস্য-জ্ঞাত হইবার জন্য ও সনাতনী প্রকৃত আচারের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্য, ইহাঁদের অনেকেই যেন পুনরায় বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। তাহার ফলে পঞ্জাবের নানা স্থানে সনাতন-ধর্ম্ম-বিদ্যালয় ও ধর্ম্মস্বভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

বিদ্যানন্দজীরা যখন এই প্রদেশে তীর্থ-পর্য্যটনের জন্য উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা পঞ্জাবের উক্তরূপ আচারহীনতা ও ধর্ম্ম-বিষয়ে দীনতা দেখিয়া, নিতান্তই ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহারা নিজেদের তীর্থদর্শন ব্যতীত, পঞ্জাবে যথার্থ ধর্ম্ম-বিজ্ঞান প্রচারেও মনোযোগী হইলেন। মনোহরদাস ও গঙ্গাধর আদর্শ ব্রহ্মচারীদ্বয় তাঁহার উভয় হস্তের ন্যায় সতত সর্ব্ববিষয়ে সহায়তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তখন হইতেই স্থানে স্থানে সভা করিয়া, বা প্রবীন ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া, ধর্ম্ম-বিষয়ে নানা উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। অনেকেই তাঁহাদের প্রতি নিতান্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, অতি আগ্রহ-সহকারে গ্রাম-গ্রামান্তরে তাঁহাদিগকে লইয়া যাইতে লাগিলেন,

তাঁহাদের উপদেশক্রমে এক্ষণে অনেকেই পুনরায় হিন্দুর প্রকৃত আচারে আস্থাবান হইলেন, কেহ কেহ তদ্বিষয়ে যথাসম্ভব শিক্ষা-দীক্ষাও গ্রহণ করিলেন।

স্থানীয় ব্যক্তিদিগের এইরূপ আগ্রহ দেখিয়া, বিদ্যানন্দজীরা এই অঞ্চলে আর্য্য-সভ্যতামূলক আচার ও নিত্যকর্ম্মের শিক্ষা এবং উপদেশ প্রদান করিতে করিতে ধীরে ধীরেই চিন্তাপূর্নীর দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা এখন যেখানেই যান, সেইখানেই তাঁহাদের আর আদর-যত্নের অভাব হয় না। সেই কারণ তাঁহাদের তীর্থযাত্রা অতি ধীরভাবেই চলিতে লাগিল; তাঁহারা, তীর্থদর্শন-উপলক্ষে এমন একটী বিরাট কর্ম্মযোগ পাইয়া, পরম পুলকিত হইলেন, গঙ্গাধরের ত উৎসাহ ধরে না, সে তাহার মনোহরদাদার সহিত সততই সেই সব বিষয়ে বিবিধ আলোচনা ও কার্য্য-বিধির ক্রম নির্দ্ধারণপূর্ব্বক তাহা লিপিবদ্ধ করিতে লাগিল ও অবসর মত বিদ্যানন্দজীকে তাহা দেখাইয়া লইতে লাগিল। বিদ্যানন্দজীও তাহা দেখিয়া বিশেষ পরিতুষ্ট হইলেন ও তাহাকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক উৎসাহ-প্রদান করিতে লাগিলেন।

হোসিয়ারপুর হইতে চিন্তাপূর্নী যাইতে প্রথম চটী বা পড়াও— 'গাগ্‌রেট্' পড়ে। তাহা প্রায় সাড়ে সাত ক্রোশ পথ, পার্ব্বত্য-ভূমির উপর দিয়াই বরাবর গিয়াছে। স্থানে স্থানে অনেকটা চড়াই-উৎরাই আছে। প্রথমে একটী বালুকাময় শুষ্ক পার্ব্বত্য-নদী পার হইয়া যাইতে হয়। তাহা অবশ্য বর্ষাকালে শুষ্ক থাকে না, তখন জলে পূর্ণ হইয়া যায়। এই পথে গরুরগাড়ী ও এক্কা বা জেক্কা-গাড়ীও চলে। পথের ধারে অনেক চিড়-গাছের জঙ্গল পাওয়া যায়। 'চিড়' বৃক্ষ সরল-কাষ্ঠের বা গন্ধবিরাজের বৃক্ষ। ইহার

কাষ্ঠই সরলকাঠ, ইহার আটা বা নির্যাসকে গন্ধবিরাজ বলে, ইহা হইতে যে তৈল বাহির হয়, তাহাই টার্পিণ-তৈল বলিয়া প্রসিদ্ধ। এদিকের দৃশ্যও সাধারণতঃ মন্দ নহে।

'গাগ্‌রেট্' একটী ছোট বাজার, এখানে কয়েকখানি ছোট ছোট দোকানপত্র আছে। তাহাতে যাত্রী বা পথিকদিগেরই উপযোগী জিনিসপত্র—চাল, ডাল, আটা, গুড়, আলু, ঘৃত, লবণ ও মশলা ইত্যাদি সবই কিছু কিছু পাওয়া যায়। এস্থানে জলকষ্ট অত্যন্ত অধিক। বাজারে একটীমাত্র কুঁয়া আছে, তাহাতে তেমন জল নাই, দূরে গ্রামের মধ্যে একটী কূপ আছে, তাহারই জল কতকটা পানের উপযুক্ত।

গঙ্গাধর মনোহরদাসের সঙ্গে স্নানাদি নিত্যকর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক ভিক্ষা প্রস্তুতের যোগাড় করিতে লাগিল। বাজারের ব্যবসাদার যাত্রী-প্রবঞ্চক দোকানদারদিগের নিকট সাধুদের সেরূপ আদর যত্ন হইল না; তাহারা যেন ভাগাড়ের শকুনীর ন্যায় সতত নূতন নূতন যাত্রীর দিকেই তীব্র লক্ষ্য রাখিয়া বসিয়া আছে। তাহাদের নিকট সাধু-গৃহস্থ অতিথি-অভ্যাগত কিছুই নাই। তাহাদের নিকট কেবল কেনা-বেচার কথা ব্যতীত অন্য কোন কথারই প্রায় সদুত্তর পাওয়া যায় না।

গঙ্গাধর প্রথমে পানীয় জলেরও সন্ধান করিতে পারে নাই, পরে এদেশীয় অন্য একটী যাত্রীর সাহায্যে গ্রাম হইতে পানীয় জল ও একটী পাকের স্থানের ব্যবস্থা করিতে পারে। সেই লোকটী তাঁহাদের যথেষ্ট সেবা-যত্ন ও সর্ব্ববিষয়ে সহায়তা করিতে থাকে। ভিক্ষা প্রস্তুত হইলে, তাঁহারা সেই যাত্রীটীকেও ভোজনোপযোগী আহার্য্য দিয়া, নিজেরা ভিক্ষায় বসিলেন। অনন্তর সেই স্থানেই

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, অপরাহ্ণ প্রায় চারিটার পর তাঁহারা পুনরায় বাহির হইয়া পড়িলেন।

প্রায় তিন ক্রোশ হইবে পথ চলিয়া, সন্ধ্যার সময় তাঁহারা 'কেঁরিয়া' নামক একটী ছোট চটীতে আসিয়া পৌছিলেন। এই পথটীতে পাহাড়ের উৎরাই অধিক থাকায়, তাঁহাদের আসিতে বিশেষ কষ্ট হইল না, তবে অধিক বিলম্বও হইল না। এইস্থানে "পড়িকি" মহাদেবের একটী মন্দির আছে। চটীতে যে দোকান খানি আছে, তাহাতে সকল সময় সুবিধামত জিনিষপত্র তেমন থাকে না। যাত্রীর আধিক্য হইলে, লুচী-পুরীও সময়মত প্রস্তুত হইতে পারে, দোকানে সেরূপ ব্যবস্থাও আছে। যাহা হউক সন্ধ্যার পর কিছু দুধ পাওয়া গেল, তাহাই তিনজনে কিছু কিছু পান করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, আর কয়েকটী এদেশীয় যাত্রী তথায় উপস্থিত হইয়া, সেই চটীর মধ্যেই তাঁহাদের পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহারাও চিন্তাপূর্ণী যাইবে, বলিল।

জ্যোৎস্নারাত্রি ভোর হইতে না হইতে তাহারা উঠিয়া যাইবার জন্য উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিল। গঙ্গাধরআদিও তাহাদেরই সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। এই পথটী মন্দ নহে, স্থানে স্থানে পাহাড়ী চিড়্ ও অন্যান্য বৃক্ষলতাদির সমাবেশে দৃশ্য বেশ সৌন্দর্য্যপূর্ণ ও মনোরম। মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের চড়াই-উৎরাইও সামান্য সামান্য আছে। তাঁহারা সেই যাত্রীদের সহিত নানা ধর্ম্মবিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে, মনের আনন্দে বেলা প্রায় নয়টার মধ্যেই চিন্তাপূর্ণিতে আসিয়া পৌছিলেন। পূর্ব্বোক্ত কেঁরিয়া চটী হইতে এই চিন্তাপূর্ণী-স্থান প্রায় চারি ক্রোশের কিছু অধিক হইবে। সেই হোসিয়ারপুর হইতে মোট পনের ক্রোশ হইবে।

পঞ্জাবের হোসিয়ারপুর জেলার মধ্যে হিমালয়ের পর্ব্বতশ্রেণীর এক নিম্ন-অংশে পাহাড়ের উপরেই এই চিন্তাপূর্ণী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এই স্থানের উচ্চতা সমুদ্র-জলস্তর হইতে ৩৮৯৬ ফিট। এই চিন্তাপূর্ণী-তীর্থ ভারতের অতি প্রাচীন ও পবিত্র শক্তি-পীঠ। দশমহাবিদ্যার অন্যতমা ছিন্নমস্তা দেবীই এ প্রদেশে অধুনা চিন্তাপূর্ণী নামে প্রসিদ্ধা। ইনি ভক্তের সকল চিন্তা পূর্ণ করেন বলিয়া, এদেশের লোক সাধারণতঃ ইঁহাকে 'চিন্তাপূর্ণী' বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। মন্দিরে দেবীর ধ্যানানুগত কোনও মূর্ত্তি নাই। কেবল শিলাপিণ্ডময়ী-মূর্ত্তিই রজতাসনে স্থাপিতা দেখা গেল। তাঁহার উপরে রৌপ্য ও স্বর্ণ-বিনির্ম্মিত ছত্রাদিদ্বারা সুশোভিত রহিয়াছে। প্রস্তরনির্ম্মিত দেবীর মন্দিরটী দেখিলে, তাহা অতি প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়।

চৈত্র ও বৈশাখ মাসে ভারতের নানা স্থান হইতে সহস্র সহস্র ভক্ত-সন্তান আসিয়া মায়ের দর্শন পূর্ব্বক অপার আনন্দ লাভ করে। হোসিয়ারপুর হইতে এথান পর্য্যন্ত আসিবার জন্য সকল সময়েই এক্কা বা জেক্কা এবং গরুরগাড়ী পাওয়া যায়। অনেকে তাহাতেই আসিয়া থাকে। গাড়ী মন্দির পর্য্যন্ত যায় না, এক মাইল আন্দাজ থাকিতেই গাড়ী হইতে নামিয়া, পাহাড়ের উপর উঠিতে হয়। মন্দির সেই পাহাড়ের উপরেই।

দেবীর পূজারী বা পাণ্ডারা বেশ সজ্জন ও সৎ-ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত, উত্তম গৃহস্থ। তাঁহাদের সামান্য সামান্য শাস্ত্রচর্চ্চাও আছে। পণ্ডিত নাথুরাম ও তাঁহার এক সন্তান বিদ্যানন্দজীদের বিদ্যা ও সাধনসামর্থ্যের পরিচয় পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন। ধর্ম্ম ও শাস্ত্রালোচনায় পরিতৃপ্ত হইয়া, তাঁহাদিগকে অতি শ্রদ্ধা ও যত্নসহকারে

ভিক্ষা করাইলেন। বিশ্রামান্তে নাথুরামজীর উদ্যোগে স্থানীয় ব্রাহ্মণগণের একটী সভা হয়। তাহাতে বিদ্যানন্দজী সভাপতি মনোনীত হইলেন, মনোহরদাস ও গঙ্গাধর যথাক্রমে "ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য" ও "ব্রহ্মচর্য্যমাহাত্ম্য"-বিষয়ে দুইটী উপাদেয় বক্তৃতা করে। সকলে শুনিয়া পরম পরিতৃপ্ত হন। বিদ্যানন্দজী পরে "ভক্তি"-বিষয়ে একটী অতি সুন্দর ব্যাখান প্রদান করেন। তাহাতে সকলেই যেন মুগ্ধ হইয়া যান। পাণ্ডাদিগের নিকট তাঁহাদের আদর আর ধরে না। তাঁহাদিগকে তাঁহারা ছাড়িতেই চান্ না। সুতরাং বাধ্য হইয়া তথায় আরও এক দিন তাঁহাদের থাকিতে হইল।

সকল তীর্থেই পাণ্ডারা যেরূপ ভীষণ যাত্রীপীড়ক হইয়া পড়িয়াছে, ছল বল বা যেন-তেন প্রকারেণ যাত্রীদের নিকট হইতে অর্থ-শোষণ করাই যেন তাহাদের প্রধান ধর্ম্ম বা লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে, চিন্তাপূর্ণীর পাণ্ডারা যে সেই আত্মধর্ম্ম হইতে একেবারেই বিচ্যুত, তাহা নহে! প্রয়োজন মত স্ত্রীলোক ও সাদাসিধা যাত্রীদের উপর অল্প-বিস্তর পীড়াপীড়ি অবশ্যই করিয়া থাকে, তবে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা তাহা যে সামান্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিদ্যানন্দজীদের পরামর্শে চিন্তাপূর্ণীতে একটী "ব্রহ্মচর্য্য-পাঠশালা" খুলিবার ব্যবস্থা স্থির হয়। যাহাতে তাহা সত্বর কার্য্যে পরিণত হয়, সে বিষয়ে স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে সেই দিন হইতেই রীতিমত চাঁদা তুলিবার আয়োজন হইতে লাগিল। গঙ্গাধর তাহার পূর্ব্বলিপিবদ্ধ খাতা হইতে ব্রহ্মচর্য্য-বিধানের কর্ত্তব্য ও সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলীর সমস্তই হিন্দী ভাষায় প্রতিলিপি করিয়া দিল।

এস্থানেও সামান্য জল-কষ্ট আছে। দূর হইতে ঝরণার জল সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয়। যাত্রীদের পানাহারাদির জন্য জল

পাণ্ডারাই লোক দিয়া আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেয়। মন্দিরের সংলগ্ন একটী ছোট খাট বাজারও আছে, প্রয়োজন মত প্রায় সকল দ্রব্যই তথায় পাওয়া যায়। দুই একখানি ময়রা বা হালুই-করেরও দোকান আছে। তাহাতে যাত্রীদের বিশেষ কোনই কষ্ট হয় না।

আমাদের ব্রহ্মচারী সাধুরা এইবার মায়ের মন্দির-দ্বারে বসিয়া ভক্তিযোগে দেবীমন্ত্র জপ ও তাঁহার স্তব-স্তুতি করিয়া প্রণামান্তে মায়ের চরণ হইতে বিদায়-গ্রহণ করিলেন। মন্দির হইতে পাহাড়ের সেই 'পাক্‌দণ্ডী' পথে নামিয়া আসিবার সময়, বহুজন তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া আগাইয়া দিয়া গেল।

তাঁহারা এইবার পাকা রাজপথে আসিয়া পড়িলেন। এই পথ হোসিয়ারপুর হইতে পাহাড়ের উপরে উপরে চড়াই উৎরাই হইয়া কাঙ্গড়া পর্য্যন্ত গিয়াছে। তাঁহারা যে স্থানে আসিয়া এই পাকা রাস্তা ধরিলেন, সেই স্থানের নাম—"ভরোয়াইলগাঁও"। এখানে এই জেলার ডেপুটীকমিশনার বা জেলাম্যাজিষ্ট্রেটের একটী সুন্দর বাংলো আছে। তিনি সময় সময় এখানে আসিয়া বিশ্রাম করেন। সেই বাংলোর নিকটে আরও কয়েকখানি গৃহ আছে, তাহাতে সরকারী কর্ম্মচারীরাও অনেকে তাঁহার সঙ্গে আসিয়া অবস্থান করে।

এখান হইতে অন্য একটী সংক্ষিপ্ত পথ ধরিয়া ব্রহ্মচারীরা অগ্রসর হইলেন। তাহাতে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই তাঁহারা "বিয়াস্‌-গঙ্গার" তীরে আসিয়া পৌঁছিলেন এই বিয়াস্ বা "বিপাসা" নদীটী, প্রসিদ্ধ পঞ্চনদ "সিন্ধু"-নদেরই একটী প্রধান উপনদী। ইহা "সোলাং" উপত্যকা হইতে 'বিয়াসকুণ্ড'রূপে প্রবাহিত হইয়া ক্রমে পঞ্জাবে আসিয়া "শতদ্রু"র অঙ্গে মিলিয়াছে।

'বিপাশা' নামের মূলীভূত কারণ সম্বন্ধে বিত্থানন্দজী বলিলেন—"শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে—শ্রীমন্মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের শত-পুত্র রাক্ষস কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে, তিনি শোকে অধীর হইয়া বা অষ্ট-পাশের অন্তর্গত 'শোক'রূপ ভীষণ পাশে যেন আবদ্ধ হইয়াই, এই নদীতে নিজ তনুত্যাগ করিবার মানসে নিমগ্ন হন্। তখন নদীর অধিষ্ঠাত্রীদেবী জননী-মূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে প্রকটা হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"বাবা বশিষ্ঠ, তুমি এত বড় জ্ঞানী হয়ে, একি মহাপাপের আয়োজন কর্‌ছ? তুমি কি জান না, 'শোক'—অষ্ট-পাশের অন্যতম? কুল, শীল, ভয়, লজ্জা, ঘৃণা, শোক, মান আর নিন্দা, এই ত অষ্টপাশ। এতেই ত জীব সর্ব্বদা আবদ্ধ হয়ে আছে। 'পাশ' মানে 'বন্ধন'। এই পাশে বন্ধন-প্রাপ্ত হয়েই, আত্মা 'জীব'রূপে পরিণত হয়েছে। এই ভাবটাই জীবের জীবত্ব, আর এই পাশগুলা হতে আপনাকে বাঁচাতে পারলেই, জীবের 'শিবত্ব'; অর্থাৎ এই পাশথেকে মুক্ত হলেই, জীব অনায়াসে শিবত্ব লাভ করে। তাই ত শ্রীভগবান বলেছেন—

"পাশবদ্ধ ভবেজ্জীব পাশমুক্ত ভবেচ্ছিব"।

যার এই কুলশীলাদি অষ্টবিধ অজ্ঞানতার লেশমাত্রও নেই, সে যে নিশ্চয়ই দেবতা, তাতে আর সন্দেহ কি? এ সব ত তোমার জানাই আছে, তবে কেন এমন ভ্রান্ত হয়ে, অবোধের মত এই কাজ কর্‌তে উদ্যত হয়েছ বাবা? নিরস্ত হও।"

"বশিষ্ঠদেবের ন্যায় মহা-জ্ঞানী পুরুষও ঘটনাচক্রে পুত্রশোকরূপ মহাপাশে আবদ্ধ হইয়া, যেন অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। দৈবী-কৃপায় তখন তিনি আত্মভ্রম বুঝিতে পারিলেন ও দেবীকে প্রণাম করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। নদীর সেই অধিষ্ঠাত্রীদেবীও সঙ্গে সঙ্গে

নদীমধ্যে অন্তর্দ্ধান করিলেন। তিনি বশিষ্ঠদেবের এই শোকরূপ 'পাশ'মুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়াই, এই নদী—"বিপাশা" নামে প্রখ্যাতা হইয়াছেন।"

মনোহর ও গঙ্গাধর তখন বিপাশায় নামিয়া ভক্তিভাবে সেই পবিত্র নদীজল স্পর্শপূর্ব্বক তাহাতে মার্জ্জন করিল। বিদ্যানন্দজীও তথায় বসিয়া মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া লইলেন। ঘাটে পারের একখানি নৌকা ছিল, তাঁহারা পরে সেই নৌকারোহণে বিপাশা বা বিয়াস্-গঙ্গা অতিক্রম করিলেন। এদেশের নৌকাগুলিও অন্যান্য দেশের নৌকা হইতে কিছু স্বতন্ত্র ধরণের দেখা গেল। সাধারণতঃ সকল নৌকাই যেমন উভয় প্রান্তে সূক্ষ্মমুখী হয়, এই নৌকাগুলি সে ধরণের নহে, তৎপরিবর্ত্তে চৌকোণা বা আয়তাকার-বিশিষ্ট। যাহাতে তাঁহারা পার হইলেন, তাহার তলদেশও সাধারণ নৌকার ন্যায় অর্দ্ধগোলাকারে গঠিত নহে, তাহা সম্পূর্ণ সমতল। নৌকাখানি দৈর্ঘ্যে প্রায় ত্রিশ হাত, এবং প্রস্থে প্রায় দশ হাত হইবে। উহা সর্ব্বাবয়বে ঠিক যেন একটী প্রকাণ্ড কাষ্ঠের চতুষ্কোণ "ডিস্" বা "প্যাকিং বাক্স" উল্টাইয়া জলে ভাসাইয়া রাখিয়াছে।

বিপাশা অত্যন্ত খরস্রোতা নদী, তাহাতে পাড়ী মারিতে, মাঝিদের বেশ একটু বেগ সামলাইতে হয়। এক খানি প্রকাণ্ড হাল, পাঁচ-সাতজনা মাঝিতে মিলিয়া তাহা বাহিতে থাকে। সেই নৌকায় এক সঙ্গেই মানুষ, গরু, ঘোঁড়া ও গাড়ি আদি সবই পার করা হয়। সেও এক অদ্ভুত দৃশ্য! সকলেরই একদশা! ব্রহ্মচারীরাও অবশ্য সেই সঙ্গেই পার হইলেন। মাঝিদের মধ্যে এক জন সকলের নিকটেই পারের পয়সা আদায় করিতে লাগিল, সাধুদের নিকট হইতেও যথারীতি পয়সা লইয়া গেল, কিন্তু তাহাদের

কর্ত্তা-মাঝিটী তাহা দেখিয়া, তাহাকে খুব ধমক ও গালাগালি দিয়া সাধুদের পারের পয়সা ফিরাইয়া দিল। তাঁহারা পার হইয়া ঘাটে উঠিলে—সেই মাঝিরা সকলে আসিয়া, তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক চলিয়া গেল। তাঁহারাও আনন্দের সহিত সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া উপরে উঠিলেন।

সেই স্থানের নাম—"ডেহারা"। ইহা চিন্তাপূর্ণী হইতে প্রায় সাত ক্রোশ, ও 'ভরয়াইগাঁও' হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী হইবে। 'কাঙ্গড়া' জেলার এটী একটী সরকারী তহশীল। সেই কারণ অধিকাংশ সরকারী-কর্ম্মচারী এই স্থানেই বাস করেন। তহ-শিলের এক জন কর্ম্মচারী তাঁহাদের দেখিয়া, প্রণামপূর্ব্বক ধর্ম্ম-শালার পথ দেখাইয়া দিলেন, তাঁহারা ধর্ম্মশালাতেই সে রাত্রি আশ্রয় লইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, সেই ভদ্রলোকটীর সহিত আরও কয়েক জন তাঁহাদের দর্শন করিতে আসিলেন ও ধর্ম্ম-বিষয়ক নানা কথাবার্ত্তায় সকলেই অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিলেন। তাঁহাদের রাত্রিতে ভোজনের বা ভিক্ষার সমস্ত আয়োজনও তাঁহারাই করিয়া দিলেন।

তাঁহাদের সহিত কয়েকজন "আর্য্যসমাজী" ভদ্রলোক ছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দজী সরস্বতীর প্রবর্ত্তিত "আর্য্যসমাজ" বাঙ্গলার ব্রাহ্ম-সমাজেরই কতকটা অনুরূপ বলিতে পারা যায়। মূর্ত্তিপূজা-বিরোধী, তবে আংশিকভাবে তাঁহারা বৈদিক-ক্রিয়া মান্যকারী। তাঁহারাও ব্রহ্মচারীদের সহিত সদালাপে পরিতুষ্ট হইলেন।

অধুনা সদালাপ উপলক্ষে প্রায় সকলেই সাম্প্রদায়িক ভাবে গোঁড়ামি করিয়া, পরস্পরে ঘোর দ্বন্দ্ব করিয়া বসে। কিন্তু প্রকৃত

'সৎ' বা 'সত্য' কথায় কোনরূপ বিরোধ আসিতেই পারে না। যাহা সত্য, তাহাতে কোন কালেই মিথ্যার আরোপ করা যায় না, আবার মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিলেও, তাহা আদৌ টিঁকে না, সময়ে তাহা মিথ্যা বলিয়াই ফুটিয়া উঠে। সুতরাং সাধু, সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী বা গৃহস্থ-সংসারী যে কেহই হউন না, সত্য আশ্রয় করিলে, সর্ব্বত্রই আনন্দপ্রবাহ বিদ্যমান থাকিবে। বিদ্যানন্দজী প্রভৃতি সেই কারণেই সকলের নিকট সতত সম্মানার্হ।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে, তাঁহারা ব্রাহ্মকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক সেই ধর্ম্মশালা হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। এখান হইতে জ্বালামুখী অধিক দূর নহে, বোধ হয় তিন ক্রোশ কিম্বা সাড়েতিন ক্রোশমাত্র হইবে। প্রভাতে পার্ব্বত্য-উপত্যকার মধ্যদিয়া যাইতে যাইতে তাঁহারা দূরস্থিত জ্বালামুখীর সেই বনাকীর্ণ মনোরম পর্ব্বত-দৃশ্য দেখিয়া, অতীব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সেই জ্যোতির্ম্ময়ী-মায়ের ধ্যান ও তাঁহার স্তব উচ্চারণ করিতে করিতে অধিকতর উল্লাসভরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বেলা সাতটা বাজিতে না বাজিতেই তাঁহারা সেই পর্ব্বতপাদে উপস্থিত হইলেন। এই পর্য্যন্তই একা বা জেক্কা ও গরুরগাড়ি প্রভৃতির আসিবার পথ আছে। এইবার প্রায় অর্দ্ধমাইল বা এক পোয়া পার্ব্বত্য-পথে উপরে উঠিলেই, শ্রীশ্রীজগন্মাতার চিরপবিত্র প্রাচীন মন্দির পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই পার্ব্বত্য-পথটীর দুই পার্শ্বেই পাণ্ডাদিগের বাটী, ধর্ম্মশালা, কূপ ও ছোট ছোট দোকানপাটে পরিপূর্ণ একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। কিন্তু কাঙ্গড়া-উপত্যকার মধ্যে প্রাচীনকালে ইহাই প্রধান নগর বা সহর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও বহু প্রাচীন মন্দির ও

অট্টালিকার ভগ্নাবশেষসমূহ তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করিতেছে, এখনও সেই প্রাচীন সহরের প্রভূত সমৃদ্ধির সাক্ষ্যরূপে চতুর্দ্দিকে বহু পুরাতত্ত্বের চিহ্ন বিরাজিত রহিয়াছে।

পুরাকালে সেই অসুররাজ জলন্ধর কর্ত্তৃকই এই নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শাস্ত্রে জলন্ধর-উপাখ্যানে বর্ণিত আছে যে, "তিনি শিবকরে নিহত হইলে, শ্রীভগবান তাঁহার বক্ষস্থলে এক প্রকাণ্ড পর্ব্বতখণ্ড চাপাইয়া দেন। তাহাতে তাঁহার মুখ হইতে এক ভীষণ অনল-শিখা বাহির হইতে থাকে। পরে শ্রীসদাশিব তাহা দৈবী-শক্তিস্বরূপা জ্বালারূপিনী জগন্মাতারই প্রত্যক্ষ-বিভূতি ''জ্বালামুখী'' বলিয়া ভক্তগণের মধ্যে প্রকাশ করিলেন।"

"এতদ্ব্যতীত যখন দক্ষযজ্ঞে 'সতী' দেহত্যাগ করেন, তখন দেবাদিদেব শিব ক্রোধে ত্রিজগৎ বিদ্ধস্ত করিবার মানসে, সেই সতীদেহ নিজ ত্রিশূলের উপর রক্ষা করিয়া, ঘোর তাণ্ডব-নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। বিষ্ণু তদ্দর্শনে সুকৌশলপূর্ব্বক আপনার সুদর্শন চক্রদ্বারা সেই সতীদেহ খণ্ডবিখণ্ড করিয়া, ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষাকল্পে সহায়তা করিয়াছিলেন। তাহাতে ভূতলে স্থূলভাবেও 'একান্ন' সংখ্যক বিভিন্ন স্থানে দেবীর দেহখণ্ড পতিত হয়। যে যে স্থানে দেবীর সেই পবিত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থলই ভিন্ন ভিন্ন আদি শক্তিপীঠ বলিয়া শিবপ্রোক্ত।"

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তখন হইতেই স্থূল-ভাবে মায়ের 'একান্নটী শক্তিপীঠ' বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। সূক্ষ্ম-মাতৃকা পীঠসমূহ অন্তর্জ্জগতের অনুভাব্য বিষয়, তাহা যোগী ও সাধকগণেরই বোধগম্য। বিদ্যানন্দজী আমাদের গঙ্গাধর ও মনোহরদাসকেও সে সকল গুহ্য সাধনতত্ত্ব অতি সরল ভাবে বুঝাইয়া দিলেন।

এই জ্বালামুখী-পীঠে মায়ের জিহ্বা পতিত হইয়াছিল। এই পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—"আম্বিকা" এবং এখানের ভৈরব—"উন্মত্ত" বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। এদেশে এই জ্বালামুখীদেবীকে—"লোটনওয়ালীদেবী"ও বলে। শ্রীসদাশিব তন্ত্রে ইঁহাকেই——"ধূমাবতী" মহাপীঠেশ্বরী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

যে স্থানে দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত, তথা হইতে অবিরত ভাবে কয়েকটী অপূর্ব্ব অগ্নিশিখা সতত লকলক্ করিয়া জ্বলিতেছে। মন্দিরের মধ্যে সম্মুখস্থ দেওয়ালে একটী 'কুলুঙ্গি' আছে ; উহার একটী ফাটলের মধ্য হইতে যে অনলশিখাটী বাহির হইতেছে, সেইটিই জ্বালামুখী বা ধূমাবতী-শিখা। এই অনল-শিখাটীই সাধক-ভক্তগণের প্রধানা উপাস্যা। এই স্থান হইতেই দেবী ভক্তগণপ্রদত্ত দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন আদি প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোনও পাত্রে দুগ্ধ রাখিয়া, সভক্তি মায়ের আরাধনা করিলে, এই জ্বালামুখীদেবী অগ্নিজিহ্বারূপে বিস্তৃত হইয়া, সেই পাত্রের মধ্যে আংশিকভাবে আসিয়া পড়েন ও পাত্রস্থিত দুগ্ধ কিয়ৎ পরিমাণে পান করিয়া, পুনরায় মূল-অঙ্গে মিশিয়া যান। পাত্রে প্রসাদরূপে অধিকাংশ দুগ্ধই পড়িয়া থাকে। কখন কখন পূজার পর এই শিখা কিয়ৎ-ক্ষণের জন্য অদৃশ্য হইয়াও যান। সেই সময় তাঁহার 'বিশ্রামকাল' বলিয়া সকলে বর্ণনা করেন।

এই মন্দিরগৃহের পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ উত্তরপূর্ব্বকোণে বা ঈশান-কোণে একহস্ত পরিমাণ দীর্ঘ একটী জ্যোতিঃ-শিখা অবিরত ভাবে প্রকাশিত রহিয়াছেন। ইনি "হিঙ্গলাজ"-শিখা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গৃহের মধ্যে ভূমিতলে একটী কুণ্ড খোদিত আছে, তাহা 'হোম-কুণ্ড' বলিয়া পরিচিত। তাহাতে দুইটী জ্বলন্ত শিখা আছে। এই

দুই শিখামুখেই দেবীর নিত্য হোমকার্য্য হইয়া থাকে। ইহা মায়ের "হবনগ্রাহী-শিখা" বলিয়া প্রখ্যাত।

এই দিব্য শিখাটী বন্ধ করিবার জন্য এক সময় দিল্লীর মোগল-সম্রাট বিশেষ প্রয়াস করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল—এই জ্বালা কৃত্রিম,—দেবীর পাণ্ডারা ভূগর্ভ মধ্যে কোন কৌশলপূর্ব্বক এই অগ্নি সর্ব্বদা জ্বালিয়া রাখিয়াছে। শুনা যায়—তিনি এই কুণ্ডের উপর আটখানি অতি স্থূল ও প্রকাণ্ড লৌহকটাহ বা কড়াই উপর্য্যুপরি উপুড় করিয়া রাখিয়া, একেবারে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল—"বায়ু অভাবে বা শিখা প্রকাশের কোন পথ না পাইয়া শিখাদ্বয় অচিরকাল মধ্যেই নিভিয়া যাইবে।" কিন্তু মহাপ্রকৃতির এমনই অদম্য লীলা যে, কিয়ৎকাল পরেই সেই ভীষণ লৌহ-আবরণ ভেদ করিয়া, মা আমার জ্যোতির্ম্ময়ী জিহ্বায় লক্‌লক্ করিয়া আপনার এই চিরন্তন শিখা প্রকাশ করিয়া দিলেন।

তখন সম্রাট অনন্যোপায় হইয়া, এই পর্ব্বতের উপরিস্থিত একটী ঝরণাকে প্রায় তিন চারি ক্রোশ দূর হইতে নালা কাটিয়া তথায় আনয়ন করেন ও উক্ত অগ্নিশিখার উপর তাহা নিক্ষেপ করেন। তাহার অবিরত জলধারা বহু বৎসরেও এই সুপবিত্র অগ্নিশিখাকে নির্ব্বাণ করিতে পারে নাই। এখন অবশ্য সেই পাকা নালার স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় আর প্রবল ধারায় জল আসিতে পারে না, তবে মন্দিরের নিকটেই সেই জলধারা কিয়ৎ পরিমাণে এখনও ঝর্‌ঝর্ করিয়া পড়িতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক বাদসাহ প্রকৃতি মাতার এই অপূর্ব্ব লীলা সন্দর্শন

করিয়া, একেবারে বিমোহিত হইয়া যাইলেন ও দেবীর উদ্দেশে সওয়ামণ সুবর্ণদ্বারা বিনির্ম্মিত একটি সুন্দর ছত্র উপহার বা ভেট্ প্রদান করিলেন। সে ছত্র এখনও দেবীর ভাণ্ডারে রক্ষিত আছে। প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, বাদসাহ গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন—এতবড় সুবর্ণ ছত্র আর কেহ কখনও ইঁহাকে প্রদান করে নাই, তাহাতেই সেই ছত্রের সুবর্ণত্ব বিলুপ্ত হইয়া অষ্টধাতুতে পরিণত হইয়াছে। উহার উপর বাদসাহের নাম ও মোহরাঙ্কিত ছিল; এক সময় কোন ইংরাজ-কর্ম্মচারী দেবীর মন্দির দর্শন করিতে আসিয়া, সেই ছত্রের বিবরণ শুনিতে পান ও সরলপ্রাণ পুজারী-দিগকে বুঝাইয়া বাদসাহের নামাঙ্কিত অংশটুকু কাটিয়া লইয়া যান। প্রকাশ—তাহা তিনি বিলাতে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

দেবীর বর্ত্তমান মন্দিরটী প্রায় আট নয় শত বৎসরেরও পূর্ব্বে বিনির্ম্মিত। কথিত আছে,—দেবীর স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া কোনও দক্ষিণদেশবাসী ব্রাহ্মণ মায়ের প্রাচীন জীর্ণ মন্দিরের সংস্কার করিয়া, এই মন্দিরটী যেন নূতন করিয়াই নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। অনন্তর ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে রাজা রনজিৎ সিং মন্দিরের উপর গম্বুজাদি সুবর্ণস্তবকে মণ্ডিত করিয়া দেন।

মন্দিরটীর সন্নিকটে ছয়টী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। তন্মধ্যে মন্দিরসংলগ্ন একটী গুহামন্দিরের অন্তর্গত যে প্রস্রবণটী আছে, তাহার প্রাকৃতিক লীলা এক বিচিত্র ধরণের—তাহাতে উষ্ণতার স্পর্শানুভব আদৌ নাই, অথচ সেই জল অবিরত যেন ফুটিতেছে বা তাহার মধ্যে সদাই জল-বুদ্‌বুদ্ উঠিতেছে। আধুনিক পাশ্চাত্য পদার্থবিজ্ঞানবিদ্ কেহ কেহ বলেন—"উহাতে আর আছে কি? উহা আগ্নেয়-পর্ব্বতেরই অংশবিশেষমাত্র!" আর্য্য ঋষিমণ্ডলীর

নিকট তাহা যে অপরিজ্ঞাত ছিল, তাহা নহে, তাঁহারা "জ্বালামুখী" শব্দ—জীবন্ত আগ্নেয়পর্ব্বতেরই নামান্তর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পর্ব্বতের যে স্থানে জ্বালা বা অগ্নিশিখা সতত মুখপ্রধান হইয়া বিদ্যমান আছে, তাহাই "জ্বালামুখী"।

ভারতের মধ্যে আরও অনেকগুলি জ্বালামুখী বিদ্যমান আছে তাহা অন্যান্য নামে পরিচিত। তবে এটীর বৈশিষ্ট্য যেভাবে তাঁহারা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা কেবল স্থূল প্রকৃতি বা দৃশ্যমান প্রাকৃতিক-বৈচিত্র্য দেখিয়া নহে, তাঁহারা তাঁহাদের যোগ বা অন্তর-দৃষ্টির দ্বারাও ইহার বিশেষত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই দূরদৃষ্টি ও অভ্রান্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপলব্ধির ফলে, তীর্থসমূহের এমন সুন্দর ও অপরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক এক্ অলৌকিক শক্তি-সমন্বিত স্থানের নির্ব্বাচন করিয়া গিয়াছেন, যাহা কত সহস্র সহস্র বৎসর পরেও পূর্ব্ব-ইতিহাসের বর্ণনা হইতে তিলমাত্রও ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় না।

পাশ্চাত্য দেশেও অনেকগুলি আগ্নেয়-পর্ব্বতের সংবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে 'এট্না' ও 'ভিসুভিয়স' প্রধান হইলেও, তাহার জ্বালা বা অগ্নিমুখ এমন সমভাবে চিরদিন বিদ্যমান থাকে না। কখন তাহার জ্বালায় কত শত গ্রাম নগর ধ্বংস হইয়া যায়, আবার কখনও বা তাহার জ্বালামুখের অস্তিত্বও থাকে না। কিন্তু এই শান্ত জ্বালামুখী দেবী ও 'মাতৃভাবে' কতকাল ধরিয়া ভক্তমণ্ডলীর লৌকিক ও অলৌকিক কতই না কল্যাণ-বিধান করিয়া আসিতেছেন। ভক্তি ও বিশ্বাসপুষ্ট-অন্তরে তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষা না আসিলে, মায়ের সেই অসাধারণ মাহাত্ম্য কিছুতেই অনুভব করিতে পারা যায় না।

এই দেবীমন্দিরের মহান্তরূপে চিরকাল যোগী ও সাধুমণ্ডলীই

কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। কালক্রমে তাঁহাদেরই শিষ্য-পরম্পরায় যাঁহারা পরে গার্হস্থ্য-আশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক মায়ের সেবাইতরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদেরই বংশধরগণ এই স্থানের মহান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু সাধুদিগের সেই প্রাচীন আসন ও পর্ব্বতান্তর্গত প্রাকৃতিক গুহাগৃহটী এখনও সাধুদিগেরই অধিকারে আছে। তাহা এক্ষণে দশনামী সাধু-আখাড়া বলিয়া পরিচিত। বিদ্যানন্দজী প্রভৃতিরা সেই দশনামী আখাড়াতেই যাইয়া উঠিলেন। এই আখাড়ার মহান্তজীমহারাজ বাবা চন্দ্রগিরিজী তেমন শিক্ষিত না হইলেও, বেশ অমায়িক ও অতিথি-অভ্যাগত, সাধু-সজ্জন ও মহাপুরুষদিগের ভারি যত্ন-আয়ত্ব করিয়া থাকেন। তাঁহার দুইটী প্রধান শিষ্য যতন্‌গিরি ও চৈতন্‌গিরি। এক্ষণে তাঁহার কয়েকটী উপশিষ্যই সর্ব্বদা এই আখাড়ায় থাকিয়া, নিয়মিত সাধন-ভজনাদি করেন। কখন কখনও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পর্য্যটনেও বাহির হইয়া ভিক্ষা-সংগ্রহ করিয়া আনেন। তাহাতেই এখানকার সাধুদিগের সমস্ত খরচপত্র চলে। ভক্ত যাত্রীরাও আসিয়া অনেক সময় তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন ও আশ্রমের ব্যয়-কার্য্যে যথাসাধ্য সহায়তা করিয়া যান।

আমাদের গঙ্গাধর বিদ্যানন্দজীর উপদেশে ও মনোহরদাসের আদর্শে কয়েক দিবস ব্যাপী জপাদির বৈধ-অনুষ্ঠান এখানে আরম্ভ করিল। তাহাতে সে বিশেষ আনন্দলাভ করিল। কত অলৌকিক-বিষয়ের সন্দর্শনে সে আজ চমৎকৃত হইল। মনোহরদাসের সহিত গোপনে আলাপে জানিতে পারিল, সেও মায়ের অদ্ভুত বিভূতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে। ভক্তিমান্ একনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী সাধকদিগের পক্ষে এরূপ মহাশক্তিপীঠে ভক্ত-বৎসলা মায়ের প্রত্যক্ষ কৃপালাভ করার

আর বিচিত্রতা কি? তাঁহারা যথার্থই যে মহামায়ার অতি স্নেহের অনুগত সন্তান!

আজ একজন ত্যক্তদণ্ড পরমহংস স্বামীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাঁহার এক ব্রহ্মচারী শিষ্যের সহিত এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনিও দশনামী আখাড়াতেই অবস্থান করিতেছেন। গঙ্গাধর প্রভৃতি তাঁহার অতি সৌম্য, জ্ঞানোজ্জ্বল ও প্রতিভামণ্ডিত স্বরূপ দেখিয়া, তাঁহার চরণে সকলেই অতীব শ্রদ্ধা-সহকারে প্রণত হইলেন। ভিক্ষার পর বিশ্রামান্তে সকলেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মবিষয়ক নানা সৎসঙ্গ হইতে লাগিল। গঙ্গাধরের প্রশ্নে তীর্থ-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বহু সারগর্ভ ও গভীর বিষয় তিনি এমন সরল ভাবে বুঝাইয়া দিলেন, যাহাতে সকলেই যেন বিমোহিত হইয়া গেলেন। সে গম্ভীর জ্ঞান-বিজ্ঞানপূর্ণ বিষয়সমূহের সম্পূর্ণ আলোচনা এস্থলে অসম্ভব ও কতকটা অপ্রাসঙ্গিকও হইতে পারে। তবে অতি সংক্ষেপে তাহার মর্ম্মাভাষ কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

"জগতের আদি বা অনাদি তীর্থসমূহের সমষ্টিভূত বিরাট-ভাবের আদর্শই এই ভারতভূমি! ইহার প্রতি অণু-পরমাণুর সহিত সেই পূততীর্থ মাহাত্ম্য যেন ওতপ্রোতভাবে সতত জড়িত হইয়া রহিয়াছে। ইহারই আদর্শে ভারতের বাহিরেও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের বা উপধর্ম্মের বহুতীর্থ পরবর্ত্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সকল তীর্থেরই লক্ষ্য কিন্তু এক অদ্বিতীয়-বস্তু! শ্রীভগবানের পবিত্র লীলারহস্য-পরিপূর্ণ অসাধারণ মহিমস্মৃতি! যাঁহার দর্শনে ও স্পর্শনে ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তের হৃদয় অপূর্ব্ব আনন্দরসে যেন সহসা পূর্ণ হইয়া যায়। তাহার পূর্ব্ব-কৃত জ্ঞাতাজ্ঞাত অশেষ পাপকল্মষ সেই আনন্দ-প্রবাহে যেন বিধৌত

হইয়া, যথার্থই বিমলতা লাভ করে, তাহার অন্তিম লক্ষ্য-বস্তুর প্রতি যেন কে বা কোনও অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহাত্মা, অলক্ষ্যে তাঁহার অজ্ঞাত অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে "তাঁহাকে" ইঙ্গিত করিয়া দেন।

"সনাতন ধর্ম্ম-জগতের অপূর্ব্ব সহায়ক ও পথপ্রদর্শক পবিত্র-তীর্থসমূহ—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণরূপে ত্রিবিধ ভগবৎ-বিভূতিতে পরিপূর্ণ। সুতরাং আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, ও আধ্যাত্মিক ভাবত্রয়ে ভক্ত-সাধকের সর্ব্বত্রই ইহা পরম আদরের সামগ্রী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ত্রিগুণাত্মিকা মূলপ্রকৃতি বা ব্রহ্মশক্তির প্রত্যক্ষ বিভূতি-লীলামাত্র। সর্ব্বত্রই তাঁহার সেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমষ্টিভূত বা মিশ্রজ, শক্তির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। সূর্য্য-চন্দ্রাদিপূর্ণ বিশাল জ্যোতিষ্কমণ্ডলে পরিদৃশ্যমান প্রত্যেক জ্যোতির্ব্বিন্দু হইতে ভূমণ্ডলস্থিত ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র তৃণবীজ পর্য্যন্ত তাঁহারই লীলা-বিভূতিতে পরিপুষ্ট। তিনি যে অনন্তকলা ব্রহ্ম-বিভূতিস্বরূপ! তাঁহার সেই লৌকিক ও অলৌকিক বিভূতিপূর্ণ কলারাশির পরিমাণ করা কি এই অতি সামান্য জীব-মস্তিষ্কের কর্ম্ম! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবরূপে তাঁহারই লীলা-বিগ্রহস্বরূপ বা জগদ্‌গুরুর আসনের যথার্থ মহিমা-প্রদর্শক মহাত্মাগণও তাহার নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়াই, পরিশেষে সেই অনন্ত ও অনাদি ব্রহ্মাকলার্ণবে তাঁহারা আত্মলয় করিয়া চিরকৃতার্থতা লাভ করেন—তখনই তাঁহারা যথার্থ ধন্য হন্। তবে লৌকিকভাবে যাহা পরিদৃশ্য হয়, বা লোকমস্তিষ্ক যাহা ধারণা করিতে পারে, তাহা তাঁহার সেই অনন্তকলার অতি সামান্য অংশ, ষোড়শকলারও ভগ্নাংশমাত্র। জীবের 'জীবত্ব' ঘুচিয়া 'দেবত্ব' লাভ হইলে—সেই সমুন্নত অবস্থায়, তাঁহার উক্ত ষোড়শের চতুর্গুণে চতুঃষষ্ঠিকলা পর্য্যন্ত কোনরূপে উপলব্ধ হইতে পারে। তাহার পর—

যাহা উপলব্ধির বিষয়, তাহা কেবল যে মনোবাক্যেরই অতীত বা অগোচর বস্তু, তাহা নহে,—তাহা যে একেবারে জ্ঞানাতীত বা বেদান্তসিদ্ধ বস্তু—তাহা যে আত্মার সেই ব্রহ্মীভূত অবস্থাতেই একমাত্র অনুভবনীয়! তাহা কে কোন্ ভাষায় বুঝাইবে, আর এই সংসারে বুঝিবেই বা কে?

"যাহা হউক ইহ জগতে তৃণগুল্মাদি হইতে মহীরুহ পর্য্যন্ত সমগ্র উদ্ভিজ্জ জগৎ বলিয়া যাহা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা তাঁহার সেই কলা-ষোড়শের একটী অংশমাত্র। অর্থাৎ শ্রীভগবানের অনন্ত কলাবিভূতির মধ্যে যে ষোড়শকলামাত্র ইহ সংসারে পরিদৃশ্যমান, তাহারই একটীমাত্র কলাবিভূতিতে এই বিশ্বের সারা 'উদ্ভিজ্জ-রাজ্য' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জগতের ক্রমোন্নত ধর্ম্মবিধানে তাঁহার দুইটী-মাত্র কলা-পরিমাণ শক্তি বা বিভূতির বিকাশেই জীবাণুরূপ সমস্ত 'স্বেতজ-জীবের' সৃষ্টি হইয়াছে। এইভাবে সেই ব্রহ্ম-প্রকৃতির তিনটী-মাত্র কলা-পরিমাণ বিভূতি-পরিপুষ্ট হইয়া, পৃথিবীর সমস্ত জলচর ও খেচরাদি 'অণ্ডজ-জীবরাজ্যে'র সৃষ্টি হইয়াছে। আর সেই ব্রহ্মবিভূতিরই চারিকলামাত্র শক্তির বিকাশে ইহ জগতে 'জরায়ুজ-জীবসমষ্টির' আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাই সেই ব্রহ্মশক্তি মহামায়ার "ভূতবর্গ চতুষ্টয়" বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ইহাই জীবজগৎ সৃষ্টির মূল-আধার বা ভিত্তিস্বরূপ। এই বিরাট ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর তাঁহার যেমন যেমন অধিকাংশ বিভূতির বিকাশ হইয়াছে, তেমনই তেমনই জীব আত্মোন্নতি-সহযোগে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতে সমর্থ হইয়াছে। যখনই জৈবী-জগৎ এই ভাবে ক্রমোন্নত পথে পরিচালিত ও পরিপুষ্ট হইয়া দৈবী-জগতের সম্মুখীন হইয়াছে, তখনই তাহাদের বিভিন্ন-মূখী আকর্ষণী ও বিকর্ষণী গতির সঙ্ঘর্ষে এক অদ্ভুত আবর্ত্তচক্রের

সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন বিভিন্নমুখী গতিবিশিষ্ট বায়ু বা জলপ্রবাহের সঙ্ঘর্ষণে স্থূলজগতে ঘূর্ণিবায়ু বা ঘূর্ণিজলের (দহের) সৃষ্টি হয়, এবং সেই ঘূর্ণায়মান বস্তুর বা তাহার আবর্ত্তচক্রের নিম্নদেশে তাহা ক্রমে সূক্ষ্মমুখী হইয়া যেন একটী কেন্দ্রে পরিণত হয়, ঠিক সেইরূপ ভাবেই সূক্ষ্মজগতে পূর্ব্বকথিত ভাবে ভক্ত ও ভগবানের আকর্ষণ-বিকর্ষণরূপ আধিদৈবিক সাধনক্রিয়ার ফলে যে যে স্থূল ও সূক্ষ্ম-সমন্বিত অদ্ভুত আবর্ত্তচক্রের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহার সেই চক্রমধ্যে যে যে স্থানটী তাহার কেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছে, সেই সেই স্থানই ভগবদ্ভক্তগণের দৃষ্টিতে "সাধন-পীঠ" বা "তীর্থ" বলিয়া জগতে পরিচিত হইয়াছে।

আধুনিক পাশ্চাত্য-আত্মিকতত্ত্ববিদেরা কোনও আত্মার আবির্ভাব করণোদ্দেশে যেমন ত্রিপদী (টীপাই) বা কোন মানবদেহে তাহার "মিডিয়ম্" বা আধারক্ষেত্র করিয়া লয়, তাহাই তাহাদের পীঠ, তাহারা স্থূল বা ব্যবহারিক অনুষ্ঠানমাত্র করিয়াই, কোন অজ্ঞাত শক্তির আবির্ভাব অনুভবপূর্ব্বক তাহাতে আনন্দ বা কৌতুক লাভ করে। তাহারা আর্য্যের উক্ত পীঠ-তত্ত্বের বিজ্ঞান এখনও অবগত হইতে পারে নাই, তাহা যদি কখন তাহাদের যথার্থরূপে আয়ত্ত হয়, তখন তাহারা আর প্রেতাত্মার ঐরূপ ভ্রান্ত লীলা বা ক্রিড়ামাত্র লইয়া ব্যস্ত থাকিবে না। তখন তাহারা আর্য্য-ঋষিগণ-নির্দ্দিষ্ট পীঠস্থান ও তীর্থসমূহের মধ্যে দৈবী-লীলার গুপ্ততত্ত্বের অনুসন্ধান করিবে। আর তখনই ইংরাজী-শিক্ষিত সন্দেহাত্মক আর্য্য-সন্তান-গণের মধ্যেও ঘট, পট, দেবতা ও দৈব-যন্ত্রতত্ত্বের মাহাত্ম্য ক্রমে পরিজ্ঞাত হইবে।

"পূর্ব্বকথিত পীঠ বা তীর্থের মধ্যে তাঁহার আধিভৌতিক, আধি-

দৈবিক বা আধ্যাত্মিক ভাবের কোন একটীর বা ত্রিভাবের প্রাধান্য-বিধায়, ভিন্ন ভিন্ন তীর্থের মাহাত্ম্য বিষয়ে ন্যূনাধিক্য হইয়াছে। তাহাতেই তীর্থ বা মহাতীর্থ অথবা পীঠ বা মহাপীঠ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। সাধারণ ভক্তবৃন্দ সে রহস্য বিষয়ে যথার্থ অনুভব করিতে না পারিলেও, যথায় কোন অসাধারণ প্রাকৃতিক লীলারূপ মহামায়ার কোনও আধিভৌতিক লীলা বা শক্তির বিকাশ দেখিতে পায়, কিম্বা ঋষিমুনিগণ-কথিত কোন শাস্ত্রীয় বা আপ্তবাক্যরূপ পুরাণাদিতে বর্ণিত কোন দৈবী-লীলাসহ ঐতিহাসিক ঘটনার বিষয় যে স্থানে আধিদৈবিক-সম্পর্কে জড়িত বলিয়া জানিতে পারে, অথবা যথায় কোনও জগদ্‌গুরু মহাপুরুষের জন্ম, সাধনা বা অন্তিম মোক্ষ-লীলার ফলে, আধ্যাত্মিক শক্তিপুঞ্জ বা কলা-বিভূতিতে পরিপুষ্ট হয়, সেই স্থলই তীর্থ, মহাতীর্থ বা মহাপীঠ বলিয়া ভক্তজনের চির আরাধনার বস্তু।

"যে কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ই এইরূপ স্ব স্ব অভীষ্টদেবতা, লীলা-বিগ্রহ বা জগদ্‌গুরুর লীলাভূমিকে পবিত্র ও আদর্শ তীর্থস্থান বলিয়া মনে করে। সেই পুণ্যভূমিতে আসিয়া দর্শন ও স্পর্শন-সহযোগে তাহারা নিজেদের চিত্ত পবিত্র করে ও ধন্য হয়। তথায় কত যুগযুগান্তর ধরিয়া কত ভক্ত-মহাজন কত উৎকট সাধনভজন ও ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন, যে স্থানের প্রতি পর-মাণুর মধ্যে এখনও তাঁহাদের সুপবিত্র পদরেণুসমূহ মিশিয়া রহিয়াছে, যে স্থানের অন্তর বাহ্য তাঁহাদের দৈবী ও জ্ঞানশক্তিতে অনুপ্রাণিত, তথায় অতি বড় পাষণ্ডও যে কিয়ৎকালের জন্য সেই অলৌকিক দৈবীলীলার অনুভব করিয়া, সহসা যেন শিহরিয়া উঠে, ক্ষণেকের তরে তাহার অন্তরের মধ্যে কি যেন কেমন একটা ঘণ্টা বাজিয়া

উঠে—সে যেন অতর্কিত ভাবে সেইদিকে তখনই একবার অবাক্ হইয়া চাহিয়া দেখে! তাই ত তীর্থের এত মাহাত্ম্য! তাই বলি, তীর্থ কেবল লোকের কল্পনার খেলা নহে, তীর্থ সতত অলৌকিক শক্তি-সম্পর্কে সর্ব্বক্ষণ জড়িত। তবে ভক্তের অন্তরের আগ্রহ, শ্রদ্ধা, সাধন ও প্রারব্ধের তারতম্য-অনুসারে তাহার ফলেরও ইতর-বিশেষ অবশ্যই হইতে পারে! এক জনে যাহা অনুভব করে, অন্যে তাহা সমানভাবে অনুভব নাও করিতে পারে। বিশেষ সাম্প্রদায়িক ভাব-বৈষম্যেও তাহাতে অনেক সময় নানা বাধা প্রদান করে। সে বিষমতার কারণ যে, স্থল-বিশেষে কেবল সাম্প্রদায়িক কুশিক্ষা, অজ্ঞানতা ও শিক্ষাহীনতারই বিষময় ফল, তাহা বলাই বাহুল্য!

"লৌহের সহিত চুম্বকের স্বাভাবিক প্রেমাকর্ষণ যেমন চিরদিন অদৃশ্য ও অচ্ছেদ্য ভাবে অবস্থিত, সেইরূপ সাম্প্রদায়িক ভাবপুষ্ট সাধারণ ভক্তের সহিত তাহাদের তীর্থ-বিশেষের সম্পর্কও প্রথম বা মধ্য-সাধনার অবস্থা পর্য্যন্ত কিছু প্রগাঢ় হওয়া অস্বাভাবিক নহে, বরং তাহাই অনেকের চিরন্তন রীতি বলিতে হইবে। কিন্তু যখন ভক্ত-সাধক, সাধনার ক্রমোন্নত পথে তাহাদের সেই মধ্য অবস্থা অতিক্রম করিয়া যথার্থ উন্নত অবস্থায় উপনীত হন, তখন তিনি মহাত্মারূপে পরাভক্তির অবিরোধভাবে সকল তীর্থমধ্যেই শ্রীভগবানের একমাত্র অদ্বিতীয় সত্তা অনুভব করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন ও কৃতকৃতার্থ হন। ভারতে অদ্বৈত-মতের শ্রেষ্ঠ-প্রচারক ভগবান শঙ্করাচার্য্যদেবও তীর্থ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে কত স্তব স্তুতি ও বর্ণনায় নিজ অন্তরের গভীর ভক্তি-ভাব মধুরভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন।"

সেই পরমহংস স্বামীজী মহারাজ অতি বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ ও নানা উদাহরণ দ্বারা এই গূঢ় রহস্যপূর্ণ তীর্থ-কথায় সকলকে পরিতৃপ্ত

করিলেন। সকলেই তাঁহাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। এই জ্বালামুখী-তীর্থ যথার্থই যে এক মহাপীঠ, তাহা প্রত্যেকের হৃদয়ে যেন গভীরভাবে খোদিত হইয়া গেল। এখানে মহামায়া মহাপ্রকৃতির আধিভৌতিক অবিরাম জ্যোতির্লীলা—ধ্বগ্-ধ্বগ্-জ্বলন্ত সর্ব্বভুক্ রসনাময়ী প্রত্যক্ষ-মূর্ত্তি যেমন কোন্ অনাদি কাল হইতে বিরাজিত, তেমনই এই স্থলেই শিবসোহাগিনী শ্রীশ্রীভগবতী সতীর জিহ্বাস্পর্শে, ইহা মহাশক্তি-পীঠরূপে চিরকাল প্রকটিত, তাহার উপর জলন্ধরাদি পরমভক্ত ও অসংখ্য সাধক, ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণেরও কঠোর সাধন-সহায়তায় ইহার প্রত্যেক পরমাণু পর্য্যন্ত যেন পরিপুষ্ট! এমন স্থলে প্রত্যেক ভক্তের হৃদয় আনন্দরসে পরিপ্লুত না হইবে কেন? তাই সকলেই তন্ময় হইয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার শ্রীচরণ-চিন্তায় পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে, তাহাদের মানব-জন্ম সফল করে। জয় মা আনন্দময়ী, সকলেরই আনন্দবর্দ্ধন কর মা!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বেলা আট্‌টা বাজিয়া গিয়াছে—ভগবান শ্রীসূর্য্যনারায়ণের দর্শনানন্দ বুঝি আজ আর অদৃষ্টে ঘটিল না। গগনমণ্ডলের চারিদিকেই এখনও ঘন মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুই এক বিন্দুমাত্র বৃষ্টি ধারায়, আসন্ন প্রবল বৃষ্টির পূর্ব্ব-সূচনাই কেবল প্রকাশ করিতেছে, পবনদেব অবসর বুঝিয়া দিগন্তব্যাপি আলোড়নে চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিয়াছেন, চপলার চাঞ্চল্য-ইঙ্গিতও তাঁহার সাহচর্য্য করিতে তিলমাত্র সঙ্কুচিত হইতেছেন না। কাঙ্গড়ার পার্ব্বত্য উপত্যকা-পথে তখন জন মানবের ছায়ামাত্রও নাই, প্রকৃতির সেই গুরুগম্ভীর প্রতিকৃতি পরিদর্শন করিতে করিতে কেবল আমাদের গঙ্গাধর ও মনোহরদাস এবং তাহাদের সম্মুখে বিদ্যানন্দজী আপন মনে চলিয়াছেন। গঙ্গাধর মনোহরের সহিত গলা মিলাইয়া ভৈরবী-রাগিনীতে যেন গগনপ্রাঙ্গন উন্মত্ত করিয়া একতানে গান ধরিয়াছে—

"কে গো ললনা, ঘোর বরণা।
রণরঙ্গে রতা করাল বদনা॥
করেতে শোভিত, খড়্গ শাণিত,
মুণ্ডালি পঞ্চাশ গলে বিলম্বিত।
নয়ন ভীষণ বিজলি চকিত,
প্রচণ্ড মূরতি অসুর শঙ্কিত।
অট্ট অট্ট হাস ত্রিভুবন ত্রাস,
নিনাদ গম্ভীর ওদিক্‌-বসনা॥

মুক্ত কেশদাম জলদেরই সম,

শোভিছে পৃষ্ঠেতে কিবা অনুপম,

মুক্তকেশী নাম ধরি হরবামা—

ভক্ত জনারে সদা করিছ করুণা॥

লোল জিহ্বায় করিয়া লেহন

কলুষ নাশিছ দানব শাসনা।

সচ্চিদানন্দের আশা, তুমি মা ভরসা,

শেষ দিনে দাসে ভুলে গো থেকোনা॥"

তাঁহারা দ্রুত পদবিক্ষেপের সহিত সেই সঙ্গীতের অপূর্ব্ব স্বর-লহরী তাল-লয়ে যেন মিলাইয়া দিয়াছেন। বিদ্যানন্দজীও সেই সঙ্গীত-রসে বিভোর হইয়া গুণ-গুণ-স্বরে তাঁহার সুর মিলাইয়া দিয়াছেন। অন্তর বাহিরে তাঁহারা তিন জনেই তখন যেন তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সেই ভীমা রণরঙ্গেরতা মহাপ্রকৃতিকে প্রকৃতই যেন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতে করিতে পরমোল্লাসে চলিয়াছেন। কয়েক দিবস ব্যাপী মহাশক্তি-পীঠে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহারা যে যথেষ্ট বিমল শক্তি-সামর্থ্য উপভোগ করিয়াছেন, তাহা যথার্থই বর্ণনাতীত!

তাঁহারা এক মহাপীঠ ধূমাবতী-তীর্থ ছাড়িয়া, তখন অন্যতম মহাপীঠ বক্রেশ্বরী তীর্থাভিমুখে চলিয়াছেন। পথে তাঁহাদের এই সুবিমল ভাবোচ্ছাস! তাহার তরঙ্গ-ভঙ্গিতে গগন-পবনের মধ্যে যে বিশাল পরিকম্পন, যে অপূর্ব্ব আনন্দ-হিল্লোল আনয়ন করিয়াছে, তাহা ভক্ত-ভাবুকব্যতীত অন্যে বুঝিতে পারিবে না। অঘটন-ঘটন-পটিয়সী লীলাময়ীর এই লীলারহস্য বুঝিবে কে? পরম ভক্ত সাধকত্রয়ের পথপরিশ্রম লাঘব করিবার মানসেই কি এই ঘোরারূপ

পরিগ্রহণ? অথবা তাঁহার ইচ্ছা তিনিই জানেন। তিনি যে ইচ্ছাময়ী. মহামায়া!

আজ বিদ্যানন্দজীরা কাঙ্গড়ার বজ্রেশ্বরী দেবীর দর্শনাভিলাষে চলিয়াছেন। কাঙ্গড়া জ্বালামুখী হইতে প্রায় এগার ক্রোশ। তাঁহারা এই ভাবে আনন্দ-গদ্-গদ্ হইয়া প্রায় ছয় ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলেন। সেই উন্মাদিনী প্রকৃতি তখনও যেন অঙ্কিত চিত্রপটের ন্যায় অপরিবর্ত্তনশীলা হইয়া রহিয়াছেন, দেখিতে দেখিতে প্রায় দুই প্রহর কাল অতিবাহিত হইয়া যাইলে, তাঁহারা "রাণীতাল" নামক এক চটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে সেই ঘনঘটাপূর্ণ মেঘাড়ম্বরও ক্রমে কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল। তখন মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশমার্গ হইতে মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডদেব সুতীব্র কিরণ-বাণ নিক্ষেপ করিতে করিতে যেন স্বীয় অপ্রতিহত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের পরিচয় প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতেই ত বলিতে হয়—মায়ের বিচিত্র লীলা!

তাঁহারা যখন চটীতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, সেই সময় কতিপয় যাত্রী অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে সঙ্গে লইয়া, তথায় উপস্থিত হইল। চটীতে স্থান অল্প, সকলের স্থান সঙ্কুলান হওয়া দুরূহ। চটীর মালিক দোকানদার বেনিয়া-মহাশয় স্বার্থের আশায়, সেই নবাগত যাত্রীদের সুবিধার জন্যই বিশেষ ঔৎসুক্য-ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার ভাব গতিক দেখিয়া, আমাদের সাধুবাবারা সে স্থল হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের নিকট দিয়াই তখন একটী স্থানীয় লোক চলিয়া যাইতেছিল, সাধুদের এই অবস্থা দেখিয়া, সে হাত যোড় করিয়া বলিল—"বাবাজী, আপনারা আসুন, ঐ ডাক্‌বাংলোয় চলুন,

ওখানেই অনায়াসে অবস্থান কর্‌বেন, ওখানে আপনাদের কোনও কষ্ট হবে না। আমিই ও বাংলোর ঠিকাদার। ওখানে অবশ্য সাধারণ যাত্রী লোক থাক্‌তে পারে না, সরকারী আফ্‌সাররাই বা তাঁদেরই হুকুম-পত্র নিয়ে কোন কোনও ভদ্রলোক এসে থাকেন। তা বাবাজী, আমি অতি নীচ জাতি, অস্পর্শীয় 'ভাঙ্গী' (মেথর), পূর্ব্ব জন্মের কত কুকর্ম্মের ফলে, এই জাতের মধ্যে আমার জন্ম হয়েছে, এ সবই আমার কর্ম্মভোগ বাবাজী, কেবল কর্ম্মভোগ! আমি, কি আমার বাপ্‌ মাও, কখনও মেথরের কাজ করিনি, আমরা তিন পুরুষ এই রকম ডাকবাংলোর ঠিকাদার হয়ে আস্‌ছি। এখানে সাহেব-সুবো ছাড়া অনেক দেশী আফ্‌সারও এসে থাকেন, আমি তাঁদের পাক শাকের জন্য খুব সাবধানে সজ্জাতিকে দিয়ে, দক্ষিণ পার্শ্বের দুখানা ঘর গোবরমাটী দিয়ে নিকিয়ে চুকিয়ে পরিস্কার করে রেখে থাকি। ওর মধ্যে আম্‌রা কস্মিন্‌ কালেও যাই না। আপনারা ওখানেই নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান কর্‌তে পারবেন। আপনাদের দর্শন করে, আপনাদের দুটো সৎকথা শুনে, আমার এই জন্ম সার্থক কর্‌বো। আমরা মেথর—বাবাজী, আর কোনরূপে ত সেবা কর্‌তে পার্‌বো না! আপনারা আসুন, আমি লোক ডেকে দিচ্চি, সে আপ্‌নাদের জন্যে জল, আগুণ সবই এনে দেবে, সে জলাচরনীয়া জাত—কাহার।" এই বলিয়া সে ডাক্‌বাংলোর ঘর দেখাইয়া দিয়া লোক ডাকিতে গেল।

লোকটা মেথর হইলেও, তাহার চেহারা ও পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া, তাহাকে কিছুতেই মেথর বলিয়া কাহারও মনে হইতে পারে না; অধিকন্তু তাহার ব্যবহার ও কথাবার্ত্তা শুনিলেও, মোহিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। আহা বেচারা বড়ই ভাল লোক! মেথর

হইলে হয় না, লোকটা নিশ্চয়ই পূর্ব্ব জন্মের কোন সৎ বংশেরই ছিল, কোন বিশেষ পাপ কর্ম্মের ফলে এ জন্মে এই নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু এখনও সেই সংস্কার তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

অনতিবিলম্বে সে একটী স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া আনিল, সেটী 'কাহারের' মেয়ে, তাহার কক্ষে জলপূর্ণ একটী কলসী ছিল। সে তাহাকে বলিল—"বাবাজীদের চৌকার সব ব্যবস্থা করে দাও। বাবাজীরা যে যে জিনিস চান, যা যা আন্‌তে বলেন্, বেনের দোকান হতে সব এনে দাও।" এই বলিয়া সে দূরে পথের ধারে গাছতলায় বসিয়া, তামাক সাজিতে আরম্ভ করিল, আর মাঝে মাঝে অনুচ্চস্বরে মুখে—"ওঁ পরমাত্ম" বলিতে লাগিল। তাহার মুখে সুস্পষ্ট প্রণবসংযুক্ত ব্রহ্মোচ্চারণ শুনিয়া সাধুরা বিস্মিত হইলেন। গঙ্গাধর বিদ্যানন্দজীকে স্পষ্টই বলিল—"মহারাজ এ লোকটা বাস্তবিক জীব না স্বয়ং শিবই আমাদের ছলনা কর্‌বার জন্যে আজ এমনভাবে মেথর সেজেছেন।"

বিদ্যানন্দজী বলিলেন—"গঙ্গাধর, তুমি ঠিকই বলেছ, লোকটা বাস্তবিকই কোন ছদ্মবেশী মহাপুরুষ, পূর্ব্বজন্মের কোন হীন কর্ম্ম-বশে, এই অবস্থা লাভ করেছে। তুমি ত জান—জীবমাত্রই কর্ম্মফল ভোগ কর্‌বার জন্যেই, এই সংসারে জন্মগ্রহণ করে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলের সঙ্গে, 'সঞ্চিত-কর্ম্মের'ও যেগুলি ফলোন্মুখী-দশা প্রাপ্ত হয়, তাহাও মিলিত হয়ে জীবের 'প্রারব্ধ-কর্ম্ম' সৃষ্ট হয়, আর তাই বিধাতার বিধানে জীবের ভোগের জন্যে নির্দ্দিষ্ট হয়। তাহারই বশে প্রত্যেক জীব তিনটী করে 'বিষয়' লাভ করে। তার মধ্যে প্রথমটী—জাতি, দ্বিতীয়টী—ভোগ, আর তৃতীয়টী—আয়ু।

তুমি ত পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেবের মুখে এ সব কথা শুনেইছ। সমাজ-বন্ধনের বা সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখতেই যে কেবল জাতিবর্ণের সৃষ্টি হয়েছে, তা নয়। জাতি জীবের প্রকৃতিগত সনাতন বিধান। সমাজ যতই কেন উচ্ছৃঙ্খল হোক্ না, প্রকৃত জাতিত্ব কোন কালেই নষ্ট হবে না, হতে পারেও না ; আর সে জাতিত্ব কেবল মানব-বিশেষের উর্ব্বর মস্তিষ্কের ফলমাত্রও নয়। শ্রীভগবান গীতোপনিষদে তাই ত স্পষ্ট করেই বলেছেন—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগয়াঃ॥"

অর্থাৎ আমিই জীবাত্মার গুণ ও কর্ম্মের তারতম্য দেখিয়াই, ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি ; আর সেই সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্যাদি চারিটী আশ্রমের বিধানও তাহার অনুগত করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। সেই গুণ ও কর্ম্মই বা কি ?

"তোমরা ত জান, এই বিশ্বসংসার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির লীলা-বিন্যাসমাত্র ! ইহার সর্ব্বত্রই তাঁহার সত্ত্ব, রজঃ আর তমো-গুণের অল্পাধিক সমাহার বিদ্যমান আছে। জীবের মধ্যে, বিশেষ জীবশ্রেষ্ঠ এই মানবের মধ্যেই সেই ত্রিগুণের অতি সুন্দর বিকাশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সেই তিনটী গুণ রক্ষা কর্‌তে যেন মানব-সমাজরূপ 'জীব-ইটের' দেওয়াল দিয়ে, তিনি তিনটী বিচিত্র ঘর তৈয়ার করেছেন। তার একটীতে—সত্ত্বগুণ, দ্বিতীয়টীতে—রজো-গুণ, আর তৃতীয়টীতে—তমোগুণ যেন পূর্ণ করে রেখেছেন। এখন বিচার করে দেখ, পাশাপাশি তিনখানা ঘর কর্‌তে হলে, পর পর চারিটী দেওয়াল উঠাতেই হবে, নতুবা পাশাপাশি তিনটা ঘর ত হয় না। সেইরূপ মানব-ইটের চারিটী দেওয়াল দিয়ে তিনি যখন তিনটী গুণ স্বতন্ত্রভাবে রাখ্‌বার্ জন্যে তিনটী ঘর তৈয়ার কর্‌লেন।

(এই সঙ্গে আর একটা কথা বলি—মনে কর, সত্ত্বগুণ—যেন 'আগুণ,' রজোগুণ—যেন 'জল' আর তমোগুণ—যেন 'বরফ'।) তখন যে ঘরটীতে তিনি অগ্নিসম সত্ত্বগুণ পূর্ণ কর্‌লেন, সেটীর একেবারে পাশের দিকের দেওয়ালটী সত্ত্বগুণের ভাবেই পূর্ণ বা তার অগ্নিময় তেজে তা উত্তপ্ত হবেই, তার পরবর্ত্তী ঘরটীতে যেন জলময় রজোগুণ পূর্ণ থাকায়, তার একটী দেওয়াল সত্ত্ব ও রজোগুণের ঘরের মধ্যবর্ত্তী হবে, তাতে একদিক্ থেকে যেন সত্ত্বগুণের তাপ, আর একদিক থেকে যেন রজোগুণের সামান্য শৈত্য মিলে, পূর্ব্ব দেওয়ালের অপেক্ষা মধ্যবর্ত্তীভাবেই যেন অল্প উত্তপ্ত বা সত্ত্ব + রজো-গুণের ভাবে পূর্ণ হবে। তারপর তৃতীয় ঘরটীতে এই ভাবেই যেন তুষারময় তমোগুণে পূর্ণ থাকায়, তার একটী দেওয়াল—রজঃ ও তমোগুণের ঘরের মাঝেই হবে; তাতে একদিক থেকে যেন রজোগুণের সামান্য শৈত্য, আর একদিক্ থেকে যেন তমোগুণের ভাবপূর্ণ বা তার জড়তাপ্রদ গভীর শৈত্য মিলে, দ্বিতীয় দেওয়াল হতে অধিকতর শীতলতা বা রজঃ + তমোভাব প্রাপ্ত হবে। আর সবশেষের দিকের অর্থাৎ তমোগুণের ঘরের একেবারে পাশের দিকের দেওয়ালটা কেবল তমোগুণেরই ভাবে বা যেন সম্পূর্ণ জড়তাপূর্ণ ভাব প্রাপ্ত হবে।

"এখন বিচার করে দেখ, এই ভাবে তিনটী গুণের আশ্রয়রূপ তিনটী ঘরের চারিটী দেওয়াল, আর সেই দেওয়ালের অন্তর্গত যেন মানবরূপী ইটগুলি—তাদের মধ্যে, যেগুলির ক্রিয়া ও সংস্কার সম্পূর্ণ সত্ত্বগুণ-প্রধান, সেইগুলিই 'তাঁর' নির্দ্দিষ্ট গুণ-কর্ম্ম-অনুসারে প্রকৃত "ব্রাহ্মণ"। যেগুলির ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও সংস্কার—সত্ত্ব + রজঃ, এই উভয় গুণ-মিশ্রিত, তারাই "ক্ষত্রিয়"। যাদের গুণ-কর্ম্ম ও আচার-

ধর্ম্ম—রজঃ+তমঃ, এই দুই গুণ-মিশ্রিত, তারাই, "বৈশ্য"। আর যাদের গুণ-কর্ম্ম ও ব্যবহারাদি সবই কেবল তমোগুণযুক্ত তারাই "শূদ্র"।

"এই প্রাকৃতিক 'বর্ণবিভাগ' প্রাচীনকালথেকে চিরন্তনভাবে সমাজের অন্তর্গত শুদ্ধ চারিটী বর্ণের ভিতর অতি স্পষ্টরূপেই প্রতীত হ'ত, তাদের আচার-ব্যবহার ক্রিয়া-বিধান, তখন যেন ঠিক ঠিক গুণানুসারেই বিধিবদ্ধ ছিল, তা'তেই সেকালে সমাজের সঙ্করত্ব কিছুতেই ঘট্'ত না। এখন বর্ণ-সঙ্করত্বের মূল কারণ—কেবল রজঃ-বীর্য্যেরই সাঙ্কর্য্যজনিত নয়, অনেকস্থলেই আচার, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বৃত্তি ও ব্যবহার আদি নানাপ্রকার সঙ্করতার কারণে ব্রাহ্মণের গৃহেও ব্রাহ্মণেতর আচার-প্রাধান্য যেমন দেখা যায়, সেই রকম অন্যান্য জাতি অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এমন কি ঘোর তমোগুণাশ্রিত নীচ শূদ্রের ঘরেও ব্রাহ্মণাদি-আচারবিশিষ্ট জীবের জন্ম হতেও দেখা যায়! এ'কে শাস্ত্রে—"আরূঢ়পতন"-অবস্থা বলে। কেহ পূর্ব্বজন্মের কোন উন্নত বা মিশ্রিত পুরুষার্থপূর্ণ কর্ম্মের ফলে—এই জন্মে ব্রাহ্মণাদি কোনও উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু তার পূর্ব্ব-সংস্কারবশে —এখনও তার সেই নীচ কর্ম্ম-সম্বন্ধ দূর হয় নি! সেই জন্যেই অনেক ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের সন্তানদের—নীচ, ভিন্ন-বর্ণের আচারের অনুগত বৃত্তিপরায়ণও দেখা যায়। এমন কি জুতার বা চামড়ার ব্যবসায়, ভাগাড়ের অস্থি-চর্ম্মের ঠিকা, শূকর-কুক্কুটাদিরও ব্যবসায় করে; তেল, নুণ, লঙ্কা, চুণ, মদ, মধু ও গো-আদিও বেচে; অনেকেই পেটের দায়ে নীচ দাসত্ব করে। আবার অতি নীচকুলে জন্মগ্রহণ করেও—কেহ "রুইদাস," কেহ "কবীর-সাহেব," কেহ "ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত," ঘোষপাড়ার "কর্ত্তামহাশয়" ও "হরিদাস" হন্,। এ

ছাড়া কত সাধু, অবধূত, ব্রহ্মচারী, গোঁসাই, বৈষ্ণব, কত উদাসী, গিরি, পুরী, নাম নিয়ে সকলের শ্রদ্ধা-পূজা নেয়। এ সকলই জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত প্রারব্ধ-কর্ম্মের ফল, অর্থাৎ তাহার পূর্ব্ব-জীবনের অর্জ্জিত সেই কর্ম্মফলানুসারে বিধাতার বিধানেই পূর্ব্ব হতে তাহার ভোগকার্য্য আরব্ধ হয়েছে। তা' সাঙ্গ করতে অবশ্য জীবের কোনও পুরুষার্থেরই প্রয়োজন হয় না, তা' যেন আপ্‌নাপ্‌নি তার জীবনস্রোতে কি এক অদৃষ্টভাবে কেবল ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্চে। সেই প্রারব্ধ-কর্ম্ম-সংস্কারজনিত গুণ-প্রধানতাই জীবের প্রকৃত জাতি বা বর্ণ। সে লৌকিকভাবে যে কুলের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করুক্ না—তাতে তার যেমন একটা জন্মগত "সামাজিক-জাতি বা বর্ণ" নির্দ্দিষ্ট হয়, তেমনই তার যথার্থ গুণ-কর্ম্ম লক্ষ্য করে, তার "আন্তরিক প্রকৃত বর্ণ বা জাতিও" নির্ণয় করতে পারা যায়। আর্য্য-ঋষিরা এই "আন্তরিক প্রকৃত বর্ণ-বিভাগের" বিধি জ্যোতিষশাস্ত্রের ভিতর স্পষ্ট করেই বলে গেছেন। কোনও সামাজিক-বর্ণের অন্তর্গত কোনও ব্যক্তির জন্মপত্র লেখ্‌বার সময়, তা'তে তার সেই আন্তরিক জাতি বা বর্ণের উল্লেখ থাকে। আজ-কালকার পঞ্জিকার মধ্যেও কোন্ লগ্নে জন্মগ্রহণ করলে, জাতক কোন্ বর্ণের হবে, তা' স্পষ্ট করেই লেখা থাকে। অর্থাৎ সেই সেই নির্দ্দিষ্ট লগ্নে ব্রাহ্মণাদি যে বংশেই হউক, এমন কি ম্লেচ্ছ বা পাশ্চাত্যজাতির মধ্যেই হউক, জাত-ব্যক্তি "বিপ্রাদি চাতুর্ব্বর্ণের" কোন না কোন বর্ণেরই যে অন্তর্গত হবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তার জন্মপত্রের মধ্যে জ্যোতিষীরা তাও স্পষ্ট করে লিখে দেন্।

"কোনও নীচকুলে জাত আন্তরিক উন্নত বর্ণের লোককে, সমাজ-বিধি অনুসারে প্রথম প্রথম সেরূপ ভাবে সম্মান না করলেও, পরে

তার প্রকৃত গুণের বিকাশ হলে, জগৎ চিরকালই তার পূজা কর্‌তে বাধ্য। তাই বলি—ব্রাহ্মণাদির ঘরে জন্মে, কেবল পৈতে পর্‌লেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হয় না, আবার পৈতে ফেলে দিলেই দণ্ডী, সন্ন্যাসী, পরমহংস বা ব্রহ্মজ্ঞ হওয়াও যায় না। সকল ক্ষেত্রেই যথার্থ গুণকর্ম্মের উৎকর্ষবিধান করা চাই। তাই জীবের একমাত্র সাধনার ধন বা প্রকৃত সৎ-পুরুষার্থ। নতুবা ঠিক নাট্যলীলায় জীবনের যবনিকা-পতনের সঙ্গে সঙ্গেই জীবের জাতীয় অভিমান আদি সমস্তই অবসানপ্রাপ্ত হয়। আবার নূতন অভিনয়সূত্রে, পটপরিবর্ত্তনের সঙ্গে, তার অপকর্ম্মজনিত নূতন হীন-জাতির সাজে, তা'কে আবির্ভূত হয়ে, অতি হেয়-কর্ম্মানুরত হ'তে হবে।

"এই জাতি, আর তার অনুগত সুখ-দুঃখজড়িত ভোগ, জীব কেবল নিজ অভিমানপুষ্ট কর্ম্মবশেই গ্রহণ কর্‌তে বাধ্য হয়। আর বিধি-নির্দ্দিষ্ট তা'র ভোগ-কালের শেষ পর্য্যন্ত সময়, তার "আয়ু" বলেই কথিত হয়। অর্থাৎ জীবের সেই কর্ম্মভোগ শেষ হলেই, তা'র আয়ুও শেষ হয়, তা'র তখন প্রাণবিয়োগ হয়। তখনই এই দেহখানা যে, প্রকৃত জীব নয়, তা সবাই স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারে। হাড়-মাংসের সমষ্টিভূত এ যে শুধুই মাটীর বিকারমাত্র, তা আর কাকেও তখন বুঝিয়ে দিতে হয় না। তখন তা'র খাওয়া-পরা, শোয়া-বসা, চলা-ফেরা, দেখা-শুনা, কি হাসি-কান্না আর কিছুই থাকে না। প্রকৃতই যেন মাটীতে গড়া একটা পুতুলের মত এই দেহটা তখন পড়ে থাকে। কিম্বা ঠিক যেন দমহীন-ঘড়ির কলের মতই তা' তখন অচল হয়, আর নড়েও না—চড়েও না, আর সাড়া-শব্দ কিছুই তা'র থাকে না। প্রাণরূপ দমটুকু যে, তখন তা'র ফুরিয়ে গিয়েছে! সে ঘড়িতে যতক্ষণ চল্‌বার মত শক্তি বা দম ছিল, অর্থাৎ তা'র নির্দ্দিষ্ট

আয়ুরূপ ভোগ-কাল ছিল, তা যে তখন শেষ হয়ে গিয়েছে। তা'র লৌকিক জাতি-অভিমান সব তখন ফুরিয়েছে। কিছু কাল পরে হয় ত শ্মশানে-পরিত্যক্ত তা'র কঙ্কালগুলা লোকে দেখ্‌তে পাবে, কিন্তু তা দেখে, কেউ তা'র জাতি-বর্ণ, রূপ-গুণ কিছুই নির্ণয় কর্‌বে না। তবে প্রকৃত জাতি-বর্ণের অধিকারী কে? অস্থি-মাংসের সমষ্টিভূত এই দেহ-পিণ্ডটা, না আর কেহ? একবার ভেবে দেখ দেখি গঙ্গাধর! বর্ণাশ্রমের মূল-সূত্র কোথায় দেখা যাচ্চে? কাজেই মেথর-চামারই বলো, আর ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদিই বলো, প্রকৃত বর্ণভেদ জীবের 'গুণ' আর 'কর্ম্মে'। গুণ-কর্ম্মের উৎকর্ষতা লাভ হলেই, সে এই লৌকিক সমাজের মধ্যে তা'র জন্মগত যে বর্ণের পরিচ্ছদের ভিতরেই থাকুক্ না, তা'কে লোক যতই কেন চেপে বা ছাই-পাঁশ আবর্জ্জনা দিয়ে ঢেকে রাখুক্ না, সে এক দিন ফুটে বার হবেই— সে ঘন পল্লব কি কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যের মধ্যে গুপ্তভাবে ফুট্‌লেও, তা'র অদৃশ্য সৌরভ জগৎকে মাতিয়ে তুল্‌বেই। তাই বলি গঙ্গাধর, তুমি ঠিকই বলেছ—ও লোক্‌টার এ জন্মের বর্ণ-পরিচ্ছদ মেথরের হলেও, ওর অন্তর হ'তে শিবের অঙ্গ-চর্চ্চিত বিল্ব-চন্দনের যেন বিমল সৌরভ ফুটে বার হচ্চে, ও যে পরমসাধক, তাই ওর অমন ভাব, অমন কথা, আর অমন সুন্দর ভাবে প্রণবপুটিত ব্রহ্ম-স্মরণ, ও যে কেবল ওর জন্মার্জ্জিত প্রারব্ধ-ভোগ-কালই ক্ষয় কর্‌ছে! জয় আনন্দময় প্রভো!"

এই সময় সেই লোক্‌টা তামাক খাইয়া, বিদ্যানন্দজীদের নিকটে আসিয়া দূর হইতে বলিল—"বাবাজী, এতক্ষণে বোধ হয় সুস্থ হয়েছেন, চলুন—আপনাদের স্নানের বাউলী দেখিয়ে দিই।"

তিনি বলিলেন—"চল"। গঙ্গাধর ও মনোহরদাসকে বলিলেন—"চলহে, তোমাদের কৌপিনাদি নাও, স্নান করে আসি, বেলা অনেক হয়েছে।" তাঁহারা সেই লোকটীর সহিত যাইয়া স্নানাদি সমাপন করিয়া আসিলেন ও ভিক্ষা প্রস্তুত হইলে, নিজেদের ভিক্ষান্তে অবশিষ্ট সমস্ত অন্নপ্রসাদ সেই মেথরকে ধরিয়া দিলেন। সেও আনন্দ-সহকারে সেই প্রসাদ গ্রহণ করিল। তাঁহারা সে দিন তাহার বিশেষ অনুরোধে সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন। তাহাতে সে ব্যক্তির আনন্দ আর ধরে না। সে দূরে বসিয়া তাঁহাদের নানা ধর্ম্ম-বিষয়ের আলোচনা-কথা শুনিয়া যেন কৃতার্থ হইতে লাগিল।

পর দিন প্রভাত হইলে, তাঁহারা তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া কাঙ্গড়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। এখান হইতে কাঙ্গড়া প্রায় পাঁচ ক্রোশ। আজ আর মেঘ ঝড় নাই, আকাশ বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। তাঁহারা আড়াই ক্রোশ আন্দাজ চলিয়া, বেলা প্রায় নয়টার সময় এক গণ্ডগ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। এই গ্রামটীর নাম—দৌলতপুর। ঘর-বাড়ী দোকান-পাট, বাজার-ঘাট, সবই প্রয়োজন মত আছে। লোকজনও এখানের বেশ ভক্তিমান। বাজারের এক দোকানদার তাঁহাদের দেখিয়া খুব আদর-যত্ন করিয়া বসাইল। পরে তাহারই অনুরোধে সেই স্থানেই মধ্যাহ্নে ভিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তথায় বিশ্রাম করিলেন। লোকটী বেশ ভক্ত, মোটামুটী কিছু লেখাপড়াও জানে এবং মহাপুরুষ ও সাধুসজ্জনদিগের নিকট অবসর মত যে সৎসঙ্গও করে, তাহার কথা বার্ত্তায়, ও আচার ব্যবহারে তাহাও সহজে বুঝিতে পারা গেল। নানাবিধ জটিল শাস্ত্রীয় প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাইয়া, বেচারা নিতান্তই পরিতৃপ্ত হইল। তাহার ইচ্ছা—আজ রাত্রিকাল তাঁহারা

এই স্থানেই অবস্থান করেন। কিন্তু কাঙ্গড়ায় যাইয়া রাত্রিবাস করিবার ইচ্ছা প্রবল হওয়ায়, তাঁহারা সেদিন আর তথায় রহিলেন না। তাহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

তাঁহারা তথা হইতে সময় মত বাহির হইয়া, সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় কাঙ্গড়ার সহরে সমীপবর্ত্তী হইলেন। "বাণগঙ্গার" সেতু পার হইয়া, সেই নদীর ধারে ধারেই বেশ চড়াই-উৎরাইযুক্ত আঁকা-বাঁকা পাকা-পথে চলিয়াছেন, স্থানটীর দৃশ্য অতি মনোহর। বহু প্রাচীন ঘাট ও জীর্ণ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, অশ্বত্থ ও বট আদি বহু বৃক্ষসমাকীর্ণ বাণগঙ্গার সেই তীরভূমি দেখিলে, কাঙ্গড়া যে, এক সময় অতি প্রাচীন ও বহু সমৃদ্ধিশালিনী নগরী ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

কাঙ্গড়া পঞ্জাবের একটী প্রসিদ্ধ জেলা। পূর্ব্বেই ইহা রাজপুত কোটা-নরপতিদিগেরই রাজ্য ছিল। তখন তাঁহাদের এই রাজধানীর নাম ছিল—"নগরকোট" এবং তাঁহাদের দুর্গটীর নামই চিরকাল "কাঙ্গড়া" বলিয়া বিখ্যাত ছিল। পরবর্ত্তী সময়ে এই দুর্গেরই নাম অনুসারে নগরের নামও 'কাঙ্‌ড়া' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বাণগঙ্গার তটে উচ্চ পাহাড়ের উপর সেই দুর্গটী সর্ব্ববিষয়ে প্রকৃতই যেন সমগ্র কাঙ্‌ড়া-উপত্যকার মুকুটরূপে বিরাজিত ছিল। ইংরাজ-অধিকারের পুর্ব্বসময় পর্য্যন্ত, এই রাজধানী ও দুর্গাদিসহ সমগ্র প্রদেশই উক্ত কোটা-নরপতিদিগের অধীনে ছিল। ইংরাজদের আমলে প্রাচীন নগরের নামটীমাত্রই এখানে বিদ্যমান আছে, ইং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে এই জেলার সরকারী কাজকর্ম্ম সমুদায় ব্যাপারই "ধর্ম্মশালা" নামক স্থানে পরিবর্ত্তিত

হইয়াছে। এক্ষণে ইহা কাঙড়ার সাধারণ তৌশিল মাত্রেই পরিণত হইয়াছে।

যাহা হউক বিদ্যানন্দজীরা এই সকল পুরাতত্ত্ব পরিদর্শন করিতে করিতে সন্ধ্যার পর—"বীরভদ্র" মহাদেবের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই অনেকগুলি যাত্রী আসিয়া তথাকার মন্দিরসংলগ্ন ঘর-কয়েকটী অধিকার করিয়া বসিয়াছে। প্রাঙ্গনও যাত্রী-জনে পরিপূর্ণ। ইঁহারা এই সব ভাব-গতিক দেখিয়া, বীরভদ্রের মন্দিরের পার্শ্বেই বা প্রায় সংলগ্ন নর্ম্মোদেশ্বরের মন্দিরের অপ্রশস্ত অলিন্দ বা চাতালের উপর আসিয়া বসিলেন। স্থান অতি সামান্য, কোনরূপে তাঁহারা তথায় আসন বিছাইলেন। স্বার্থান্বেষী পূজারীমহাশয় ধনী যাত্রীদিগের লইয়াই ব্যস্ত, তিনি সাধুদিগের দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না, বরং তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করায়, তিনি যেন বিরক্তির সহিত 'গজ্ গজ্' করিয়া, কি বকিতে বকিতে চলিয়া গেলেন। বিদ্যানন্দজী বলিলেন— "গঙ্গাধর দেখ্‌লে, সেখানে মেথরকে শঙ্কর বলেছিলে, আর এখানে এই শঙ্করের দরবারে শিবের পূজারী-মহারাজকে কি বল্‌বে?"

একজন প্রৌঢ় ব্রহ্মচারী দূরে বসিয়াছিলেন, তিনি এই সাধুদের একটু অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া, তাড়াতাড়ি তাঁহাদের নিকটে আসিয়া অতি বিনয়সহকারে সকলের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে লাগিলেন। তাঁহারই যত্নে সে রাত্রি তাঁহারা যথাসম্ভব জলযোগপূর্ব্বক তথায় শয়ন করিলেন। তিনি বলিয়া গেলেন— "কাল প্রাতে আমি আপনাদের থাকবার ভাল স্থান ঠিক্ করে দেবো। আপনাদের আর কোনরূপ অসুবিধা হবে না।"

ব্রহ্মচারিটী বেশ ভদ্রলোক ও কঠোর তপস্যাপরায়ণ বলিয়াই

বোধ হইল। তাঁহার জন্মস্থান মথুরায়, বোধ হয় পূর্ব্বাশ্রমের সকলেই আছে, বৈরাগ্য-বশেই সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, বহুদিন হইতে এই স্থানেই একান্তে অবস্থান করিয়া, আপন সাধন-ভজন দ্বারা শেষ-জীবন অতিবাহিত করিতেছেন।

শেষ-রাত্রিতে ইহাঁরা আপন আপন সাধনাদি ক্রিয়া সমাপন-পূর্ব্বক যখন উঠিলেন, তখনও সামান্য সামান্য অন্ধকার আছে, সেই ব্রহ্মচারী-মহারাজও স্নানাদি সারিয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন ও তখনই তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া শৌচ ও স্নানাদির স্থান দেখাইয়া দিলেন এবং বলিয়া গেলেন—"আপনারা ততক্ষণ প্রাতঃকৃত্য সমাধা করুন, আমিও এই খানে সন্ধ্যাদি ক্রিয়া শেষ করে লই, তার পর আপনাদের সঙ্গে নিয়ে, আপনাদের থাক্‌বার ব্যবস্থা করে দেবো।"

ইহাঁরা তাঁহার কথামত তিন জনেই প্রাতঃকৃত্যের জন্য চলিয়া গেলেন। যথা সময়ে তিনি নিকটস্থিত দশনামী আখাড়ায়—"সূর্য্যকুণ্ডে" একখানি গৃহ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তাঁহারা সেই ব্রহ্মচারীজীর বিশেষ অনুরোধে তিন চারি দিন তথায় অবস্থান করিলেন। তিনিই তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া "ব্রজেশ্বরী" দেবীর দর্শন করাইয়া আনিলেন। তথায় অন্য যাহা যাহা দেখিবার ছিল, সে সমস্তই তিনি ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের দেখাইয়া দিলেন। বিদ্যানন্দজীরা তাঁহার সঙ্গ পাইয়া বড়ই আনন্দে কাটাইতেছেন।

বজ্রেশ্বরী বা কাঙ্‌ড়াদেবীর প্রাচীন মন্দির ও সহরের পুরাতন অন্যান্য মন্দিরাদিও এখন আর কিছুই নাই। ইং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে এখানে ভীষণ ভূমিকম্প হয়, তাহাতে এই কাঙ্‌ড়ার যাহা কিছু ছিল, সমস্তই সমভূমি হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় সকল

লোকের মুখেই, বিশেষ বহু সাধুসজ্জনের মুখেও অবগত হওয়া যায় যে,—"গত ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ হইতে বীরভদ্রের মন্দিরটীর জীর্ণ-সংস্কার হইতেছিল, তদুপলক্ষে মন্দিরের তলদেশ বা মেজেতে মর্ম্মর প্রস্তর বসাইবার জন্য উহাতে পূর্ব্ববিস্তৃত পুরাতন পাথরের 'শিল্লী' বা 'ফরাসগুলি' উঠান হইতেছিল। কারিগরেরা এক স্তর সেই পাথরের শিল্লীগুলি তুলিয়া দেখিল, উহার নিম্নে আরও এক স্তর উহা অপেক্ষাও জীর্ণ পাথর বসান রহিয়াছে। সকলের ইচ্ছা হইল, তাহাও তুলিয়া ফেলিয়া, বেশ ভাল করিয়া পিটিয়া, নূতন মসলা দিয়া শঙ্খমর্ম্মরের পাথরই বসান হউক। মিস্ত্রীরা যখন তাহা তুলিয়া ফেলিল, তখন দেখা গেল—তাহারও নীচে সেই রূপ আরও এক স্তর পাথর রহিয়াছে। তাহারা সেই স্তরও তুলিবার জন্য আদেশ-প্রাপ্ত হইলে, সাবল দিয়া ভূমিতে আঘাত করিবামাত্র সহসা যেন মুল পাহাড়ের উপরই চোট্ পড়িল বলিয়া তাহাদের মনে হইল, তাহারা সঙ্গে সঙ্গে সেই সাবল তুলিয়া দেখে যে, সাবলের মুখময় রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে। তাহারা তাহাতে অতীব ভীত হইয়া কর্ম্মকর্ত্তাদের ঘটনাস্থলে ডাকিয়া ও সেই সাবলের মুখের টাট্‌কা রক্ত-চিহ্নও দেখাইল। তাহা দেখিয়া সকলেই যেন স্তম্ভিত হইয়া যাইলেন। তখন অপরাহ্ন হইয়া গিয়াছে, কর্ম্মকর্ত্তারা পরামর্শ করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, আজ আর কোন কাজ কর্‌বার দর্‌কার নাই, কাল সকালে যাহা হয় করা যাবে।" এই বলিয়া সকলেই তখন চলিয়া গেল।

ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল, গভীর রাত্রিতে সেই মন্দিরের মধ্য হইতে বালক-কণ্ঠের অতি যন্ত্রণাসূচক অদ্ভুত ক্রন্দন-ধ্বনি সকলেই শুনিতে পাইল। এমন কি সেই রাত্রিতে বহু দূরস্থিত লোকেরাও

সেই ক্রন্দনধ্বনি স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছিল। প্রভাতে সে ধ্বনি আর শুনিতে পাওয়া গেল না, কিন্তু ধরিত্রী বুঝি এইবার চঞ্চলা হইলেন—অনতিবিলম্বে পৃথিবী কাঁপিতে আরম্ভ করিলেন, সেই ভীষণ ভূমিকম্পে কাঙ্ড়ার সর্ব্বনাশ হইল, সমস্তই একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল। সেই প্রাচীন নগরের অতি পুরাতন ও পবিত্র বজ্রেশ্বরীদেবীর মন্দির হইতে নগরের উপকণ্ঠস্থিত অন্যান্য পল্লীর ও প্রত্যেক গৃহ সমভূমি হইয়া গেল। অতি অল্পক্ষণের মধ্যে সেই সুন্দর সাজান-সহরের চিহ্নমাত্রও আর পরিলক্ষিত হইল না, সকল স্থানেই ইষ্টক, প্রস্তর ও মৃত্তিকাদির পর্ব্বতসম স্তূপসমূহই কেবল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এ হেন দুর্ঘটনাতেও বীরভদ্রের মন্দিরটীর গাত্র হইতে একটুও চূণ-বালি খসে নাই। কাঙ্ড়ার প্রাচীন স্মৃতির যাহা কিছু, এক্ষণে কেবল এই বীরভদ্রের মন্দিরেই দেখিতে হইবে। বাবা বীরভদ্র যেন তাঁহার ত্রি-নয়ন উন্মীলিত করিয়া কাঙ্ড়ার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সততই প্রত্যক্ষ করিতেছেন।”

বীরভদ্র-বিষয়ে এই সকল প্রবাদ অমূলক নহে! ভক্তিমান সাধকমাত্রেই একরাত্রিও তথায় যথাবিধি ভূতশুদ্ধির পর জপাদি করিলে, অতি স্পষ্টভাবেই সেই স্থানের অদ্ভুত শক্তি ও মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারেন। যথার্থই স্থানটী অতিশয় উগ্রশক্তি-সম্পন্ন! বাবা বীরভদ্র যথার্থই যে, অনাদি-লিঙ্গ ও জাগ্রত-দেবতা, এখনও তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। অবিশ্বাসী জীব-জগৎকে যে ভাবে তিনি সেই আত্ম-লীলার পরিচয় প্রদান করিলেন, তাহা প্রত্যেকেরই ভক্তিভাবে ভাবিবার বিষয়!

এই মন্দিরের ন্যায় শ্রীশ্রীবজ্রেশ্বরী-দেবীর মন্দির-সন্নিহিত তাঁহার

ভৈরবজীও নাকি সেই ভীষণ ভূমিকম্পে অটলরূপে স্থিত হইয়া এখনও স্বস্থানে উপবেশন করিয়া আছেন। তাঁহার মন্দিরাংশ চূর্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি যেন অবিচল ও অক্ষুণ্ণভাবে আপনার স্থানে বসিয়া আছেন। তাঁহার বিরাট প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিরও কোন অঙ্গ-হানি হয় নাই। তিনি যেন এখন বীরভদ্রের সহিত একযোগেই পুনরায় বজ্রেশ্বরী প্রভৃতি দেবীর মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিতেছেন।

এক্ষণে সেই সকল মন্দির ও গৃহাদি পুনরায় নির্ম্মিত হইতেছে। কয়েক বৎসর ধরিয়া বজ্রেশ্বরী দেবীর নূতন মন্দির প্রস্তুত হইতেছে। পঞ্জাব অঞ্চলের মধ্যে এমন সমৃদ্ধিশালী, সমুন্নত, সুন্দর ও প্রাচীনতম মন্দির আর দ্বিতীয় ছিল না বলিয়াই শুনিতে পাওয়া যায়। নূতন মন্দিরটীও সুন্দররূপে গঠিত হইতেছে বটে, কিন্তু সেরূপ বিরাট আকারে আর পুনর্গঠিত হইবার আশা নাই।

মাতা বজ্রেশ্বরী-দেবীর ধ্যানমূলক কোনও মূর্ত্তি ইতোপূর্ব্বে মন্দিরে ছিল না, পূর্ব্বকথিত চিন্তাপূর্ণীআদি দেবীমুর্ত্তির ন্যায়, ইনিও শিলা-পিণ্ডময়ী-মুর্ত্তিতে এত কাল এখানে বিরাজিতা রহিয়াছেন। প্রবাদ আছে—"পূর্ব্বে বদ্রিনারায়ণ আদির ন্যায় এই অঞ্চলের দেবমুর্ত্তি-গুলিও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের ফলে বিনষ্ট হইয়াছিল, পরে ভগবান শঙ্করাচার্য্যদেব এই সমুদায় মন্দিরে শিলাময়ী-মুর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন।"

বিদ্যানন্দজীরা বজ্রেশ্বরী দর্শন করিতে আসিয়া দেখিলেন—জ্বালামুখীতে যে পরমহংস স্বামীজী-মহারাজ "তীর্থ-তত্ত্ব" সম্বন্ধে সকলকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তিনিও আজ এখানে আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করি-

লেন। তিনিও অতি আনন্দ-সহকারে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মায়ের মন্দিরের পূজারীরা অধিকাংশই হীন-বীরাচারী বা আধুনিক বামাচারী পণ্ডিত ও সাধক বলিয়া গর্ব্বিত। বাহ্য পঞ্চ-মকারের প্রাধান্য-বহুল গুপ্ত-অনুষ্ঠানমাত্রকেই সাধনার চূড়ান্ত অধিকার বলিয়া ইঁহারাও মনে করেন। গুরুপরম্পরা-নির্দ্দিষ্ট গূঢ় সাধন-বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ অন্যান্য প্রদেশের সাধারণ "তান্ত্রিক"-নামধারী সাধকের ন্যায় ইঁহারাও উচ্চতর জ্ঞান-তন্ত্রের যোগ-বিজ্ঞান-বিষয়ে কিছুই অবগত নহেন। ইঁহারা বিদ্যানন্দজীকে প্রকাণ্ড জটাজূট-ধারী এক জন বঙ্গদেশীয় শিক্ষিত ও সমুন্নত সাধু দেখিয়া, তাঁহার সহিত নিশায় "তত্ত্বানুষ্ঠানের" ইঙ্গিত করিলেন। গঙ্গাধর তাহার অর্থ ঠিক বুঝিতে না পারিয়া, বিদ্যানন্দজীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। পরমহংস স্বামীজী-মহারাজ তাহা দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া সংক্ষেপে সেই পূজারী পণ্ডিতদিগের তত্ত্ব-বিচার ও অধিকার আদি বিষয়ে অতিগূঢ় আলোচনা-সহযোগে সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন। ইঁহারা তাঁহার সেই গভীর উপদেশপূর্ণ তন্ত্রানুষ্ঠানের গুহ্য-রহস্য শুনিয়া, পরম পুলকিত হইলেন। তন্ত্র কি, তাহার অধিকারী-ভেদ, পশু, বীর ও দিব্যাচারীর সাধন-ক্রম, তাৎপর্য্য ও রহস্যপূর্ণ মন্ত্র, হঠ, লয় ও রাজযোগের সমন্বয়ভূত তন্ত্রের সমুন্নত সাধন-বৈচিত্র্যাদি বিষয়ে যে সব কথা তিনি বলিলেন, তাহা এ পর্য্যন্ত কাহারও নিকটে ইঁহারা কখনও শুনে নাই। মহাপুরুষের মুখে সেই সব কথা শুনিয়া, সকলেই তাঁহার চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট সাধনা-বিষয়ে যথা সম্ভব শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের জন্য ইঁহারা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার সেই সমুদায় সাধনার গুপ্ত উপদেশ কথা, এস্থলে প্রকাশ করা অসম্ভব; কারণ তাহা সাধক ব্যতীত অন্যের যেমন প্রীতিপ্রদ হইবে না, সেই রূপ অনধিকারীর নিকট তাহা প্রকাশ করাও শাস্ত্র-নিষিদ্ধ।

বিদ্যানন্দজীরা সেই দশনামী আখাড়ায় এখনও অবস্থান করিতেছেন। তথায় তিনটী প্রসিদ্ধ কুণ্ড আছে, তন্মধ্যে সূর্য্য কুণ্ডটীই সর্ব্বাপেক্ষা বড়, স্থানীয় শত শত লোক তথায় নিত্য স্নান করিয়া যায়, সেই কারণ সেই কুণ্ডের নামে আখাড়াটীওসাধারণতঃ 'সূর্য্যকুণ্ড' নামেই বিখ্যাত হইয়াছে। এই কুণ্ডটী চতুষ্কোণ, হাত-দশেক লম্বা ও চওড়াও প্রায় ঐ রূপই হইবে, তাহাতে আড়াই হাত কি আরও সামান্য-গভীর জল আছে। চারিদিকেই পাথর দিয়া বেশ ভাল করিয়া বাঁধান। ইহা পূর্ব্ব বর্ণিত হোসিয়ারপুরের বাউলিরই অনুরূপ, তবে সেটী গোলাকার, আর এটী চতুষ্কোণ, সেটীতে কেহ নামিয়া স্নান করে না, এটীতে সকলেই নামিয়া স্নান করে। ইহারও এক দিক হইতে ধীরে ধীরে জল আসিতেছে, আর এক দিক দিয়া নালা-পথে সেই অতিরিক্ত জল বাহির হইয়া যাইতেছে। এই কুণ্ডটীতে ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খুব কম করিয়াও বোধ হয় পাঁচ শত লোক স্নান করিতেছে বটে, কিন্তু জল এমনই স্বচ্ছ যে, প্রত্যেক ব্যক্তির পায়ের নখটী পর্য্যন্ত সব দেখা যায়। বিশেষতঃ ভোরে যখন প্রথম প্রথম লোকে স্নান করে, তখন ইহার তলায় একটী সূচ পড়িয়া থাকিলেও, তাহা পরিস্কার দেখা যায়।

ইহার পার্শ্বে আর দুইটী ছোট ছোট কুণ্ড আছে, তাহার একটী "রামকুণ্ড" ও অন্যটী সীতাকুণ্ড বলিয়া বিখ্যাত। এই দুইটীরই পরিসর অতি সামান্য—দুই হাত কি আড়াই হাত চতুষ্কোণ দুইটী চৌবাচ্ছার

মতই হইবে, গভীরতাও ইহাদের প্রায় সমপরিমাণ, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহা হইতে বোধ হয় প্রত্যহ হাজার হাজার কলসী জল, লোকে তুলিয়া লইয়া যাইতেছে, অথচ ইহার জল এক আঙ্গুলও কম হইতেছে না। ইহার মধ্যে আবার ছোট ছোট পুঁটী মাছ ঝাঁক বাঁধিয়া এ কোণ্ হইতে ও কোণ্ পর্য্যন্ত খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। সে অতি সুন্দর দৃশ্য। অথচ এই অল্প পরিসর জলে কোনরূপ গন্ধও নাই। সকলে এই জলই উত্তম ও স্বাস্থ্যপ্রদ পানীয়রূপে ব্যবহার করে। পূর্ব্বোক্ত বীরভদ্রের মন্দির-সংলগ্ন এইরূপ একটী বৃহৎ কুণ্ড আছে, তাহার জলও অনেকে ব্যবহার করে। সে কুণ্ডটীর নাম 'চন্দ্রভাগা'। তাহার নিকটে 'শীতলাকুণ্ড' নামে আরও একটী কুণ্ড আছে। এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে এইরূপ বহু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কুণ্ডরূপ বাউলি দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত শীতলাকুণ্ড হইতে কিছু দূরে একটী প্রকাণ্ড কুণ্ডের ধারে পাথরের নল-মুখ হইতে দুইটী ধারা অবিরত ভাবে পড়িতেছে, তাহার নাম "গুপ্ত-গঙ্গা"। তাহারও জল অতি শীতল ও মধুর।

বাস্তবিক এ স্থানে জলের ভারি সুখ। গঙ্গাধর, বিদ্যানন্দজী ও মনোহরদাসের সহিত এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে, কয় দিবস কাঙড়ায় অতি আনন্দেই কাটাইতেছে। তাঁহারা যে দশনামী আখাড়ায় ছিলেন, তাহা এত দিন সন্ন্যাসীদিগেরই অধিকারে ছিল। অধুনা তাহা এক জন মাতাজীর অধিকারে আছে। তিনিও সাধু, তাঁহার গুরুদেবের দেহান্তে, তিনিই অধিকারী-সূত্রে ইহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি অন্যত্র অবস্থান করেন, তবে নিত্য প্রাতে আখাড়ার প্রতিষ্ঠিত দেবতা ও শ্রীগুরুর আসন দর্শন এবং তাঁহাদের পূজা করিতে আসেন। কয়েক বৎসর হইতে

"কুলনাথজী" এক কানফটা সাধু এই স্থানে বাস করিতেছেন। যোগীন্দ্র গোরক্ষনাথ মহারাজের শিষ্য-সম্প্রদায়, অধুনা 'কানফটা' সাধু নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা দুই কানে গণ্ডারের চামড়ার বা তদ-ভাবে কাচের অথবা কোনও প্রকার বালার ন্যায় চ্যাপ্‌টা মাকড়ী পরিয়া থাকেন। সেই কারণ ইহাদিগকে কানফটা সাধু বলে। যাহা হউক তিনিও বেশ সরল ও সজ্জন ব্যক্তি। এখানে প্রায়ই দুই এক জন সাধু-সান্ত সময় সময় অবস্থান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, স্থানটী বেশ মনোরম।

এই স্থান হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে এক জন সিদ্ধ সাধকের এক সমাধি আছে। তথায় প্রতি বৎসর এই সময় বহু সাধু ও গৃহস্থ ভক্ত-জনের সমাগম হইয়া থাকে। বিদ্যানন্দজীরা সেই ব্রহ্মচারীজীর সহিত আজ সেই মেলায় সিদ্ধ-মহাপুরুষের সমাধিপীঠ দর্শন করিয়া আসিলেন ও পর-দিবস প্রভাতেই সকলের নিকট বিদায় লইয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কাঙ্‌ড়া হইতে বিদায় লইয়া গঙ্গাধররা এই বার উত্তরাখণ্ডস্থিত বৈদ্যনাথ দেবের দর্শনে যাত্রা করিলেন। এ স্থান হইতে বৈদ্যনাথজী প্রায় ষোল ক্রোশ পথ। ইংরাজের আমল হইতে এই পথের দুই পার্শ্বে বহু চা-বাগানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাহাতে শত শত পাহাড়ী বালক বালিকা লোক জন নিত্য কাজকর্ম্ম করিতেছে। এই সব বাগান প্রথমে ইংরাজ ব্যবসাদারেরাই স্বাধীনভাবে স্থাপন করিলেও, এক্ষণে তাহার অধিকাংশই প্রায় দেশীয় লোকের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। শুনা যায়—কাঙ্‌ড়া প্রদেশে সেই ভীষণ ভূমিকম্পের পর তাঁহাদের অনেকেই যৎসামান্য মূল্যে এই সকল বাগান বিক্রয় করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছেন।

তখন ইংরাজ ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা যে ভাবে এই সব বাগানের কার্য্য পরিচালিত হইত, এখন দেশীয় দিগের দ্বারা তাহার কিছুই হয় না, বলিতে হইবে। তাঁহারা যে সকল কল-কব্জা, যন্ত্র-পাতি, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ইন্দ্রালয়তুল্য ঘর-বাড়ী প্রস্তুত করিয়া, কার্য্যের যেরূপ অভিনব প্রসার ও প্রতিপত্তি করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই সমুদায় বাগানেরই দেশীয় মালিক বা কর্ত্তৃপক্ষ পরিচালকগণ তাহার শতাংশের একাংশও সম্পাদন করিতে পারিতেছেন বলিয়া বোধ হয় না। ইঁহাদের কার্য্য-কলাপ দেখিয়া মনে হয়—ইহাদের অন্তরে যেন তিলমাত্রও উৎসাহ নাই, মূলে

প্রতিভার লেশমাত্রও নাই, কোনরূপে যৎকিঞ্চিৎ লাভ হইলেই, যেন ইঁহারা পরম পরিতুষ্ট! ইংরাজ বাগিচাওয়ালাদ্বারা রচিত সেই তপোবন-সদৃশ চা-বাগান ক্রমে প্রকৃতই যেন জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। সেই সুন্দর ইন্দ্রভুবনসম ঘর-বাড়ীর ভিতর-বাহির সর্ব্বত্রই অতি জঘন্য অপরিচ্ছন্নতায় পূর্ণ, যেন চর্ম্ম-চটিকারই আবাস-স্থলরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

ইংরাজের কাছে তাহাদের কর্ম্ম-প্রিয়তা, উদ্যম ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা আদি সৎগুণাবলী যাহা যাহা শিখিবার, তাহা ত এ দেশের লোক একেবারেই শিক্ষা করিতে পারে না, তৎপরিবর্ত্তে সর্ব্বত্রই তাহাদের কেবল অতি হেয় অনাচার ও বাহ্য পোষাক-পরিচ্ছদের অনুকরণ করিয়া ময়ূরপুচ্ছধারী কাকের ন্যায় অতি কদর্য্য অভিনয় করে মাত্র! বাস্তবিক এই বাগিচাগুলির এইরূপ অধঃপতন হইয়াছে যে, তাহা দেখিলে দুঃখ প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না।

এখানে আর তেমন ভাল চাও এখন উৎপন্ন হয় না, কাজেই তাহার গ্রাহকও কম। দুই একটী ইংরাজের পরিচালিত বাগিচাও যে এখানে এখনও নাই, তাহা নহে। তাহাদের সেই রূপ উন্নত ধরণের কার্য্যের আদর্শ দেখিয়াও, দেশীয় পরিচালিত বাগিচা-গুলির যে উন্নতি নাই, তাহার একমাত্র প্রধান কারণ এই যে, ইহাদের অতিরিক্ত ব্যয়-সঙ্কোচ-বিধান। অতি সামান্য বেতনে অশিক্ষিত ও বুদ্ধিবিহীন লোকের দ্বারা কার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা করায়, ঠিক যেন "ছাগল দিয়া যব মাড়াইবার" চেষ্টায়, ইহাদের এই ভীষণ দুর্দ্দশা হইয়াছে।

প্রকৃত কথা বলিতে কি, ইংরাজ যে একটা কত বড় ব্যবসা-

দার-জাতি—তাহা এই সুদূর প্রদেশে তাহাদের চা-বাগানগুলি দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাহাদের যে অদম্য উৎসাহ, অকাতর পরিশ্রম ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের সাফল্যের উদ্দেশে কৃপণতা-দোষ-বর্জ্জিত যথাসম্ভব ব্যয়-বাহুল্যতাপূর্ণ কার্য্য-বিধান, তাহা দেখিলে, যথার্থই চমৎকৃত না হইয়া থাকা যায় না!

তাহারা যেখানেই থাকে, সেইখানেই নিজেদের প্রয়োজনমত সুখ, শান্তি, স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপযোগী সকল সামগ্রীরই সমাহার করিয়া নেয়। তাহারা এই চায়ের বাগানের মধ্যে চায়ের গাছ ব্যতীত বাদাম, আঞ্জির, পিচ্ আপেল ও ন্যাসপতি আদি সুমধুর মেওয়া ফলের বৃক্ষও যে কত লাগাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহাতেও যথেষ্ট লাভবান হয়। কিন্তু দেশীয় ব্যবসাদার দিগের সে দিকে তেমন দৃষ্টি নাই, যাহা তাহাদের পূর্ব্ব আমল হইতে আছে, তাহাই যেন যথেষ্ট। সকলেই যেন স্থবির বা গড্ডলিকাপ্রবাহের মত গড়াইতে গড়াইতে চলিয়াছে। আফিম্-খোর ব্যক্তিদের মত সদাই যেন তাহারা ঝিমাইতেছে! হায়, সকল বিষয়েই দেশের কি ভীষণ অধঃপতন হইয়াছে!

এদেশে চিড়্ বা গন্ধবিরাজের বৃক্ষ এবং প্রকৃত দেবদারু-বৃক্ষের জঙ্গলও যথেষ্ট আছে। বাঙ্গলাদেশে যাহাকে 'দেবদারু' বলে, তাহা ঠিক দেবদারু-বৃক্ষ নহে, তাহার যথার্থ নাম 'আশা-পালা,' হিন্দীভাষায় আবার তাহাকেই 'অশোক' বলে, হিন্দু-স্থানীরা প্রকৃত অশোকফুলের গাছও বোধ হয় কখনও দেখে নাই। যাহা হউক যথার্থ দেবদারু ইংরাজীতে যাহাকে "পাইন" বলে, তাহাই দেওদারা' বলিয়া এদেশে প্রসিদ্ধ। তাহা দেখিতে কতকটা ঝাউ-গাছের মত, কিন্তু তাহা অতি প্রকাণ্ড বৃক্ষ।

বাঙ্গলাদেশের ন্যায় নিম্নভূমিতে বা যে কোন সমতল ভূমিতে তাহা জন্মে না। চিড় কিম্বা গন্ধবিরাজের জঙ্গল সাধারণতঃ সমুদ্রজলস্তর হইতে তিন চারি হাজার ফিট উচ্চ পার্ব্বত্য-ভূমি হইতেই দেখা যায়, কিন্তু দেবদারু সাধারণতঃ ছয় হাজার ফিটের নিম্নে দেখা যায় না। তবে ঐ শ্রেণীর দেওয়ার নামে আর এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহা চারি পাঁচ হাজার ফিট উচ্চ পার্ব্বত্য-ভূমি হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই চিড় ও দেবদারুর হাওয়া নাকি খুব ভাল, স্বাস্থ্যের যথেষ্ট সহায়ক ও হিতকর। বিলাতি "পেপ্" বলিয়া যে সর্দ্দি-কাশির প্রসিদ্ধ পেটেণ্ট ঔষধ ডাক্তার-খানায় বিক্রয় হয়, অনেকে বলেন, তাহা এই চিড় ও দেবদারুর সারাংশ হইতেই প্রস্তুত হয়। এ দেশে সে "পেপের" সংবাদ প্রায় কেহই রাখে না, আর ইহাদের প্রয়োজনই বা কি? লোকের সাধারণ স্বাস্থ্য এখানের খুবই ভাল।

বিদ্যানন্দজীরা কাঙ্ড়া-উপত্যকার এই ষোল ক্রোশ পথ প্রাকৃতিক বিবিধ শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে মনের আনন্দেই চলিয়াছেন। দূরে উচ্চ অনুচ্চ অসংখ্য পর্ব্বতশ্রেণী, তাহার পশ্চাতে তুষার-ধবল কিরীট-শির্ষ-চূড়াগুলি, উত্তরা-খণ্ডের স্বভাবসুলভ প্রকৃত বৈশিষ্ট্যেরই অপূর্ব্ব পরিচয় দিতেছে।

এখানের ভূমিও যথেষ্ট উর্ব্বরা, তাহাতে ধান্যাদি বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ধান্য-ক্ষেত্রাদিতে বর্ষার জলের প্রত্যাশায় কৃষকগণকে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয় না। ঝরণার জলের সাহায্যেই ইহাদের সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়।

বিদ্যানন্দজীরা মধ্যে মধ্যে দুই একটী চা-বাগানে কয়েক দিন আশ্রয় লইয়াছিলেন। বাগানের অধিকারীরা তাঁহাদের ন্যায় সাধু-

অভ্যাগতকে পাইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। ব্যবসায় বাণিজ্যাদি লৌকিক উন্নতিকর কার্য্যে তাঁহারা অত্যন্ত দীন হইলেও, সাধুসেবা ও দানধর্ম্মাদিতে বা পারলৌকিক উন্নতিকর পুণ্যসঞ্চয়ে তাহারা যেন বংশপরম্পরায় অধিকারীসূত্রে এখনও হীন হয় নাই। অনেকেই তাঁহাদের সেবা করিয়া, তাঁহাদের ধর্ম্মকথা ও উপদেশ-সমূহ অতি মন দিয়াই শুনিয়াছিল ও আপনাদিগকে ধন্য বোধ করিয়াছিল। তাঁহারাও অলৌকিক উন্নতিমূলক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপদেশ ও আচার-ধর্ম্মেরও প্রয়োজনীয়তা-বিষয়ে সকলকেই বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

তাঁহারা 'পালমপুর' তহশিল হইয়া ক্রমে বৈদ্যনাথজীর মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিলেন। মন্দিরটী অতি প্রাচীন ও সুদৃঢ় প্রস্তর দ্বারা গঠিত। কাঙড়ার সেই ভীষণ ভূমিকম্পে এত দূরেস্থিত সুদৃঢ় মন্দিরেরও বিশেষরূপ স্পন্দন অনুভব হইয়াছিল। যেন "বীরভদ্রের" সহিত এই "বৈদ্যনাথদেব" সহানুভুতির ছলে নিজ মন্দিরাঙ্গ সঞ্চালন করিয়াছিলেন। তাহাতে মন্দিরের বিশেষরূপ ক্ষতি না হইলেও, বেশ একটু আঘাত লাগিয়াছিল। সেই কারণ স্থানে স্থানে আধুনিক ভাবে ভাল করিয়া মেরামত করা হইয়াছে। মন্দিরটী সেই অতীত কালে এমনই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ-স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, তাহা দেখিলে কেবল নয়ন মনই যে পরিতৃপ্ত হয়, তাহা নহে, পূর্ব্বাচার্য্য ঋষি-মুনি ও মহাত্মাদিগের সাধনার অভিনব স্থান-নির্ব্বাচন, গভীর সাধন-সামর্থ্য ও শ্রীভগবানে তন্ময়তার বিষয় ভাবিলেও এক্ষণে যুগপৎ চমৎকৃত না হইয়া থাকা যায় না।

মন্দিরটী এক নদীর ধারে উচ্চ পর্ব্বতখণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত, উহার নিম্নেই পর্ব্বতগাত্রে "ক্ষীর-গঙ্গা" নামে এক সুন্দর ঝরণা

অবিরত ভাবে বহিয়া যাইতেছে। তাহার জল যেমন স্নিগ্ধ, সুমধুর ও স্বচ্ছ, তেমনই স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম সহায়ক। এই ক্ষীর-গঙ্গার জলেই বাবা বৈদ্যনাথের নিত্যপূজাদি সকল কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। স্থানীয় প্রায় সকল লোকই এই জল পান করে।

মন্দিরের নিকটে কয়েকটী ধর্ম্মশালা আছে, একটী ডাকবাংলোও আছে। একটী বাজার, বিদ্যালয় ও ডাকখানা আছে। অদূরে কয়েকখানি ভাল গ্রামও আছে। দুই একজন সাধু মহাত্মা এখানে প্রায়ই বাস করিয়া সাধন ভজন করিয়া থাকেন। স্থানটীও বেশ দৈবী-শক্তিসম্পন্ন।

শ্রীমৎ তারানন্দ তীর্থস্বামীজী নামে এক সন্ন্যাসী এখানে অবস্থান করেন। এ অঞ্চলের মধ্যে তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট। মন্দির হইতে কিছু দূরেই তাঁহার এক আশ্রম আছে। অধিকাংশ সময় তিনি সেই স্থানেই থাকেন, প্রয়োজন মত অন্য অন্য স্থানে পরিভ্রমণ করিতেও বাহির হন। আশ্রমের স্থানটী অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন ও অধিকতর মনোরম। তথা হইতে বাবার মন্দিরের দৃশ্য আরও সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। আশ্রমের মধ্যে একটী অতি সুন্দর ও প্রাচীন "তারাযন্ত্র" স্থাপিত আছে। শুনিতে পাওয়া যায়—"পূর্ব্বেও কোন কোন মহাত্মা তথায় অবস্থান করিয়া সাধনোন্নতি করিয়াছিলেন।" তারানন্দজী গুজরাটী ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, তবে সুন্দর বাঙ্গলা জানেন। তিনি বহুদিন পূর্ব্বে নদীয়া, শান্তিপুর, ভাটপাড়া, যশোর, ঢাকা ও বিক্রমপুর আদি স্থানে বাস করিয়া, শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন ও সাধন-ভজনাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন। তন্ত্রাদির সাধনাতেও তিনি যথেষ্ট উন্নত। তাঁহার এই "তারানন্দ" সন্ন্যাস-নামটী যে তন্ত্রজননী

বাঙ্গলা-দেশেরই প্রভাবজাত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক আচার্য্য ও সাধু-সন্ন্যাসীদিগের সহিত বিশেষভাবেই যে পরিচিত, তাহা তাঁহার সহিত আলাপে বেশ বুঝিতে পারা গেল। তিনি বেশ সত্ত্বগুণ-পরিপুষ্ট দিব্যাচারী উন্নত সাধক। পূজ্যপাদ ষষ্ঠ শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দজী মহারাজেরই অনুগত উপাসনাসমূহের পক্ষপাতী। সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় তন্ত্র, সাধনা ও দর্শনাদি-বিষয়ে কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। উত্তরা-খণ্ডের এই বৈদ্যনাথ সম্বন্ধেও নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ-সহযোগে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

তারানন্দজী বেশ অমায়িক ও বিজ্ঞ সন্ন্যাসী। দেশহিতকর কার্য্যেও তাঁহার যথেষ্ট লক্ষ্য আছে। তাঁহার যত্নে এই অঞ্চলে স্থানে স্থানে সংস্কৃত পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের বিদ্যানন্দজী, মনোহর ও গঙ্গাধরকে পাইয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাঁহাদের সহিত ধর্ম্মালোচনা ও সৎসঙ্গ করিয়া পরি-তৃপ্ত হইলে, তিনি স্থানীয় লোকজনকে বলিয়া বৈদ্যনাথজীর মন্দিরে কয়েক দিবস-ব্যাপী তাঁহাদের দ্বারা ধর্ম্ম-ব্যাখ্যার আয়োজন করিলেন। বহু দূর দূরান্তর হইতে তাঁহাদের ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা শ্রবণের জন্য এখানে একটী যেন বিরাট মেলার সমাবেশ হইল। সকলেই তাহাতে অতীব আনন্দলাভ করিলেন।

বৈদ্যনাথদেবের এই মন্দির ও তীর্থ-সম্বন্ধে পুরাণাদির মধ্যে যাহা লিখিত আছে, তাহার সার-মর্ম্ম এই যে,—লঙ্কাধিপতি দশস্কন্ধ রাবণ, এক সময় তাঁহার কয়েকটী আনন কর্ত্তিত হইবার কারণ, এই স্থানে তিনি সহস্র-বৎসরব্যাপী অতি কঠোর তপস্যা করিয়া, ভগবান বৈদ্যনাথদেবের কৃপালাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে

সেই আননকয়টী পুনরায় তাঁহার স্কন্ধে সংলগ্ন হইয়া যায়। অনন্তর তিনি বাবার বরপ্রাপ্ত হইয়া, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের অন্যতম মহাগ্রন্থ "অর্কপ্রকাশ" আদি রচনাপূর্ব্বক রাবণাচার্য্য নামে জগতে চির-প্রসিদ্ধ হন। তাঁহার সাধন ও তপস্যায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া, কৈলাসপতি শ্রীশ্রীমহাদেব তাঁহার একান্ত ইচ্ছাক্রমে বৈদ্যনাথরূপে লঙ্কাপুরীতে যাইতে বাধ্য হন। শ্রীভগবান তখন রাবণকে আজ্ঞা করিলেন—"তুমি আমায় মাথায় করিয়া লইয়া যাইবে বলিতেছ—বেশ কথা. কিন্তু আমাকে কোথাও তুমি নামাইও না, নামাইলে, আর আমি কোথাও যাইব না।"

তিনিত সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা, তাঁহার আবার 'এখানে' 'সেখানে' থাকা, যাওয়া ও না যাওয়াই বা কি? তবে তাঁহাকে ভক্তের অনুরোধে লৌকিক-জগতে লৌকিকভাবে অনেক লীলারই যে বিন্যাস করিতে হয়!

যাহা হউক রাবণ এই শিববাক্য শিরোধার্য্য করিয়া, তখনই ভগবান শ্রীশ্রীবৈদ্যনাথদেবকে স্কন্ধে উঠাইয়া লইলেন। এদিকে দৈবজগতেও এক অভিনব লীলাত্মক শঙ্কার অভিনয় হইতে লাগিল। সকল দেবতা সম্মিলিত হইয়া, রাবণের স্কন্ধ হইতে কেমন করিয়া বৈদ্যনাথদেবকে নামাইয়া লইতে পারেন, তাহারই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে রাবণ ভগবানকে লইয়া বহুদূর অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। দেবতারা স্থির করিলেন—"বরুণদেব অতি সূক্ষ্মপথে সত্বর যাইয়া রাবণের উদরের মধ্যে প্রবিষ্ট হউন।" যে কথা সেই কাজ—বরুণদেব রাবণের উদরের মধ্যে আংশিকভাবে প্রবিষ্ট হইয়া, তাঁহার ভীষণ প্রস্রাবের বেগ উৎপাদন করিলেন। রাবণ তখন প্রস্রাবের পীড়ায় অস্থির

হইয়া পড়িলেন, কিন্তু ভগবানকে স্কন্ধে লইয়াও ত প্রস্রাব করা সঙ্গত নহে, স্কন্ধ হইতে তাঁহাকে নামাইবারও উপায় নাই—"শিবের পূর্ব্ব আদেশ আছে—যেস্থানে তাঁহাকে নামান হইবে, তথা হইতে আর তিনি অন্যত্র যাইবেন না।" তবে উপায় কি? বিষম সমস্যা!

ভগবান শ্রীবিষ্ণু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপে তথায় আবির্ভূত হইলেন। রাবণ তাঁহাকে দেখিয়া সকাতরে অনুনয় করিলেন—"ঠাকুর, আপনি যদি কৃপা করিয়া একবারমাত্র আমার এই দেবতাটীকে ধারণ করেন, তাহা হইলে আমি প্রস্রাব করিতে পারি। আমি বহুক্ষণ হইতে তীব্র প্রস্রাবের পীড়ায় অধীর হইয়াছি। প্রস্রাবান্তেই আমি পুনরায় ইঁহাকে স্কন্ধে লইব। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইঁহাকে ভূমিতে নামাইয়া রক্ষা করিবেন না, তাহা হইলে ইনি আর আমার স্কন্ধে উঠিবেন না।"

বৃদ্ধরূপী বিষ্ণু বলিলেন—"আচ্ছা বাপু, আমি তোমার দেবতাকে ধারণ করিতেছি, তুমি শীঘ্র প্রস্রাব করিয়া লও।"

রাবণ দেবতাকে ব্রাহ্মণের হাতে দিয়া প্রস্রাব করিতে বসিলেন, কিন্তু সেত প্রকৃত প্রস্রাব নয়, দৈবী-লীলামাত্র! বরুণদেব তাঁহার উদরে অবস্থান করিয়া অবিরত প্রস্রাব উৎপাদন করিতে লাগিলেন, সে বেগ আর রুদ্ধ হয় না, ক্রমে তাহার ধারায় এক নদীরূপে প্রতীত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণও বিলম্বতার কারণ ব্যস্ততা প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন—"অনেকক্ষণ হইয়া গেল, আর আমি তোমার এই ভারি পাথরের ঠাকুর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না—নাও, শীঘ্র নাও, নতুবা আমি তোমার ঠাকুরকে নীচে নামাইয়া রাখিব।"

রাবণ ভীষণ বিপদে পড়িলেন, সে প্রস্রাব আর শেষ হয় না

সেই দৈবী-প্রস্রাবের প্রবাহই পরে "কর্ম্মনাশা"-নদীরূপে প্রসিদ্ধা হইয়াছে। রাবণের সকল ইচ্ছা সেই কর্ম্মনাশায় যেন শেষ হইল! বিষ্ণু বহুক্ষণ পরে, যেন বাধ্য হইয়া ঠাকুরকে তথায় নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে সেই দেবলীলার অবসান হইল—বরুণ-দেব-কৃত তাঁহার সেই "কর্ম্মনাশা-প্রস্রাবের ধারাও" বন্ধ হইল। তখন রাবণ উঠিয়া, ভগবান শ্রীবৈদ্যনাথকে নানা স্তব-স্তুতি করিয়া পুনরায় নিজ স্কন্ধে উঠাইতে যত্ন করিলেন, কিন্তু তিনি আর উঠিলেন না, সেই স্থানেই অচল অটল হইয়া অবস্থিত রহিলেন। রাবণ তখন অনন্যোপায় হইয়া যেন অতি বিরক্তির ছলে তাঁহার মস্তকে বৃদ্ধাঙ্গুলীর টীপ দিয়া বলিলেন—"বেশ ঠাকুর, তবে এইখানেই থাকুন, আমি চলিলাম।"

সেই অবধি বাবা বৈদ্যনাথদেব বাঙ্গলাদেশের অন্তর্গত "ঝাড়খণ্ডী বৈদ্যনাথ" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। তখন সেই "বৈদ্যনাথ-ধাম" অরণ্যপূর্ণ ছিল, তখন ঐ প্রদেশকে—"অরণ্যখণ্ড" বলিত! 'অরণ্য' শব্দেরই নামান্তর "ঝাড়"। তাই এদেশের লোক—বাঙ্গলার বৈদ্য-নাথকে "ঝাড়-খণ্ডী-বৈদ্যনাথ" বলেন, আর ইনি "উত্তরাখণ্ডী বৈদ্য-নাথ" বলিয়া পুরাকাল হইতে প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন।

শিবরাত্রির সময় এখানে বিরাট মেলা হয়। নানা প্রদেশের সাধু-সজ্জন ভক্ত-গৃহস্থ দলে দলে আসিয়া বাবা বৈদ্যনাথের পূজা অর্চ্চনা করিয়া যায়। মন্দির-সংলগ্ন শ্রীশ্রীকালিকাদি বহু প্রাচীন শক্তিমূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিতা আছেন। অনেক স্থলে তাহা সংস্কারাভাবে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এই স্থানের পাণ্ডারা বেশ সজ্জন লোক, নিত্য বেশ ভক্তি-শ্রদ্ধা-সহকারেই সেই দেবতাদের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা

বিদ্যানন্দজীদেরও কয় দিবস ধরিয়া যথেষ্ট যত্ন আয়ত্ত করিতেছেন। মন্দির-সংলগ্ন ধর্ম্মশালাতেই তাঁহারা অবস্থান করিতেছেন। গঙ্গাধর ও মনোহরদাস নিজেদের সাধনভজনেও বেশ আনন্দ লাভ করিতেছে। কিন্তু অধিক দিন তাঁহারা আর এখানে অবস্থান করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের ইচ্ছা যে, এই অবসরেই এদিককার তীর্থগুলি সমস্তই তাঁহারা দর্শন করিয়া যান, এখনও তাঁহাদের অনেক দেখিবার আছে, আর সে সমুদায় তীর্থ অতি দুর্গম পার্ব্বত্য-পথ দিয়াই যাইতে হইবে। এদিকে বর্ষা ক্রমে সমাগত-প্রায়। গুরু-পূর্ণিমার পূর্ব্বেই তাঁহাদের আবার আশ্রমে ফিরিয়া যাইতে হইবে। সুতরাং তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া পাণ্ডাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর তাঁহারা হিন্দুরাজ্য মুণ্ডি বা মণ্ডির দিকে অগ্রসর হইলেন। এখান হইতে "ঢেলু" প্রায় ছয় ক্রোশ, 'ঢেলু' মণ্ডিরাজ্যেরই অন্তর্গত, এখানে প্রসিদ্ধ বালকরূপী "মহাদেবমূর্ত্তি" প্রতিষ্ঠিত আছেন। মূর্ত্তিটী দেখিতে অতি সুন্দর। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যও অতি মনোরম। তাঁহারা তথায় এক দিনমাত্র অবস্থান করিয়া, ছয় ক্রোশ দূরস্থিত "উর্লা" পড়াও, পরে আরও ছয় ক্রোশ দূরস্থিত "ড্রাং" পড়াও ক্রমে অতিক্রম করিলেন। ড্রাং হইতে মণ্ডীর রাজধানী চারি ক্রোশ মাত্র। এই পথে যাইতে তাঁহাদের অধিক কষ্ট হইল না, কারণ ইহা পাহাড়ের উৎরাই পথ। এই পথের ধারে স্থানে স্থানে লবণের খনি আছে মণ্ডির লবণ দেখিতে এক অদ্ভুত জিনিস। তাহা অসচ্ছ গাঢ় বেগুনি রংএর পাথরের ঢেলার মত, দেখিলে সহসা লবণ বলিয়া মনেই হয় না। বৈদ্যনাথের পথে সকল বাজারেই এই লবণ যথেষ্ট বিক্রয় হয়। গঙ্গাধর প্রথম প্রথম

উহা পাথর বলিয়াই মনে করিয়াছিল, পরে ভিক্ষা-প্রস্তুতের সময়, তাহা লবণ বলিয়া বুঝিতে পারে।

মণ্ডিরাজ্য যত দূর দেখা যায়, কেবল তৃণ-শষ্পাদিতে পূর্ণ পার্ব্বত্যভূমি, তাহা যেন তরঙ্গায়িত হইয়া একের পার্শ্বে অন্যটী যাইয়া ঢলিয়া পড়িতেছে। ঘন অরণ্যানী এ অঞ্চলে নাই বলিলেই হয়। এ স্থানের পথ-ঘাট মন্দ নহে, লোক-জন গাড়ি-ঘোড়াতে সদাই প্রায় পূর্ণ। মণ্ডীর রাজধানী বিয়াশ বা বিপাশা নদীর ধারেই অবস্থিত। নদীর উপরিস্থিত সেতু পার হইয়া সহরে প্রবেশ করিতে হয়। ইং ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মণ্ডি-রাজ্যের অধিপতি ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে "এম্‌প্রেস্‌-ব্রীজ" বলিয়া ইহা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মণ্ডি হিন্দু-ক্ষত্রিয়-রাজ্য। রাজা সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহাদের বংশপরম্পরায়-বিনির্ম্মিত বহু শিবালয় আদিতে রাজধানী পরিশোভিত। মন্দিরগুলি দৃঢ় প্রস্তরদ্বারা সুনির্ম্মিত, তাহা আকারে খুব বড় না হইলেও, দেখিতে বেশ সুন্দর। তাহার অঙ্গ প্রস্তর-খোদিত মনোহর কারুকার্য্যযুক্ত ও গম্বুজাকার চূড়া-সমন্বিত। মন্দিরের সম্মুখে সর্ব্বত্রই প্রায় প্রমাণ বৃষমূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

বিপাশানদীর তীরে সেতুর সন্নিকটে, পর্ব্বতগাত্রে খোদিত, সিন্দুর-রঞ্জিত এক প্রকাণ্ড হনুমান-মূর্ত্তিও দেখা গেল। মন্দিরাদি-সমাকীর্ণ ঘাটের সোপানশ্রেণীও যেন চিত্রিতবৎ সুন্দর, সুতরাং এই স্থানের বিপাশা নদীর দৃশ্য যথার্থই অতি মনোরম। এই সুদূর পার্ব্বত্য-প্রদেশে ইহা প্রকৃতই অভিনব বস্তু বলিতে হইবে।

সহরের মধ্যে একটী ভাল বাজার আছে। "দমদম-প্রাসাদের"

শেষ-সংলগ্ন "চৌহাট্টা" যাহা কাছারিরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাও সুন্দর। প্রাসাদের পুরাতন-অংশে তোষাখানা, অস্ত্রাগার ও মণ্ডীর প্রাচীন অধিশ্বর মহাদেবরাওয়ের মন্দির আছে। উহার বহিরাংশে নানা রূপ চিত্র-বিচিত্র-যোগে শোভিত এবং উহার মধ্যে রজত-সিংহাসনে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। সম্মুখে এক সরোবর, তাহার এক কোণে একটী সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। পুষ্করিণার মধ্যস্থলে জলের উপর একটী স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে—মণ্ডিরাজ সিদ্ধসেন, তাঁহার শ্বশুর পৃথ্বীপালকে নিজ রাজ্যে আহ্বান করিয়া, কোনও অজ্ঞাত কারণে তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিলেন ও তাঁহার মুণ্ড এই সরোবরে প্রোথিত করিয়া তদুপরি উক্ত স্তম্ভ স্থাপনা করিয়া দিয়াছেন।

এই পুষ্করিণীর নিকট "সুকেৎ" যাইবার পথের ধারে, বহু সংখ্যক মণ্ডী-রাজরাণীর (যাঁহারা পূর্ব্বকালে সতী হইয়াছিলেন তাঁহাদের) স্মৃতি-চিহ্ন রূপ মন্দিরে স্থাপিত আছে।

বিদ্যানন্দজীরা এখানে রাজারই অতিথিশালায় আসিয়া অবস্থান করিলেন। রাজা স্বয়ং ইঁহাদের যথেষ্ট অভ্যর্থনা করেন ও কয়েক দিবস নানা সৎসঙ্গে ইঁহাদের সেবা-সৎকার করিতে থাকেন। পরে ইঁহাদের ইচ্ছাক্রমে রাজা ইহাদের "রোয়ালসর" দর্শনে যাইবার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

সেই প্রসিদ্ধ "রোয়ালসর তীর্থ" বা হ্রদটী এই মণ্ডি-রাজ্যেরই অন্তর্গত। এস্থান হইতে রোয়ালসর যাইতে দুইটী পথ আছে, একটী পাকদণ্ডী বা পাহাড়ে-রাস্তা; সেটীতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ হাঁটীতে হয়, অন্যটী "গালমা" হইয়া প্রায় দশ ক্রোশ পথ চলিতে হয়। কিন্তু এই শেষোক্ত পথে সর্ব্ববিষয়েরই সুবিধা

আছে। একেতো সর্ব্বদা লোক জনের চলা-ফরা আসা-যাওয়া আছে, তাহার পর—পথে চটী, ডাকবাংলো আদিও আছে। পথটী প্রায় "সুকেতী" নামক এক অল্প-গভীর নদীর ধারে ধারেই গিয়াছে। পথের ধারে ধারে শ্রেণীবদ্ধ গাছের ছায়ার নীচে দিয়া যাইতে যাত্রীদের বিশেষ কষ্টও হয় না।

পাল্‌মা-চটী মণ্ডি হইতে পাঁচ ক্রোশ, কিন্তু পাকদণ্ডী-পথে আড়াই ক্রোশমাত্র যাইতে হয়। তবে সেই পার্ব্বত্য-পথ অবশ্যই কিছু কষ্টপ্রদ। দূর হইতে রোবালসর-গ্রামটী ঘন বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানে বহু সংখ্যক পাণ্ডা-ব্রাহ্মণদিগের আবাস আছে।

রোবালসর বাস্তবিকই একটী অপূর্ব্ব দেখিবার বস্তু। প্রায় সিকি ক্রোশ ব্যাপিয়া এই পবিত্র প্রাকৃতিক সরোবর, পর্ব্বত-প্রাচীরে ইহার প্রায় চারিদিক পরিবেষ্টিত এবং সেই পর্ব্বতগাত্র নানা বৃক্ষ ও সুদীর্ঘ শরের জঙ্গলে পূর্ণ। তাহার মাঝে মাঝে যেন হ্রদে নামিবার পথস্বরূপ এক একটী মুক্ত স্থান, তাহাতে পর্ব্বতগাত্র অধিকতর মনোরম বলিয়া বোধ হয়। হ্রদে নানা শ্রেণীর অসংখ্য হংস ও জলচর বিহঙ্গমসমূহ দলে দলে মনের আনন্দে নির্ভয়ে সন্তরণ করিতেছে। তাহারা যেন তাহাতে সেই স্থানের পবিত্রতা, চিরশান্তি ও অহিংসাপূর্ণ প্রাকৃতিক প্রতিকৃতির স্বরূপতা-বিষয়ে সকলকে পরিচয় দিতেছে।

মন্দিরের অভিনব ঘণ্টাধ্বনিও এক বিচিত্রতা-পূর্ণ। এই হ্রদের ভাসমান-ভূমিখণ্ডরূপ দেব-মন্দিরগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা অসাধারণ দৃশ্য। বাস্তবিক এইরূপ ভাসমান পার্ব্বত্যভূমি ভূমণ্ডলের আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সরোবর-মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ

সাতটী ভাসমান-ভূমি আছে। প্রত্যেকটী শিব-পার্ব্বতী ও লোমশ আদি এক একটী দেবতা বা ঋষির নামে প্রসিদ্ধ ।

এখানের পাণ্ডারা বলে—"হ্রদের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা বা শ্রীভগবানের ইচ্ছাক্রমেই অথবা ভক্তগণের একান্ত অভিলাষ-অনুসারেই এই ভাসমান দেব-ভূমিগুলি কখন কখন সঞ্চালিত হইয়া থাকে। নতুবা প্রবল ঝড় বা বায়ু-সঞ্চালনে কিম্বা বিশ পঞ্চাশ জন বলিষ্ঠ ব্যক্তির সমবায়-যত্নেও কোন সময় ইহাদিগকে নাড়িতে পারা যায় না। অথচ নির্ব্বাত সময়েও ধীরে ধীরে কোন কোনটী স্থানান্তরিত হইয়াছে দেখা যায় ।"

শুনা যায়—ভূতপূর্ব্ব মণ্ডি-রাজ্যেশ্বরের জীবন-লীলার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিবের প্রধান ভাসমান-ভূমিটী উল্টাইয়া গিয়াছে। যাইবারই কথা—ভগবান অনেক সময় যে, আত্মভক্তেরও অধীন ভাবে এই ভবে লীলা-প্রকাশ করিয়া থাকেন! পূরাকালে এই স্থানেই শ্রীমন্মহর্ষি লোমশের আশ্রম ছিল, অতি কঠোর তপস্যার পর, তাঁহার নিত্য গঙ্গা ও যমুনা-স্নানের একান্ত অভিলাষ জন্মে। তখন ভাগীরথী-গঙ্গা ও যমুনাদেবী তাঁহার তপস্যায় তৃপ্তা হইয়া, মূর্ত্তিমতী হইয়াই তাঁহাকে এই স্থানে দর্শন দেন ও অগাধ জলপূর্ণ এই হ্রদ-রূপে উভয়ে চিরকাল এই স্থানে অধিষ্ঠান করিবেন, এইরূপ বর প্রদান করিলেন। তদবধি ইহা অতি পবিত্র তীর্থে পরিণত হইয়াছে ।

তিনি যে স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন, তন্নিকটেই তাঁহার মন্দির অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত তথায় বিশ্বপিতা শিব ও জগন্মাতা পার্ব্বতী-দেবী আদি অন্যান্য দেব-দেবীরও মন্দির আছে। তন্মধ্যে একটী ভগবান শ্রীবুদ্ধদেবেরও মন্দির বিদ্যমান আছে। তাহা

অবশ্য সেরূপ প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। সে মন্দিরটী "লোড়াকের" বৌদ্ধ লামাদিগেরই অধিকৃত। তদুপলক্ষে তিব্বতীয় ও স্থানীয় বহু ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীও—"ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" এই মন্ত্রে সতত আপনার আপনার সাধন-ভজন করিয়া থাকেন। এই হ্রদের এক পার্শ্বে এক প্রাচীর-গাত্রে ও শত শত প্রস্তরের উপর বৌদ্ধ-ভক্ত-দর্শকগণকর্ত্তৃক নানা বৌদ্ধ-কথা অতি সুন্দররূপে খোদিত আছে।

এস্থানে হিন্দু ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী উভয় শ্রেণীরই বহু সাধু-সজ্জন অনেক সময় অবস্থান করেন। পূজ্যপাদ ষট্‌শ্রীমদ্ ঠাকুর সদানন্দ দেবের এই স্থানটী অতীব প্রিয় ছিল। তাঁহার জীবন-কথার মধ্যেও এই রোবলসরোবরের উল্লেখ আছে। আমাদের ব্রহ্মচারীরা এই স্থানে আসিয়া যার পর নাই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। স্থানীয় ব্রাহ্মণ ও সাধু-সজ্জনগণের সহিত নানা ধর্ম্মালোচনায় পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা পুনরায় মণ্ডিতে ফিরিয়া যাইলেন ও তথা হইতে রাজ-সহায়তায় "মণিকরণ" দর্শনে যাত্রা করিলেন।

মণ্ডি হইতে সাত ক্রোশ দূরে "কতওয়ালা" নামক চটী, তথা হইতে প্রায় সাড়ে চারি ক্রোশ দূরে "কান্তি" চটী, সে স্থান হইতে "বাজাউরা" চটীও প্রায় সাড়ে চারি ক্রোশ। এদিকে স্থানে স্থানে জঙ্গলের দৃশ্য বেশ সুন্দর। এত দূর পর্য্যন্ত আসিয়া কাঙড়ার উপত্যকাভূমি প্রায় শেষ হইল। এই স্থান হইতে "পার্ব্বতী-উপত্যকা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। কুলু-প্রদেশের মধ্যে এই অঞ্চলের দৃশ্য অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। পার্ব্বতী নাম্নী একটী প্রকাণ্ড উপনদী প্রসিদ্ধা বিপাশার অঙ্গে এই স্থানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই নদীর

তটসন্নিহিত উপত্যকা-ভূমিসমূহ সেই কারণ "পার্ব্বতী-উপত্যকা" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই স্থান হইতে দূরে তুষার-শির্ষ পর্ব্বত-চূড়াগুলি স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়, তাহা যেন চিত্রপটে অঙ্কিতবৎ অতি সুন্দর দৃশ্য।

"বাজাউরা" চটী হইতে "চাঁ" নামক চটী প্রায় পাঁচ ক্রোশ। এখানকারও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি মনোরম। এক প্রাচীন দুর্গের জীর্ণাবশেষ এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত একটী অতি সুন্দর পুরাতন মন্দির আছে। এখানকার লোক-জন যেমন সরল তেমনই অমায়িক।

'চাঁ' হইতে 'ঝাড়ি'-চটী প্রায় সাড়ে তিন ক্রোশ, তথা হইতে 'মণিকরণ' পর্য্যন্ত পথ বেশ সুন্দর। তুষারাকীর্ণ পর্ব্বতমালা এখান হইতে আরও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ঝাড়ির নিকট "মালানা" নামে একখানি গ্রাম আছে, তথাকার অধিবাসীরা এক অপূর্ব্ব-ধরণের। তাহাদের ভাষা, আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্ম সমস্তই যেন স্বতন্ত্র প্রকারের। হিন্দু, বৌদ্ধ ও মোসলমান-ধর্ম্মের সমন্বয়ে সে যেন এক "জগাখিচুড়ি" গোছের। এখানের পর্ব্বতের এক অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা আছেন, তাঁহার নাম 'জম্‌লু', সকলেই তাঁহার পূজা করে।

'ঝাড়ি' হইতে 'মণিকরণ' প্রায় চারি ক্রোশ পথ। কয়েকটী পার্ব্বত্য-ঝরণা অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। মণিকরণের নিকটস্থিত প্রায় ক্রোশখানেক পার্ব্বত্য-পথ অতি জঘন্য।

কিয়দ্দূর হইতেই মণিকরণের বিচিত্র উষ্ণ-প্রস্রবণের বাষ্পরাশি দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রাম ও বনের পশ্চাৎ হইতে সেই বাষ্পরাশি দেখিয়া, সহসা কোন বড় কল-কারখানাপূর্ণ জনপদের অস্তিত্ব বলিয়াই

মনে হয়। যাহা হউক আমাদের গঙ্গাধর প্রভৃতি এই সমুদায় দেখিতে দেখিতে আজ মণিকরণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন—প্রায় চারি পাঁচ হাত ব্যাসবিশিষ্ট একটী অতি উষ্ণতর জলের প্রস্রবণের পার্শ্বে কত সাধু-সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। কেহ আটা মাখিয়া রুটী প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন, কেহবা কাপড়ে চাউল-আদি বাঁধিয়া সেই জলের মধ্যে ডুবাইয়া দিতেছেন, যথাসময়ে তাহা আবার উঠাইয়া লইতেছেন। দেখা গেল তাহাও বেশ সিদ্ধ হইয়া যাইতেছে। কেহ বা সেই জলের পার্শ্বে পাথরের উপরে বা থালার উপরে রাখিয়াও রুটী প্রস্তুত করিতেছেন তাহাও বেশ সুন্দর হইতেছে। গঙ্গাধরও আজ মনোহরের সহিত নিজেদের আহার্য্য এই উষ্ণ-প্রস্রবণেই কত আনন্দভরে পাক করিয়া লইল।

প্রকৃতির এই অসাধারণ-লীলা উষ্ণ-প্রস্রবণের জলধারা অবিরত-ভাবে প্রবাহিত হইয়া পার্শ্বস্থিত এক নালাপথে নদীর ন্যায় বহিয়া যাইতেছে। এই স্থান যেন অন্নপূর্ণার সাক্ষাৎ বিচিত্র রন্ধনশালা। কাষ্ঠের প্রয়োজন নাই, অগ্নি প্রজ্বলনের জ্বালা-যন্ত্রণা নাই, যখন ইচ্ছা যে কেহ খাদ্যাদি পাক করিয়া লইতেছে।

প্রস্রবণের জল বেশ সুস্বাদু ও পাচক, তবে তাহাতে অতি সামান্য একটু গন্ধকের গন্ধ আছে। ইহার উপরে আর একটী বৃহৎ উষ্ণ-প্রস্রবণ আছে, তাহাতেও সকল দ্রব্য এই ভাবে পাক করিতে পারা যায়, তবে তাহাতে কিছু সময় অধিক লাগে। সুতরাং তাহার উষ্ণতা ইহা অপেক্ষা কিছু অল্প বলিয়াই বুঝিতে পারা যাইতেছে। মণি-করণের পার্শ্বে যেমন তাহার ঘন ও উষ্ণ বাষ্পরাশির জন্য অধিকক্ষণ থাকা যায় না, তেমনই ইহার নিকটস্থিত প্রস্তরাদির উপর সদাই বাষ্প পতিত হইয়া জলসিক্ত হইয়া আছে, সে কারণ স্থানীয় পথসহ

অতি পিচ্ছিল, তাহার উপর দিয়া চলা-ফেরা করাও অনেক সময় বিপজ্জনক। এই প্রস্রবণের কিছু নিম্নে দেড় হাত বা দুই হাত ব্যাস-বিশিষ্ট আরও একটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। তাহা পার্ব্বতীর বরফ-গলা জলের দুই হাত উপর হইতেই অবিরতভাবে বাহির হইতেছে। প্রকৃতির লীলা-রহস্য বুঝা ভার! শীতোষ্ণের এইরূপ সাহচর্য্য বাস্তবিকই যেমন বিচিত্র, তেমনই বিরল!

এই প্রস্রবণগুলির নিকট গ্রামের একটী সাধারণ মন্দির আছে, উহার নিকটে একটী উষ্ণ-জলের কুণ্ড আছে, সকলে তাহাতেই স্নান করে। শুনা যায়, সেই জলের গুণে ও শ্রীভগবানের কৃপায় বাত ও কুষ্ঠাদি বিবিধ রোগ অনায়াসে আরোগ্য হইয়া যায়।

মণিকরণের নিকটস্থিত শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরটী প্রধান হইলেও, এস্থানে আরও সাত আটটী মন্দির আছে। ভারতের নানাস্থান হইতে হিন্দু সন্ন্যাসীর ন্যায় তিব্বতীয় বহু বৌদ্ধ-লামাও এই তীর্থে স্নান ও দর্শনাদি করিতে আসেন। এই স্থানে বুদ্ধদেবেরও একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে।

মণিকরণের উপর হইতে "ধর্ম্মগঙ্গা" নামে একটী প্রকাণ্ড ঝরণা পার্ব্বতী নদীতে আসিয়া মিলিয়াছে। এখানের লোক-জনেরা এই তীর্থের অধিবাসী বলিয়া, নিজেদের যথেষ্ট পুণ্যবান বলিয়া মনে করে। তাহারা বলে—এক সময় পার্ব্বতীদেবী মহাদেবের সহিত এই নদীতে স্নানকালে, তাঁহার কর্ণের মণিময় কুণ্ডল নদীতটে পতিত হয়। কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও তাহা আর পাওয়া যায় না। অনন্তদেব তাহা পাতালে লইয়া যান—দেবতারা তাঁহাকে তাহা ফিরাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি ক্রোধভরে গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার উষ্ণ-শ্বাসসহ তাঁহার নাসিকামধ্যে রক্ষিত সেই মণিকুণ্ডল

সবেগে বাহির হইয়া পড়ে। তাহা প্রাপ্তে দেবাদিদেব শিব তখনই পার্ব্বতীকে প্রদান করিলেন। কিন্তু সেই অবধিই এখানে এই অনল-প্রভাসম উষ্ণপ্রস্রবণ অবিরতভাবে প্রবাহিত হইতেছে।

মণিকরণ অতি প্রাচীন তীর্থ, শুনা যায়—বিষ্ণু-অবতার ভগবান শ্রীপরশুরাম এই অঞ্চলেই পূর্ব্বে অবস্থান করিতেন। তাঁহার এক ভ্রাতা বিহঙ্গমুনি এই মণিকরণতীর্থে প্রথম আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। মহর্ষি ভগবান জমদগ্নি, তাঁহার স্ত্রী রেণুকাদেবী ও পুত্র পরশুরাম আদিকে লইয়া এই প্রদেশে অবস্থান করিতেন। এখনও এই দেশবাসী সকলেই ভগবান পরশুরামকে 'কুলু-অঞ্চলের প্রধান উপাস্য-দেবতা বলিয়া মান্য করে ও সকলেই তাঁহার পূজা করে। এই অঞ্চলেই 'নাহান-রাজ্যের' সমীপবর্ত্তী প্রদেশে মহর্ষি জমদগ্নির প্রসিদ্ধ আশ্রম এখনও বিদ্যমান আছে। তথা হইতে প্রায় এক ক্রোশ নিম্নে 'রেণুকাহ্রদ' আছে যথায় পরশুরাম পিতৃ-আজ্ঞা পালনার্থ মাতা রেণুকার শিরোচ্ছেদ করিয়াছিলেন। কার্ত্তিক মাসের শুক্ল-নবমীতে তথায় এক মেলা হয়। তখন বহু যাত্রী রেণুকাতীর্থে সমাগত হইয়া পিতৃলোকের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপন করে।

গঙ্গাধর প্রভৃতি এই সমস্ত পৌরাণিক তথ্যপূর্ণ তীর্থাদি দেখিতে দেখিতে মনের আনন্দে কুলু-উপত্যকা দর্শনপূর্ব্বক পরে আশ্রমের দিকে প্রত্যাগত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

গয়ার কিশোরীমোহন-পাণ্ডা বা গয়ালী-মহারাজ খুব বড় লোক, কোনও বিষয়ের অভাব নাই, গোমস্তা ও লোক-জন-কর্ম্মচারীরা নানা কার্য্যে চারিদিকে বিব্রত, পাণ্ডাজীকে কোন কিছুই করিতে হয় না, তিনি পায়ের উপর পা দিয়া কেবল সকলকে হুকুম করেন, আর নানা ভোগ-বিলাসে দিনাতিপাত করেন। তবে লোকটী ভাল, সদালাপ-প্রিয় ও দয়ালু।

এক দিন তিনি তাঁহার কাছারি-বাড়ীতে একাই বসিয়া আছেন, তখন বেলা অনেক হইয়াছে, একটী সাধু আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, পাণ্ডাজী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন দিলেন। কোথা হইতে আসিতেছেন, কোথায় যাইবেন, ইত্যাদি নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

সাধুটী আমাদের অপরিচিত নহেন—সেই গঙ্গাধর-ব্রহ্মচারী। বহু দিন পরে এবার একাই দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার দাদাজী-মহারাজ অর্থাৎ বিগ্যানন্দজী অন্যান্য সাধুদের সহিত আশ্রমেই আছেন। গঙ্গাধর সম্প্রতি তাঁহার অনুমতি লইয়া প্রথমে কাশীধামে আসিয়াছিলেন, তথায় কিছুদিন অবস্থানের পর আজই ভোরে গয়ায় আসিয়াছেন। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য—এই অবসরে পিতা-মাতাদির শ্রাদ্ধ-পিণ্ডাদি এইস্থানেই সমাপন করিবেন। এখানে সাধারণের মুখে পাণ্ডাজী কিশোরীমোহনের খ্যাতি শুনিয়া, এইমাত্র তিনি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। পাণ্ডাজীর সহিত নানাবিষয়ের আলাপনে গঙ্গাধরও বেশ পরিতৃপ্ত হইলেন। তিনি কয়েক দিবসের

জন্য এখানে থাকিতে ইচ্ছা করেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলে, পাণ্ডাজী তখনই বাহিরের দিকে তাঁহাকে একটী ঘর নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, লোক-জন ডাকিয়া তাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাইয়া তাঁহার আসন বিস্তার করিতে বলিলেন ও ব্রহ্মচারীজীর সত্বর ভিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

গঙ্গাধরের স্বাভাবিক ব্রহ্মচর্য্যপুষ্ট তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায় দিব্য কান্তি ও তাহার সাধনোচিত বিমল গাম্ভীর্য্য দেখিয়া, বিশেষতঃ তাঁহার সহিত সদালাপ করিয়া পাণ্ডাজী যথার্থই যেন বিমোহিত হইলেন। তিনি গঙ্গাধরকে এখানে কিছুদিন রাখিবার জন্য মনে মনে তখনই যেন সঙ্কল্প করিয়া লইলেন। অনন্তর নিজের আহা-রাদির জন্য অন্দরে চলিয়া যাইলেন ও তখনই তাঁহার স্ত্রীকে নবীন ব্রহ্মচারী-সাধু গঙ্গাধরের বিষয় সমস্ত বলিলেন। স্ত্রীও পতির একান্ত অনুরূপা, বেশ বুদ্ধিমতী ও সর্ব্ববিষয়েই যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিনী। তিনি শুনিবামাত্র সাধুদর্শন-মানসে তখনই নানা খাদ্যদ্রব্য স্বহস্তে লইয়া বাহিরে আসিলেন। গঙ্গাধর তাঁহার যত্নে অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন। পাণ্ডাজীর বয়ঃক্রম প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হইবে। তাঁহারা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও, অপুত্রক বিধায় নিতান্ত মর্ম্মপীড়িতভাবে দিন-যাপন করেন। আজ এই বালযোগী গঙ্গাধরকে দেখিয়া, তাঁহার প্রতি তাঁহাদের সহসা অপূর্ব্ব পুত্রস্নেহ জাগিয়া উঠিল। তাঁহারা পতি-পত্নীতে পরামর্শ করিলেন,—আহা, ছেলেটী যদি আমাদের নিকট থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের পুত্রের অভাবজনিত দুঃখ থাকে না। তাঁহারা উভয়েই এই সিদ্ধান্তে গঙ্গাধরকে সেইদিন হইতে খুবই যত্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহাতে গঙ্গাধরের

কোনরূপ কষ্ট না হয়, সে বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে গঙ্গাধর যথাবিধি তাঁহার পিতা-মাতাদির শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া অন্যত্র যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, পাণ্ডা-দম্পতি একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা বলিলেন—"কেন বাবাজী, তোমার কি কোন কষ্ট হইতেছে? তোমার নিত্য ভিক্ষা, সাধন-ভজন, কি কোনও কিছুর তিলমাত্র অভাব হ'লে, আমাদের বল'। আমরা সাধ্যমত তোমার উত্তম বন্দোবস্ত করে দিব। আমাদের পয়সার অভাব নেই, তোমার সঙ্গলাভে আমরা বড়ই আনন্দে আছি।"

গঙ্গাধর সংযমী-ব্রহ্মচারী, ত্যাগী সদ্‌গুরুর প্রিয় শিষ্য, তাঁহার আর অভাব বোধ কি? তিনি স্পষ্টই বলিলেন—"আমার কোন অভাব নেই, আপনাদের যত্নে আমিও খুব আনন্দে আছি।" বলিতে কি, তাঁহাদের অত্যধিক স্নেহ-যত্নে গঙ্গাধরও যেন কিঞ্চিৎ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের এই অনুরোধ তিনি তখন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। তিনি তথায় অবস্থান করিতে যেন বাধ্য হইলেন।

পাণ্ডাজী তাঁহার প্রয়োজনমত নানা গ্রন্থাদি আনাইয়া দিলেন, এক জন বহু শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতকেও তাঁহার নিকট নিযুক্ত করিয়া দিলেন, যাহাতে তিনি নিত্য নানা শাস্ত্রালোচনায় আনন্দে থাকিতে পারেন। গঙ্গাধর এই সমস্ত সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া, নির্ব্বিঘ্নে সাধনাদিসহ তথায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডা-দম্পতিও তাঁহাদের অবসর সময়ে আসিয়া তাঁহার সহিত নানা-বিষয়ক আলাপনে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন।

এইভাবে কিছু দিন অতিবাহিত হইল, এক দিবস পাণ্ডার এক রাজা-যাত্রী আসেন। তিনি পাণ্ডাজীর সহিত ব্রহ্মচারী গঙ্গাধরকেও দর্শন করেন ও তাঁহার সহিত আলাপে রাজা বিশেষরূপ আকৃষ্ট হন। পর দিবস রাজাসাহেব বুদ্ধগয়া দর্শন করিতে যাইবেন, সেকারণ হাতি, ঘোড়া, গাড়ি আদি রাজোচিত সমুদায় আয়োজন হইল। গঙ্গাধরকেও তাঁহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য সানুনয় অনুরোধ করা হইল। তাঁহার যাইবার তেমন ইচ্ছা না থাকিলেও, তাঁহাদের আগ্রহ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

গঙ্গাধর যাইবার জন্য যেমন গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবেন, অমনই স্থানীয় একটা কুকুর তাঁহার সম্মুখে আসিয়া যেন তাঁহাকে যাইবার পথে বাধা দিতে লাগিল। তিনি যে ঘরে থাকেন, তাহারই সম্মুখের রকে সেই কুকুরটা প্রায়ই পড়িয়া থাকিত, তিনি নিত্য আহারান্তে পাতে যাহা বাঁচিত, তাহা তাহাকেই খাইতে দিতেন। সে কারণ কুকুরটা তাঁহার যেন অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল, সদাই তাঁহার ঘরের সাম্‌নে যেন তাঁহারই সেবায় সে নিযুক্ত থাকিত—একটীও কাক, পক্ষী, কি বিড়ালটী পর্যন্ত কিছুই তাহার ত্রি-সীমানার মধ্যে আসিতে পারিত না। সুতরাং সে গঙ্গাধরেরও যেন কতকটা প্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আজ তাহার এইরূপ বাধা দেওয়ায়, তিনি একটু বিরক্ত হইয়া হাতের ছড়ি দিয়া এক-ঘা মারিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন ও যাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কুকুরটা মার খাইয়া 'কেঁউ কেঁউ' করিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে কিছু দূরে পলাইয়া গেল, কিন্তু পুনরায় তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আবার ছুটিয়া আসিল ও তাঁহার কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। তিনি

আবার তাহাকে মারিলেন, সে পলাইয়া গেল, পুনরায় আসিয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে বাধা দিতে লাগিল। এইরূপ ভাবে দুই তিন বার তাহার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার কি জানি আর যাইতে ইচ্ছা হইল না। তিনি তাঁহাদের বিদায় দিয়া নিজের ঘরে ঢুকিলেন। তাহাতে অবশ্য রাজা ও পাণ্ডাজী একটু বিশেষ দুঃখিত হইলেন।

দিন যায়, না ক্ষণ যায়, কখন কি হয়, বলা যায় না। তাঁহারাত চলিয়া গেলেন, এদিকে দেখিতে দেখিতে সেই নির্ম্মল আকাশ সহসা ঘন মেঘাবৃত হইয়া আসিল, শন্ শন্ শব্দে ভীষণ ঝড়, তাহার সঙ্গে কর্ণভেদী মেঘগর্জ্জন ও ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিকাশ হইতে লাগিল। তীব্র বজ্র-নির্ঘোষ ও সেই সঙ্গে মুষলধারে যেমন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, তেমনই তুফান,—যেন প্রলয়ের তাণ্ডব লীলা! রাজাসাহেবের সেই অশ্ব-গজ, সিপাইবরকন্দাজ আদি-সমন্বিত শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ হইয়া কে কোথায় যে পালাইল, তাহার নির্ণয় নাই! রাজা পাণ্ডাজীর সহিতই একটী হাতীর উপর ছিলেন, তাঁহাদের হাওদা পথের ধারে বৃক্ষের শাখায় লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি পড়িয়া ক্ষত-বিক্ষত হইলেন, পাণ্ডাজীও কথঞ্চিৎ আহত হইলেন। তাঁহারা মধ্যপথ হইতে কোনরূপে ফিরিয়া ঘরে আসিলেন। আজ আর তাঁহাদের 'বুদ্ধগয়া' দর্শনে যাওয়া হইল না। রাজা আসিয়া চিকিৎসাধীন হইয়া পড়িলেন। পাণ্ডাজী আসিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, গঙ্গাধরের নিকটে আসিয়া সকল কথা বলিলেন ও তাঁহার যে যাওয়া হয় নাই, তাহা ভালই হইয়াছে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

গঙ্গাধর এই সব ঘটনা শুনিয়া বাস্তবিক যেন বিস্মিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন—"কুকুরটা এই দুর্ঘটনার বিষয় পূর্ব্বাহ্নেই বোধ

হয় কিছু জানিতে পারিয়াছিল, নতুবা আমায় তখন অমনভাবে বাধা দিবে কেন? সে কয়েকবার তাড়না খাইয়াও নিরস্ত হয় নাই, কি আশ্চর্য্যের বিষয়! পশুদের ভবিষ্যৎ ঘটনার বিষয় জানিবার এমন শক্তি আছে, তাহা ত জানিতাম না!" তিনি মনে মনে কুকুরটার প্রতি একটু প্রসন্ন হইলেন ও তদবধি তাহাকে একটু অধিক যত্ন করিতে লাগিলেন।

এক দিবস আহারান্তে গঙ্গাধর শুইয়া বিশ্রাম করিতেছেন, তাঁহার সামান্য তন্দ্রা আসিয়াছে, তিনি যেন কি স্বপ্ন দেখিতেছেন, সহসা তাঁহার মাথার দিকে কপালের উপর এক বিন্দু জল পড়িল। তিনি তাহাতে চমকাইয়া কপালে হাত দিয়া দেখিলেন—তাই ত, একবিন্দু জলই ত বটে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি চাহিয়া দেখিলেন—সেই কুকুরটা তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া আছে। তিনি অতি বিরক্ত হইয়াই, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন ও কুকুরটাকে খুব এক ঘা প্রহার করিলেন। ভাবিলেন, ইহাকেই বলে—"কুকুরকে নাই দিলে, মাথায় উঠে।" সে 'কেঁউ কেঁউ' করিয়া চিৎকার করিতে করিতে দূরে পলাইয়া গেল। তিনি কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া মুখ হাত ধুইয়া ফেলিলেন।

আর এক দিবস তিনি তেমনই ভাবে বিশ্রাম-সময়ে তন্দ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছেন যে, সেই কুকুরটা তাঁহার মাথার কাছে যেন বসিয়া কাঁদিতেছে, আর অতি কাতরভাবে বলিতেছে—"বাবা, তুমি আমাকে অমন করে আর মেরো না, আমি অতি হতভাগ্য। বাপ্, তুই আমার অবস্থা কেমন করে বুঝ্‌বি বল্! আমি তোর পিতা, নিতান্ত কর্ম্মদোষে এখানে কুকুর হয়ে জন্মেছি, আর কতই না দুঃখ ভোগ কর্‌ছি! কত দিন পরে তোকে দেখ্‌তে পেয়ে, তোর প্রতি

অন্তরের স্নেহবশে, সর্ব্বদা তোর কাছে বসে থাকি, আর আমার এই ঘোর কর্ম্মফল সদাই ভাবতে থাকি। বাবা, বিশ বৎসর পূর্ব্বে তোর তখন জন্ম হয় নি, আমি গয়ায় পিতামাতার পিণ্ডদান করতে এসেছিলাম, তখন এই কিশোরী-পাণ্ডার কাছে খৎ লিখে পঞ্চাশ টাকা ধার নিয়ে যাই। আমার দুর্ব্বুদ্ধিবশে তা'র সেই টাকাকয়টী আর শোধ-দেওয়া হয় নি। তাই কুকুর হয়ে জন্মে, এত কাল ধরে এর দ্বারে পড়ে আছি, আর নিদারুণ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করছি। বাবা, আমার সকল কথাই মনে আছে, কুকুর হয়েও আমি কোনও কথা ভুলি নি। তোমাকেও চিনতে পেরেছি, ইচ্ছা করে—তোমাকে আদর যত্ন করি, তোমাকে সকল কথা প্রাণ-খুলে বলি, কিন্তু সে শক্তি আমার নেই। বাবা গঙ্গাধর, তুমি আমাকে আর অমন করে মেরো না বাবা, তুমি পুণ্যবান মহাপুরুষ, তোমা-হতেই আমার এ পাপ-জীবনের উদ্ধার হবে, তাই বার বার তোমার মাথার কাছে বসে নিরবে কাঁদি।”

আবার সহসা গঙ্গাধরের কপালের উপর এক বিন্দু জল পতিত হইল, গঙ্গাধর জাগিয়া চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন—কুকুরটা তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতেছে, তাহার চক্ষু বহিয়া বাস্তবিক জলধারা পতিত হইতেছে। তিনি জাগিবামাত্র কুকুরটা আজ ভয়ে যেন জড়সড় হইয়া, এক লাফে তথা হইতে পলাইয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। গঙ্গাধর এমন অদ্ভুত স্বপ্ন জীবনে আর কখনও দেখে নাই, তিনি স্বপ্নের সহিত এই প্রত্যক্ষ ঘটনা দেখিয়া, যথার্থই চমৎকৃত হইলেন। তিনি কুকুরটাকে আর তাড়না করিলেন না, অধিকন্তু তাহাকে আজ হইতে খুব যত্ন করিতে লাগিলেন। নিত্য আহারের সময় তাঁহার ভিক্ষান্ন হইতে

প্রথমেই কিয়দংশ তাহাকে দিয়া, পরে নিজে ভিক্ষায় বসিতেন। আর তাহাকে তাঁহার উচ্ছিষ্ট-অন্ন দিতেন না।

এই ঘটনার পর এক দিন গঙ্গাধর পাণ্ডাজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যাঁহারা গয়ায় আসিয়া খৎ লিখিয়া টাকা ধার লইয়া যায়, আপনারা তাঁহাদের নিকট কেমন করিয়া সে টাকা আদায় করেন ?"

পাণ্ডা বলিলেন—"আমাদের গোমস্তা মাঝে মাঝে সেই সব যজমানের বাটীতে গিয়া তাগাদা করে, আর তাদের নিকট থেকে টাকা আদায় করে আনে।"

তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন—"আচ্ছা, যাঁরা টাকা না দেন, অথবা টাকা আদায় দিবার পূর্ব্বেই মারা যান, তাঁদের টাকা কি করে আদায় হয় ?"

উত্তরে পাণ্ডাজী বলিলেন—"অধিকাংশ সময়ে তাঁদের বংশধররা প্রায়ই টাকা দিয়ে দেন, যদি একান্তই না দেয়, তবে আর কি হবে ? মরে গেলে তারা কুকুর হয়ে আমাদের দরজায় পড়ে চৌকি দেয়, সেবা করে।"

গঙ্গাধর এই কথা শুনিবামাত্র যেন চমকাইয়া উঠিলেন। পাণ্ডাজী তাহা অবশ্য লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তখন আর কিছু না বলিয়া, উঠিয়া ঘরের বাহিরে এক বার চলিয়া গেলেন, দেখিলেন—কুকুরটা রকে শুইয়া আছে। তিনি মুখে-হাতে জল দিয়া পুনরায় পাণ্ডার নিকটে আসিলেন ও বলিলেন—"আপনারা সেই খৎ কত দিন পর্য্যন্ত রেখে দেন ?"

পাণ্ডা—"প্রায় বছর পাঁচেক রাখি।"

গঙ্গা—"তার পর কি করেন ?"

পা—"ফেলে দেই।"

গ—"যদি দশ-বিশ বৎসর পরে কেহ সেই টাকা শোধ দিতে ইচ্ছা করে?"

পা—"তা'হলে পুরাতন খাতা-পত্র দেখে, খুঁজে-পেতে বার করতে হয়।"

গ—"আচ্ছা আপনি এই নামের কোন খৎ আছে কি না একটু অনুসন্ধান করে দেখুন। তিনি বোধ হয় বিশ-বৎসর পূর্ব্বে এখানে এসেছিলেন।"

পা—"ওঃ অত দিনের কাগজ-পত্র পাওয়া দায়, অনেক খুঁজ্‌তে হবে।"

গ—"আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনি একটু পরিশ্রম করে, এর অনুসন্ধান করে দিন্‌।"

পাণ্ডাজী গঙ্গাধরের একান্ত অনুরোধে গোমস্তাকে বলিয়া বিশ বৎসরের পুরাতন কাগজ-পত্র খুঁজিয়া সেই খৎ বাহির করিয়া দিলেন। গঙ্গাধর তাহা দেখিয়া পিতার স্বহস্ত-লিখিত নাম, ধাম ও টাকার সংখ্যা সমুদায় পড়িলেন। তাহাতে যুগপৎ আনন্দিত ও চমৎকৃত হইয়া পাণ্ডাজীকে বলিলেন—"এই খৎটী আপনি সাবধানে রাখুন, আমিই এই টাকা পরিশোধ করিব। এ খৎ আমার পিতার।"

অনন্তর গঙ্গাধর আপনার লোটা-কম্বল লইয়া বাহির হইবার উপক্রম করিলেন ও পাণ্ডাকে বলিলেন—"আমি এখন চলিলাম, শীঘ্রই আমি ফিরিয়া আসিয়া, এই খতের টাকা দিয়া দিব।"

পাণ্ডা বলিলেন—"কোথায় যাবে?"

গঙ্গাধর—"ভিক্ষায়, ভিক্ষা করে এই টাকা আমি সংগ্রহ ক'রে আন্‌বো।"

পা—এ জন্য তোমায় অন্যত্র ভিক্ষায় যেতে হবে কেন, আমি এ খৎ ছিঁড়ে ফেল্‌ছি।"

গ—"না না, আপনি ও খৎ ছিঁড়্‌বেন্ না, আমি ভিক্ষা ক'রে টাকা দিলে, ও খৎ আমায় দেবেন, আমি ওখানি রেখে দেবো।"

পা—"আচ্ছা, আমি তোমাকে এখনই পঞ্চাশ টাকা ভিক্ষা দিচ্চি—নাও।" এই বলিয়া গোমস্তাকে ডাক দিলেন।

গ—"না, আপনার টাকায় ও খৎ পরিশোধ হবে না। আমি অন্যত্র হতেই ভিক্ষা করে আন্‌বো।" এই বলিয়া গঙ্গাধর বাহির হইয়া গেলেন। পাণ্ডাজী অনেক অনুরোধ উপরোধ করিলেন, তাঁহার স্ত্রী আসিয়া কত বলিলেন, কত বুঝাইলেন, তিনিও টাকা দিতে চাহিলেন। কিন্তু গঙ্গাধর কোনও কথাই শুনিলেন না—চলিয়া যাইলেন। তাঁহার শেষ কথা—তিনি পাণ্ডার স্ত্রীকে বলিলেন—"মা, আমি শীঘ্রই আস্‌বো, তুমি কিছু চিন্তা করো না। আর এক কথা—দেখ মা, আমার এই কুকুরটী এখানে রইলো, এটীকে তুমি একটু যত্ন করো, নিত্য দুটী দুটী খেতে দিও, দেখো যেন কোথাও চলে না যায়, আমি একে বড় ভাল বাসি।

পাণ্ডার স্ত্রী তাহার উত্তরে মাথা নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলমাত্র, আর কোনও কথা বলিতে পারিল না। তাঁহার চিত্ত এক্ষণে অত্যন্ত উদ্বেলিত হইতেছে। বাস্তবিক পুত্রস্নেহ-পরায়ণ পাণ্ডা-দম্পতি সহসা তাঁহার এইরূপ আচরণে নিতান্তই মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহারা গঙ্গাধরের অভাবে এতই কাতর হইলেন যে, তাঁহাদের আর সময়ে আহার-নিদ্রা হয় না, কিছুতে রুচি নাই, কোনও কাজে

তাঁহাদের মন লাগে না, সর্ব্বদাই যেন কেমন এক উদাস ভাব, প্রকৃতই যেন তাহাদের পুত্র-শোকের ভাব উদয় হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে প্রায় এক পক্ষ কাল অতীত হইল, গঙ্গাধরের আর দেখা নাই; পাণ্ডাজী আজ কাল করিয়া, নিত্যই তাঁহার আগমন-প্রতিক্ষা করিতেছেন—কিন্তু গঙ্গাধর কোথায়? তিনি ত বিচলিত হইলেনই, তাঁহার স্ত্রীর অবস্থা আরও শোচনীয়, তাঁরও মুখে আর অন্ন উঠে না! স্ত্রীর অনুরোধে পাণ্ডাজী চারিদিকে গঙ্গাধরের অনুসন্ধানে লোক পাঠাইলেন। সকলেই একে একে ক্রমে ফিরিয়া আসিল, কেহই তাহার কোনরূপ সংবাদ আনিতে পারিল না। তাঁহারা ক্রমেই হতাশ হইয়া পড়িলেন। গঙ্গাধর যে ঘরে থাকিতেন, তাঁহারা নিত্য তথায় আসিয়া, তাঁহার পুস্তকাদি স্বহস্তে সমুদায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখেন, সেই কুকুরটীকে দুই বেলা যত্ন করিয়া আহার্য্য দেন, আর স্ত্রী-পুরুষে সেই ঘরে দুই জনে গঙ্গাধরের সম্বন্ধে কত কথাই আলোচনা করেন। কুকুরটাও যেন বিমর্ষ, সেও তেমন ভাবে আর আহার করে না, এক জায়গায় পড়িয়া কেবল ঝিমাইতে থাকে।

আরও এক পক্ষ অতীত হইয়াছে, তাঁহাদের নিত্য-কর্ম্মের মত আজও সন্ধ্যার সময় তাঁহারা সেই ঘরে আসিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া, উভয়ে মুখোমুখী বসিয়া, তেমনই ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, কুকুরটা দরজার চৌকাঠে মুখ রাখিয়া শুইয়া আছে, যেন সেও একাগ্র হইয়া তাঁহাদের কথা শুনিতেছে। সহসা সে যেন কি শব্দ শুনিয়া তিন লাফে দৌড়িয়া গেল, প্রথমে 'ঘেউ ঘেউ' করিয়া দুই এক বার চীৎকার করিয়া এক বার দরজার কাছে আসে, পুনরায় লেজ নাড়িতে নাড়িতে ছুটিয়া যায়। তাঁহারাও তাই দেখিয়া,

দরজার দিকে চাহিয়া আছেন। সহসা দরজার সম্মুখেই গঙ্গাধর আসিয়া উপস্থিত। কুকুরটা তাঁহার গায়ের উপর উঠিয়া যেন কত আদর করিতে লাগিল, গঙ্গাধরও অতি যত্নে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিল। এদিকে তাঁহারা ত তাঁহাদের হারাণ-ধন যেন সহসা কত অনুসন্ধানের পর কুড়াইয়া পাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহারা দুই জনেই যেন আনন্দে বিহ্বল হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। গঙ্গাধর তাঁহাদেরও যথা-সম্ভব অভ্যর্থনা করিয়া নিজের আসনে উপবেশন করিলেন।

তাঁহার অভাবে তাঁহাদের এই মাসাবধি কাল যে কি ভাবে গিয়াছে, কত কষ্ট হইয়াছে, সংক্ষেপে সেই দুঃখ-কাহিনী তাঁহারা বর্ণনা করিলেন। তাহার পর তখনই তাঁহার আহারাদির সকল ব্যবস্থা হইতে লাগিল। গঙ্গাধর এক মাসে কত রোগা হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার মুখ কালিমা-মাখা হইয়া গিয়াছে—মাতৃপ্রতীম পাণ্ডাইনজী (পাণ্ডার-স্ত্রী) পুনঃ পুনঃ তাহা বলিতে লাগিলেন ও নিজহস্তে তাঁহার মুখ হাত মুছাইয়া দিয়া, পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। কিয়ৎপরে ভিক্ষা আসিলে, গঙ্গাধর তাহা সেবা করিয়া শয়ন করিলেন। তাঁহারাও আজ যেন একটু নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইলেন।

পর দিবস প্রত্যুষেই গঙ্গাধর পাণ্ডাজীকে সেই খৎ আনাইতে বলিলেন ও তাঁহার সংগৃহীত পঞ্চাশটী টাকা পাণ্ডাজীর হাতে দিলেন। পাণ্ডা বলিলেন—"দেখ দেখি, এই কয়টা টাকার জন্য তোমায় বৃথা কতই না কষ্ট-ভোগ করিতে হইল! বেশ, তোমার যেমন ইচ্ছা, তেমনই হবে।"

খৎখানি আসিলে—গঙ্গাধর আপন-হস্তে তাহা অত্যন্ত আদর

করিয়া লইলেন ও পুনঃ পুনঃ তাঁহার পিতার স্বহস্ত-লিখিত সেই স্বাক্ষর ও ঠিকানাটী দেখিতে লাগিলেন।

এদিকে সেই কুকুরটী সহসা কেমন এক বার বিচিত্র চীৎকার করিয়া উঠিল, আর সঙ্গে সঙ্গে দরজার বাহিরে সংজ্ঞা-রহিত হইয়া শুইয়া পড়িল। গঙ্গাধর তাহা দেখিয়া, তাড়াতাড়ি তাহার মুখে কমণ্ডলু হইতে জল দিলেন, সে এক ঢোকমাত্রই জল খাইল, আর খাইল না, সে গঙ্গাধরের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পরই তাহার প্রাণ অনায়াসে বাহির হইয়া গেল।

পাণ্ডা প্রভৃতি সকলেই কুকুরটার সহসা এইরূপ মৃত্যুতে হায় হায় করিয়া দুঃখ-প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহার মৃত্যুর কারণ লইয়া, সকলে কত কথাই বলিতে লাগিল। কত লোকে কত প্রকার অনুমান করিল, কিন্তু গঙ্গাধর কোন কথাই বলিলেন না। তিনি নির্ব্বাক্ হইয়া তাঁহার এই বিচিত্র ও অসাধারণ প্রারব্ধ-ভোগ-বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে কেবল শ্রীভগবানে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। অনন্তর কুকুরটীকে নিজ হাতে উঠাইয়া, ফল্গুতে তাহার যথারীতি সৎকারও করিয়া আসিলেন। পাণ্ডাজী তাঁহার এইরূপ কুকুর-প্রীতির রহস্য অবগত না হইয়া, বালকোচিত-কর্ম্ম মনে করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন ও তাঁহার এই কার্য্যে স্বয়ংই সর্ব্বপ্রকার সহায়তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গঙ্গাধর কোনও রহস্য-ভেদ করিলেন না, অধিকন্তু গোপনে দশরাত্রি অশৌচ প্রতিপালন করিয়া, গোপনেই পিতার উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদিও সমাপন করিলেন।

বাস্তবিক এমন অলৌকিক ঘটনা তিনি কখনও কাহারও মুখে শুনেন নাই, অথচ নিজের জীবনেই ইহা প্রত্যক্ষ করিলেন

ও এই অলৌকিক দৈবী-রহস্য তিনি মর্ম্মে মর্ম্মেই অনুভব করিলেন! কিন্তু এই ঘটনার পর তাঁহার আর এখানে থাকিতে ইচ্ছা হইল না। কিছু দিন পরেই তিনি পাণ্ডাজীকে বলিয়া, পুনরায় দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইবেন, এইরূপ মনে মনে স্থির করিলেন! তাঁহার সেই প্রস্তাব তাঁহাদের নিকট কহিবামাত্র তাঁহারা ত কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি তাঁহার সাধু-জীবনের এও এক ভীষণ বন্ধন বুঝিতে পারিয়া, আর অধিক কাল এখানে থাকা কর্ত্তব্য নহে, তাহা দৃঢ় নিশ্চয় করিলেন। তাঁহাদের কাতরতায় তিনি আর বিচলিত না হইয়া, তাঁহাদের নানা ভাবে বুঝাইতে লাগিলেন, ক্রমে তাঁহাদিগকে কোনরূপে রাজী করিলেন। অনন্তর অধিক দিন আর বিলম্ব না করিয়া, তাঁহাদের সম্মতিতে বিদায় লইয়া, তথা হইতে ঝাড়খণ্ডী-বৈদ্যনাথ দর্শনে যাত্রা করিলেন।

ইতঃপূর্ব্বে তিনি উত্তরাখণ্ডীয় "আদি-বৈদ্যনাথ" দেবের দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন, এক্ষণে এই দেশে লঙ্কাধিপতি রাবণের আনিত বৈদ্যনাথ-দেবের শিলামূর্ত্তি দর্শন করিয়া, নিজকে তিনি ধন্য বোধ করিলেন। তথা হইতে কলিকাতায় কালিঘাটে আসিলেন ও শ্রীশ্রীকালীমাতার দর্শনাদি করিয়া কয়েক দিবস তথায় অতিবাহিত করিলেন। এই সময় তাঁহার এক বার রায়পুরে যাইয়া, গোপনে জন্মভূমি-দর্শন করিবার অভিলাষ হইল। সুতরাং আর কাল-বিলম্ব না করিয়া, তিনি রায়পুরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রথমে গঙ্গার ঘাটে যাইয়া, সেই বৃক্ষমূলে বসিলেন, যথায় পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বিমলানন্দ স্বামীজী গুরুদেবের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, যে স্থানে বসিয়া এক দিন তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে পূজ্যপাদের চরণে সেই হৃদয়-বিদারক খেদপূর্ণ আত্মকাহিনী

নিবেদন করিয়াছিলেন, সেই স্থলে বসিয়াই আজ সেই অতীতের কত কথা তিনি ভাবিতে লাগিলেন। পূর্ব্বস্মৃতি-বিজড়িত সে ঘাটেরও এখন অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিতে পাইলেন, তবে সে পরিবর্ত্তন অধিকাংশ ধ্বংসেরই দিকে!

ঘাটে অনেক লোক জন তখন স্নান করিতে আসিতেছে, অনেকে তাঁহাকে নবাগত নবীন-সাধু বলিয়া দেখিতেছে, কেহ বা প্রণাম করিতেছে, কিন্তু কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিতেছে না। এই সাত বৎসরে তাঁহার পরিবর্ত্তনও অনেক হইয়াছে—মাথায় বিলম্বিত দীর্ঘ জটাজুট, অঙ্গে গৈরিক-বসন ও উত্তরীয় সে আবার সাধুর সাজে গাঁতি করিয়া বাঁধা, বিভূতিলিপ্ত কপাল ও হস্তে কমণ্ডলু, তাহার উপর নব-যৌবনের ব্রহ্মচর্য্য-পূর্ণ দিব্য দেহ-কান্তি, প্রকৃতই তাঁহাকে নূতন করিয়া তুলিয়াছে।

তিনি বহুক্ষণ এই স্থানে বসিয়া আছেন, অনেককেই তিনি চিনিতে পারিতেছেন, কিন্তু মুখ ফুটিয়া তিনি কাহাকেও আপনার পরিচয় দেন নাই। তিনি আপন ভাবেই যেন বিভোর হইয়া আছেন। একটী বৃদ্ধা কলসীকক্ষে তাঁহার দিকে বার বার দেখিতেছে ও তাঁহার দিকে ক্রমে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, তিনি কিন্তু তাহা আদৌ দেখিতে পান নাই। সহসা সেই বৃদ্ধা তাঁহার নিকট কলসীটী নামাইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"বাবা গঙ্গাধর এসেছিস্, হায় হায়, তোরই জন্যে তোর মামী, —এখনও বুঝি বেঁচে আছে, চল্ বাবা চল্, বাড়ীর দিকে চল্।"

সেই বৃদ্ধাকেই তিনি ইতোপূর্ব্বে প্রয়াগে দেখা দিয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধাকে হঠাৎ এইরূপ ভাবে কাঁদিতে দেখিয়া, একটু স্তম্ভিত হইলেন, ঘাটের লোক-জনও তখন সেদিকে আসিয়া উপস্থিত হইল,

কেহ কেহ তখন চিনিতেও পারিল। বৃদ্ধা আর তথায় কাল-বিলম্ব না করিয়া, তাহার কলসীটী কক্ষে উঠাইয়া লইল ও গঙ্গাধরের হাত ধরিয়া বলিল—"চল বাবা, আর দেরী করো না, তোমার মামীর শেষ অবস্থা, কখন যায়!"

তিনি আর কোন কথাই বলিবার অবসর পাইলেন না, বৃদ্ধার সঙ্গে বাটীর দিকে যাইলেন। বাড়ীর আর সে শ্রী-ছাঁদ কিছুই নাই, সবই যেন শ্মশানসম নির্জ্জনতায় পূর্ণ, সর্ব্বত্রই অপরিচ্ছন্ন, লতাগুল্ম ও কণ্টকাদিতে চারিদিক সমাবৃত। তিনি যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি যে কেবল স্তম্ভিত হইলেন, তাহা নহে, বিশেষ মর্ম্মাহতও হইলেন।

বৃদ্ধা যাইতে যাইতে সংসারের সকল দুর্ঘটনার কথাই সংক্ষেপে বলিয়া গেল। তাঁহার সংবাদ পাইয়া, গ্রামের লোক যে যথায় ছিল, সকলে ছুটিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিল। সেই নির্জ্জন পুরীতে সহসা যেন রথ-দোলের ভিড় লাগিয়া গেল, কিন্তু তাঁহার পবিত্র গাম্ভীর্য্যদীপ্ত মুখ দেখিয়া, কেহই যেন বাক্যালাপ করিতে সাহস করিল না। তিনি অনতিবিলম্বে সেই বৃদ্ধার সহিত তাঁহার মামীমার ঘরে প্রবেশ করিলেন। গৃহে তাঁহার মামীমা মৃত্যুশয্যায় শায়িত, পার্শ্বে একটীমাত্র যুবতী স্ত্রীলোক বসিয়া, তাঁহার সেবা করিতেছিল। সহসা গৃহমধ্যে এত লোক-জনের সমাগম দেখিয়া, মেয়েটী ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া নিজের কাপড়-চোপড় সামলাইয়া লইল, পরক্ষণেই ব্রহ্মচারী-বাবাজীকে অগ্রবর্ত্তী হইতে দেখিয়া মেয়েটী তাড়াতাড়ি উঠিয়া, যেন কতকটা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-ভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিল ও অতি পরিচিতের ন্যায় বলিল—"আপনি এখানে কখন এসেছেন?"

গঙ্গাধর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এই খানিকক্ষণ হইল, তুমি কবে এসেছ ?"

মেয়েটী উত্তরে বলিল—"প্রায় চার পাঁচ মাস আমি এখানে আছি।"

মেয়েটী আমাদের পূর্ব্বপরিচিত গিরিবালা, যাহাকে গঙ্গাধর আদি সাধুরা সেই আম্বালার ছাউনীর নিকট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। গিরিবালা সেই পরিচয়েই গঙ্গাধরকে অভ্যর্থনা-সহ বসিবার আসন পাতিয়া দিল। সে তাহা ছাড়া আর কোনও পরিচয় এখনও বুঝিতে পারে নাই। গঙ্গাধর আসনে বসিবামাত্র, তাহার মামীমা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া, অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন—"বাবা গঙ্গাধর, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে!" বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু বহিয়া অজস্র অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। তিনি মামীমার মুখ মুছাইয়া দিয়া, একখানি পাখা লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন।

মামীমা আবার বলিলেন—"বাবা, এখন আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মর্‌তে পার্‌বো, অন্তরের বিছের জ্বালা বুঝি কম্‌ছে! তুমি পূণ্যবান সাধু, তোমার দ্বেষ-হিংসে কিছুই নেই জানি, তুমি নিশ্চয়ই আমায় কায়-মনে ক্ষমা কর্‌বে, না না, তুমি যে আমাকে ক্ষমা করেছ, বাবা তা না হলে, আমার এমন সময় তুমি আস্‌বে কেন ? বাবা, তোমার হাতে শেষ জল-বিন্দু পাবার জন্যেই এখনও এদেহে প্রাণ আছে। তুমি যে আমার মুখে জল দিতে আস্‌ছ, তা আমি একটু আগেই স্বপ্নে জান্‌তে পেরিছি, তোমাকে দেখ্‌তেও পেয়েছি। দাও বাবা, একটু জল দাও, আর কথা বল্‌তে পাচ্ছি না, বড় পিপাসা।"

তিনি নিজ কমণ্ডলু হইতে মামীমার মুখে গঙ্গাজল দিলেন।

মামীমা সেই শীতল জলধারা পান করিয়া যথার্থই যেন কৃতার্থ ও পরম শান্তিলাভ করিলেন। তিনি আর কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। অতিকষ্টে গঙ্গাধরের দিকে আপনার শীর্ণ হাতখানি বাড়াইয়া দিলেন। গঙ্গাধর তাঁহার হাতখানিতে নিজের হাত বুলাইতে লাগিলেন। তখন তিনি আর এক বার গঙ্গাধরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন--"গঙ্গাধর—", আর কোনও কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠস্বর বন্ধ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবন-নাটকের যবনিকা পতিত হইয়া গেল।

গিরিবালা ও সমাগত লোকজন তখন সমস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। রায়পুরের এতকালের রায়-পরিবার আজ শেষ হইল। গঙ্গাধর ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার ও মাতুল-বংশের এই অদ্ভুত ভাগ্যবিপর্য্যয়ের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে, তিনি যেন অবাক্ হইয়া যাইলেন। গ্রামের দুই চারি জন প্রবীন লোক আসিয়া, তাহার সহিত ক্রমে নানা বিষয়ের আলাপ করিতে লাগি-লেন। তাহার মধ্যে তাঁহার মামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিষয়েই বিশেষ করিয়া পরামর্শ হইতে লাগিল। সকলের যত্ন, চেষ্টা ও একান্ত অনুরোধে গঙ্গাধরই তাঁহার মামীমার মুখাগ্নি করিতে বাধ্য হইলেন। কাজেই তাঁহাকে চতুর্থ দিবসে মামীমার শ্রাদ্ধাদিও যথাবিধি সমাপন করিতে হইল। তিনি ব্রহ্মচারী সাধু, এখনও সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করেন নাই, সুতরাং এ সকল বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আপত্তিরও কোন কারণ ছিল না।

গিরিবালাই কয় দিবস তাহার পিসিমার শেষ কাজ-কর্ম্মে সকল দিক্ দেখিয়া শুনিয়া করিতেছে। সে এখন গঙ্গাধরের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া, অধিকতর আনন্দ ও উল্লাস-সহকারে তাঁহারও

পরিচর্য্যা করিতেছে। গঙ্গাধর নির্লিপ্তভাবেই ঠিক যেন প্রারব্ধ-কর্ম্মভোগমাত্রই নির্ব্বিকারে সম্পন্ন করিয়া যাইতেছেন। কোনও বিষয়েই তাঁহার অনুরাগ নাই, অথচ তাঁহার কার্য্য-কলাপ দেখিলে, তাঁহার বিরাগ বা বিরক্তির ভাবও বুঝিতে পারা যায় না। সকলের সহিতই প্রয়োজন মত আলাপ, পরিচয়, পরামর্শ, ধর্ম্মকথা ও সদালাপ করিয়া, দিন অতিবাহিত করিতেছেন। তাঁহার মামার বাড়ীর সম্পর্কে আর এখন কেহই নাই। তিনিই কেবল সেই সমুদায় বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারী, সুতরাং গ্রামের সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—"গঙ্গাধর এই খানেই থাকুন, সংসার ধর্ম্ম করুন।"

তিনি এই প্রস্তাব শুনিয়া কেবল গম্ভীর ভাবে ঈষৎ হাসিলেন-মাত্র, আর কোন কথাই বলিলেন না। তাঁহার সেই ভাব দেখিয়া ও বুঝিয়াও গ্রামবাসীরা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে বিরত হইলেন না। তখন তিনি তাঁহাদের বলিলেন—"আপনারা কি পাগল হয়েছেন? আমার কি আর সংসার ধর্ম্ম কর্‌বার্ শক্তি আছে? প্রবৃত্তির কথা ত ছেড়েই দিন্। আমি পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত প্রারব্ধ-কর্ম্মফলে—সন্ন্যাসী সদ্‌গুরুর শিষ্য—ব্রহ্মচারী-সাধু, পূজ্য-পাদের আশীর্ব্বাদ লাভে আমি ধন্য, আমি তাঁরই কৃপায় সংসারের অনিত্যতা, এর পূর্ব্বেই সব অবগত হয়েছি, আর এই মাতুল-বংশের পরিণতি দেখে, মর্ম্মে মর্ম্মে সমস্তই অনুভব কর্‌লুম! আমার 'সংসার-যোগ' আদৌ নাই। তবে আপনাদের অনুরোধে আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, রায়পুরের প্রসিদ্ধ রায়-বংশের স্মৃতি-রক্ষার জন্যে এখানে একটী শিবালয়, ধর্ম্মশালা ও পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হউক। তাঁদের এখনও যা' কিছু এই বিষয়-সম্পত্তি আছে, তাতে তার খরচ-পত্র কোনরূপে চলেই যাবে। আপনারা সকলে মিলে সেই বিষয়ে

উদ্যোগী হউন্। তা' হ'লে, আমিও মধ্যে মধ্যে এসে অনায়াসে থাক্‌তে পার্‌বো, আর সে বিষয়ের উন্নতির জন্যে সাধ্যমত যত্ন কর্‌তেও পার্‌বো। সময়ে এখানে একটী আদর্শ ব্রহ্মচারী আশ্রমও প্রতিষ্ঠিত হতে পার্‌বে।"

গঙ্গাধর যেরূপ যুক্তি-বিধানে বিস্তৃত করিয়া এই বিষয়টী সকলকে বুঝাইয়া দিলেন, তাহাতে কেহই আর আপত্তি করিতে পারিলেন না। অবশেষে এই প্রস্তাব মতই সমুদায় কর্ম্মের ব্যবস্থা হইতে লাগিল।

উপসংহার।

গঙ্গাধরের গৃহত্যাগের পর, তাঁহার মাতুল চন্দ্রনাথবাবু বহু অনুসন্ধানেও, তাঁহার কোনও সংবাদ না পাইয়া, বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। সেই যে কেমন বিমর্শ হইয়া পড়িলেন, তাহাতেই তাঁহার স্বাস্থ্য এক প্রকার ভঙ্গ হইয়া গেল। তাহার পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটী মারা যায়, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সতীশ অল্পদিন পরেই গঙ্গায় সাঁতার দিতে দিতে ডুবিয়া যায়। তাহার দেহ গঙ্গার গভীর জলে তলাইয়া বা কোন্ দিকে যে ভাসিয়া গেল, কিছুতেই তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। দেখিতে দেখিতে এই কয় বৎসরের মধ্যে তাঁহার সংসার যেন ছিন্ন-ভিন্ন-অবস্থা প্রাপ্ত হইল! তিনিও নানা দুশ্চিন্তায় যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া, ক্রমাগত ভুগিতে ভুগিতে গত বৎসর মারা যান। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার মধ্যম-সন্তান সতীশের মেজভাই গিরীশই কেবল জীবিত ছিল। আর সব ছেলে মেয়ে তাহার পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া যায়।

গিরীশ বড় ভাল ছেলে, লেখাপড়াও বেশ করিত, তাহার কোনও উপদ্রব ছিল না, সে খুব শান্তশিষ্ট বুদ্ধিমান বালক। তাহার উপর চন্দ্রনাথবাবুরও যথেষ্ট আশা ছিল। আহা, তাঁহার স্ত্রী এই ছেলেটীকে মাত্র লইয়াই বিধবা হইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ, তাহাও তাঁহার ভাগ্যে রক্ষা হইল না। উৎকট বসন্ত-রোগে ছেলেটী অল্প দিনের মধ্যেই হঠাৎ মারা যায়। তদবধি প্রায় আট মাস কাল চন্দ্রনাথবাবুর বিধবা-পত্নী শোকে

কষ্টে অহরহঃ দুশ্চিন্তায় রুগ্না হইয়া পড়িলেন। এমন কেহ আত্মীয় নাই যে, এই মনোকষ্টের সময় তাঁহাকে একটু সান্ত্বনা দেয়, তাঁহার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করে। তাহার বাপের বাড়ীতেও তেমন কেহ নাই, একটী ভাইপো ব্যতীত আর কেহই ছিল না, সে বেচারা হুগলীতে আপনার সংসার লইয়াই ব্যস্ত। তথাপি কদাচ কখনও আসিয়া, বিশেষ এই অসুখের সময় দুই এক বার তাহার পিসিমাকে দেখিয়া যাইত। সে একবার বলিল—"পিসিমা, আমার যেমন চাকরি, তাত জান, এক দিন যে ছুটী করে আসি, বা এখানে দু'দিন থাকি, তার উপায় নেই। বরং তুমি যদি হুগলীতে যাও, তা হলে—আমার সাধ্যমত তোমার দেখা-শুনা, সেবা-শুশ্রূষা করতে পারি।"

পিসিমা কিন্তু তাহাতে রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন—"বাবা তুমি সুখে থাক, মা মঙ্গলচণ্ডী তোমার মঙ্গল করুন্, বাপের বংশের শেষ-গুঁড়ো তুমি, আমার পোড়া অদৃষ্ট, আমি এখন গেলেই বাঁচি, তবে যতক্ষণ আছি—শ্বশুরের ভিটেতে সন্ধ্যার প্রদীপটা জ্বল্‌ছে, আমি গেলেই এ শ্মশান-পুরী একেবারে নিরব হবে, অন্ধকার হয়ে যাবে! তবে যদি বেচারী গিরিবালাকে দু-দিনের তরে এখানে পাঠিয়ে দাও; সেও ত মহা হতভাগী, তবু পিসি-ভাইঝিতে দু-জনে একত্র থাক্‌বো।"

সেই কথামতই কয়মাস হইল, গিরিবালা এখানে আসিয়াছে। তাহার পর তাঁর শেষ পরিণতি যে ভাবে হইল, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সংবাদ পাইয়া রায়পুরে আসিল, গঙ্গাধরের সহিত তাহার নানা কথা-বার্ত্তা ও পরামর্শ হইল। পরে গ্রামবাসী

প্রবীন লোক-জনের সহিত পূর্ব্ব-কথিতরূপ—শিবালয় ও ধর্ম্মশালাদি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ-আয়োজন হইতে লাগিল। গঙ্গাধর তদুপলক্ষে প্রায় দুই বৎসর কাল রায়পুরে রহিলেন ও যথেষ্ট পরিশ্রম-সহকারে তাহার সমুদায় বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

গিরিবালা এ পর্য্যন্ত এখানেই আছে, গঙ্গাধরের নিত্য ভিক্ষাদির সেই সমুদায় ব্যবস্থা করিয়া দেয়। মেয়েটী বড় লক্ষ্মী ও বুদ্ধিমতী, সে সর্ব্বদা গঙ্গাধরের নিকট ধর্ম্মকথা শুনিয়া ও কিছু কিছু শাস্ত্রাদি পড়িয়া বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছে। সে'ও এখন যেন রীতিমত ব্রহ্মচারিণীরূপে পরিণত হইয়াছে। গঙ্গাধরের নিকট সে সাধন ভজনের বিষয়েও অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছে। সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া, তাঁহার নিকট মন্ত্র-দিক্ষা'ও লইয়াছে।

গঙ্গাধর মাতামহ-বংশের সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকা এত দিনে রীতিমত সংস্কার করিয়া, প্রথমতঃ ঠাকুর-দালানে পঞ্চায়তনী দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, চক্‌মিলান বাহিরবাটীতে সংস্কৃত পাঠশালা ও ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এক জন সাধুপ্রকৃতি-বিশিষ্ট প্রবীন ও সুবিজ্ঞ অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া তথায় রাখিয়াছেন। গ্রামের কয়েকটী ব্রাহ্মণ-বালককে উপনয়নান্তে নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারীরূপে তথায় রাখিয়াছেন। তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষার রীতিমত বিধি-ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন ও তাহার প্রাথমিক কার্য্যের শিক্ষা-উপদেশসমূহ তিনি নিজের হস্তেই রাখিয়া, সেই অধ্যাপক মহাশয়কে সমুদায় বুঝাইয়া দিতেছেন। তাঁহার এই নূতন আদর্শ শিক্ষা-প্রথা দেখিয়া, অধ্যাপক মহাশয় কেবল যে মৌখিক-ভাবে অনুমোদন করিতেছেন, তাহা নহে, তিনি যথার্থই চমৎকৃত হইয়া, তাহা পূর্ণরূপে অবলম্বন করিতে দৃঢ়ব্রত হইয়াছেন ও সেই নবীন

ব্রহ্মচারী গঙ্গাধরের শিষ্যরূপে আপনাকে স্বীকার করিতেও আর কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি বয়সে প্রবীণ হইলেও, গঙ্গাধরকে ঠিক গুরুর মতই সম্মান করেন। গ্রামবাসী জনগণ তাঁহার সহিত সদালাপে ও তাঁহার এই অপূর্ব্ব বিধান দেখিয়া, প্রকৃতই অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। সকলেই সর্ব্বদা তাঁহাকে সর্ব্ববিষয়ে সহায়তা করিতে লাগিলেন।

প্রত্যেক বাটীতে এখন নিত্য কিছু কিছু ভিক্ষা এই ধর্ম্মশালার জন্য রক্ষিত হয়, তাহা মাসান্তে সংগৃহীত হইলে, ধর্ম্মশালায় সাধু ও ব্রহ্মচারীদিগের সেবায় ব্যবহৃত হয়। তাহার পর পূজা-পার্ব্বন, অন্নপ্রাসন-উপনয়ন ও বিবাহাদি সকল উৎসবেই এই ধর্ম্মশালায় লোকে সাহায্য করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। সুতরাং আশ্রম-পরিচালনার ব্যয়-বিচার সম্বন্ধে কোনও চিন্তা রহিল না। বলা বাহুল্য, চন্দ্রনাথবাবুর পরিত্যক্ত সমস্ত বিষয়-সম্পত্তিই গঙ্গাধর ইতোপূর্ব্বেই আশ্রমের নামে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন।

আশ্রমের বিধি-ব্যবস্থা, রক্ষা, ও সুপ্রণালীতে কার্য্য-পরিচালনার জন্য তিনি গ্রামস্থ পাঁচ জন বিজ্ঞ সৎলোকের যোগে একটী "কার্য্য-পরিচালনী সভার" প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। উপস্থিত তিনি অবশ্য নিজেই প্রধান কর্ম্ম-কর্ত্তারূপে কার্য্য করিয়া দিতেছেন।

অন্দর-মহলটী তিনি গিরিবালার উপর ভারার্পণ করিয়া দিয়াছেন। তথায় গ্রামবাসী অনাথা, সতী-সাধ্বী ও বিধবাদিগের থাকিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যহ দেবতার মন্দির-সংস্কার, পূজা ও ভোগারতির সমস্ত প্রস্তুতই করেন। নিজেরাও পূজার্চ্চনা ও স্ব স্ব সাধন-ভজন করেন; শাস্ত্রাদিরও পাঠাভ্যাস করেন তাঁহারাই এবং গ্রামবাসী ছোট ছোট মেয়েদের

শিক্ষা দেন। অর্থাৎ বাহিরে যেমন "ব্রহ্মচারী পাঠশালার" প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, অন্দরেও তেমনই "কন্যা-পাঠশালার"ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তথায় যে কেবল লেখাপড়াই শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা নহে। মেয়েদের সর্ব্ব-বিষয়ে সাংসারিক কাজ-কর্ম্মও শিক্ষা দেওয়া হয়।

আশ্রমের মেয়েরা তাহাদের অবসর মত নির্দ্দিষ্ট সময়ে—পাট ও শোনের দড়ি পাকায়; চরকায় সূতা কাটে, পৈতা তোলা, এই সমস্ত কার্য্য করে, তালপাতার পাখায় ঝালোর বসায়, কড়ির ও ঝিনুকের নানাবিধ খেলেনা এবং চিত্র-বিচিত্রময় বিবিধ শিল্প-কর্ম্ম, আল্‌পানা, সেলায়ের কাজও করে, অন্য মেয়েদেরও শিক্ষা দেয়। সেই সব কাজ-কর্ম্ম-জাত বস্তু বিক্রয় করিয়া, তাহারা বার-ব্রত তীর্থ-দর্শন ও দান-পুণ্য করিবার কিছু কিছু অর্থও সংগ্রহ করে। আশ্রমেও তাহাতে অনেক প্রকারে সহায়তা হয়।

গঙ্গাধরের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে তাঁহার প্রধান গুরুভাই, এক্ষণে তাঁহার গুরুস্বরূপ স্বামী বিদ্যানন্দজী মহারাজ এখানে সম্প্রতি আসিয়াছেন। তিনি ইতোপূর্ব্বেই তাঁহার গুরু-সখা পূজ্যপাদ ষট্‌শ্রীমদ্ ত্রিপুরানন্দজী স্বামীজী মহারাজের (বুড়া বাবার) নিকট যথাবিধি সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন। এখন তাঁহার আর শিখা-সূত্র নাই, তিনি কৃতশ্রাদ্ধপিণ্ড, অর্থাৎ দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের শ্রাদ্ধান্তে বিধিপূর্ব্বক আত্ম-শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সমাপন করিয়াছেন। গঙ্গাধর তাঁহার এ ভাব পূর্ব্বে দেখেন নাই।

যাহা হউক স্বামী বিদ্যানন্দজী গঙ্গাধরের এই সকল অনুষ্ঠান দেখিয়া, অতীব সন্তুষ্ট হইলেন; তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ করিলেন। গঙ্গাধরের অনুষ্ঠিত কার্য্যে যাহা কিছু অভাব ও ত্রুটী ছিল, তাহা তিনি আসায় সমুদায় পূর্ণ হইয়া গেল।

গ্রামবাসী তাঁহার আগমনে যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছে, তাহা আর বলিবার নহে। তাহারা বস্তুতই যেন সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের আবির্ভাবে নিজেদের ধন্য মনে করিয়াছে, আর গঙ্গাধরকেও বার বার ধন্যবাদ দিতেছে। সকলেই এক বাক্যে বলিতেছে—"মহাপুণ্যবান গঙ্গাধর এ গ্রামে জন্মগ্রহণ না করিলে, আমাদের এ সৌভাগ্য কোন কালেই হইত না!"

অধ্যাপক মহাশয় সৎসঙ্গে মুগ্ধ হইয়া স্বামীজীর নিকট রীতিমত ব্রহ্মচর্য্যদীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক আশ্রমের সর্ব্ববিধকার্য্য-পরিচালনায় স্থায়ী-ভাবে ভার গ্রহণ করিলেন। এত দিন তিনি বেতনভোগী অধ্যাপক-মাত্র ছিলেন, এখন হইতে তিনি আশ্রমের বিনাবেতনের এক জন অন্তরঙ্গ সেবকরূপে পরিগণিত হইলেন। তাঁহার নিষ্ঠা ও একাগ্রতা-পূর্ণ কায়-মন-যোগে পরিশ্রম দেখিয়া, সকলেই তাঁহার অতি অনুগত হইয়া পড়িলেন। স্বামীজী তাঁহাকে আশ্রম-পরিচালনার সর্ব্ব-প্রকার উপদেশ দিয়া তাঁহার এক জন সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

এই ভাবে আরও তিন মাসকাল অতিবাহিত হইয়া গেল—স্বামীজী এই বার অন্যত্র যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, গঙ্গাধরও তাঁহার অনুগামী হইবেন বলিলেন। গ্রামস্থ আবাল-বৃদ্ধ বণিতা এই সংবাদে যেন মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু তাঁহারা সকলকেই অত্যন্ত স্নেহভাবে বুঝাইয়া পরিতৃপ্ত করিলেন ও মধ্যে মধ্যে আসিয়া আশ্রমের পরিদর্শন করিয়া যাইবেন, স্বীকার করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে তাঁহারা রায়পুর হইতে বিদায় লইয়া প্রয়াগের দিকে যাত্রা করিলেন।

এই ঘটনার অনেকদিন পরে গঙ্গাধরজী একবার রায়পুরের আশ্রম দেখিবার জন্য বাঙ্গলাদেশে আসেন, তখন সহসা সেই ঘট্ শ্রীমদ্ পরমহংস স্বামীজী মহারাজের সহিত তাঁহার রেলের গাড়ীতেই সক্ষাৎ হয়। সেই জ্বালামুখী ও কাঙ্ড়ায় তাঁহার সহিত বিদ্যানন্দজীদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনিই তীর্থ সম্বন্ধে ও তন্ত্রের আচার-সম্বন্ধে অনেক গূঢ় বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। গঙ্গাধরজী তাঁহাকে দেখিয়া, অতীব ভক্তিভরে প্রণাম ও অভ্যর্থনা করিলেন, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার প্রধান সন্ন্যাসী-শিষ্য আর এক জন স্বামীজীও ছিলেন, গঙ্গাধরজী তাঁহাকেও বিশেষভাবে অভিবাদন করেন। তাঁহারা তিন জনে নানা কথা প্রসঙ্গে মনের আনন্দে এক গাড়ীতে বহুদূর যাত্রা করেন।

অনন্তর গঙ্গাধর কথায় কথায় তাঁহার জীবনের সমস্ত ঘটনাই স্বামীজীদের সম্মুখে প্রকাশ করেন। পরে আর এক সময় স্বামী বিদ্যানন্দজীও অনেক কথা তাঁহাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সমাপ্ত

(কাজের লোক)—"*** এমন গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে কেহ প্রকাশ করেন নাই। ** একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। (সাহিত্য-সংবাদ)—"*** ইহা পাঠে ধর্ম্মভাবের উদ্রেক হয়, বিষয়-বিন্যাস কৌতুহল-প্রদ।" *** (ব্রহ্মবিদ্যা)—"যিনি বহু বৎসর কাশীতে বাস করিয়া স্থানীয় তথ্য সকল নিজে আয়াসসহ অনুসন্ধান করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা যে অন্যদৃষ্ট ও অন্য-লিখিত বিবরণের অনুবাদাদি অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাস্য ও সত্য, তাহার সন্দেহ নাই। এই পুস্তকে অবশ্য-জ্ঞাতব্য কোন বিষয়ের অভাব দেখিলাম না। ***" (বঙ্গবাণী)—"** এককথায় ইহা কাশীর ইতিহাস ও কাশীযাত্রীর "গাইড-বুক"। *** ("THE BENGALI," 33-1-12)—"The book is full of valuable information about the sacred city—information which we believe would be both interesting and instructive to all lovers of antiquity and particularly to patriotic Hindus." ("INDIAN DAILY NEWS" 10-9-12)—"This is an illustrated guide book to Benares in Bengali ***which cannot fail to be of use to Bengali pilgrims to that Holy City. ("AMRITA BAZAR PATRIKA." 7-10.12) —"***The reader will find in the book detailed descriptions of not only all the temples, wells, ghats, muths, mosques, and other relics of antequarian interest but also of all the modern institutions which have added lustre to the fair fame of the fascinating city. There are also in the book elaborate accounts of the various religious sect with

their institutions, that have established themselves in the city. The book contains various illustrations. ***In the accounts which the learned author has given, he has left nothing unsaid and the most minute objects of interest have not escaped his observant eye. The language is chaste, lucid and dignified, and the general get-up of the bock excellent.***("THE TELEGRAPH")—"**A topographical review of Kasi and its surroundings. When we say topographical we do not imply thereby that he has written only notes on the Holy City as regards its geography but an exhaustive and interesting history, social, religious and political, of Benares with minute description an accounts of places of interest. ***It has one great attraction, we mean, it never tries the patience of readers ; we think it is valuable as a book of reference and useful to all intending pilgrims to the Holy City."

বর্ণ-চিত্রণ 'পেন্টিং' বা চিত্র-শিল্প-বিষয়ক অপূর্ব্ব গ্রন্থ, সৎসাহিত্যের ন্যায়ই ইহা সকলের সুখ-পাঠ্য ও উপভোগ্য।

ইহাও উক্ত আচার্য্য-প্রবর প্রবীন সাহিত্যিক সাহিত্যকলা বিস্তার্ণব মহাশয় প্রণীত একখানি অসাধারণ পুস্তক। মূল্য—বিলাতি বাঁধাই ১৲ টাকা মাত্র।

'বর্ণ চিত্রণ'-সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত :—

(বঙ্গবাসী)—"কেবল চিত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞতা থাকিলে গ্রন্থ-রচনা হয় না, সাহিত্য-রচনায় শক্তি থাকা চাই। শ্রদ্ধেয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় সাহিত্য-রচনায় চিরকুশল। তুলিকায় যে ছবি উঠে, লেখনীতে তাহা ফুটাইতে হইলে, সাহিত্য-রচনা-শক্তির প্রচুর প্রয়োজন হয়। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দুই শক্তিই দীপ্তিময়ী। এই আলোচ্য-গ্রন্থ চিত্রসম্বন্ধে আদর্শ-গ্রন্থ হইয়াছে। চিত্রবিদ্যায় যাঁহাদের ঝোঁক, তাঁহাদের কাছে ইহার আদর ত হইবেই, **সাহিত্য হিসাবেও প্রত্যেক বাঙ্গালীর ইহা আদরণীয়। এক কথায় বলি, বাঙ্গালায় এমন গ্রন্থ নাই বলিলেও, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না।**" (ব্যবসায়ী)—"*** সকলকেই এই পুস্তকখানি একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।" (এডুকেশন গেজেট)—"এরূপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম। ভারতীয় শিল্পকলার সঞ্জীবনের ইতিহাসে এই পুস্তকখানি ভবিষ্যতে স্মরণীয় হইবে। *** গ্রন্থকার শ্রেষ্ঠশ্রেণীর লোক।**" সাহিত্য-সংবাদ)—"*** গ্রন্থখানিকে প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের চিত্রবিদ্যার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' বলিলেও বলা যাইতে পারে। চিত্রশিক্ষার্থী এই পুস্তকের সাহায্যে চিত্রশিক্ষার বহু তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। বাঙ্গালা ভাষায় এ শ্রেণীর পুস্তক বিরল। প্রসিদ্ধ শিল্পী ও সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবম্বিধ গ্রন্থ প্রণয়নে বাঙ্গালা-সাহিত্যের এক দিকের বিশেষ অভাব পূরণ করিতেছেন।***" ("THE

"TELEGRAPH" "***The learned author has very elaborately dwelt upon the various stages of the art of painting as they are being studied and taught in the Western countries, dealing incidentally with the ancient art of painting in India which though now forgotten for want of culture is not exactly dead and which is sure to be of invaluable help to learners as well as teachers. It is also sure to awaken an interest in the public mind in a subject which has hitherto remained dark for want of culture.***"

চিত্রবিজ্ঞান রেখাঙ্কন বা 'ড্রয়িং' বিদ্যার ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপুস্তক। (দ্বিতীয় সংস্করণ) আমূল পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত। ইহাও উক্ত আচার্য্যপ্রবর শ্রীযুক্ত সাহিত্যকলা-বিদ্যার্ণব মহাশয় প্রণীত। ড্রয়িং আদি প্রত্যেক শিল্প-শিক্ষার্থীর অতি অবশ্য পাঠ্য। এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়টী "চিত্রবিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা" অংশ প্রত্যেক শিক্ষানুরাগীরই অবশ্য পাঠ্য। মূল্য ৷৵০ আনা মাত্র।

আলোকচিত্রণ বা ফটোগ্রাফি-শিক্ষা (৬ষ্ঠ সংস্করণ)। আমূল পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।

ইহাও উক্ত আচার্য্যপ্রবর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সাহিত্যকলা-বিদ্যার্ণব মহাশয় প্রণীত প্রায় ৩০।৪০ বৎসর হইতে ভারতের অধিকাংশ

ফটোশিল্পীই এই পুস্তকের সাহায্যে শিক্ষালাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। বাঙ্গালা ভাষার ইহাই আদি ও শ্রেষ্ঠ পুস্তক বিলাতি বাঁধাই মূল্য ৳০ বার আনা মাত্র।

'আলোকচিত্রণ' সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত :—

(হিতবাদী)—"ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক। *** শিক্ষার্থীদের বিশেষ উপযুক্ত।" (বঙ্গবাসী)—"যাঁহারা ফটোগ্রাফি শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই পুস্তক বিশেষ উপযোগী।" (সময়)—"এ শ্রেণীর পুস্তক এই নূতন।" (বান্ধব)—"*** চক্রবর্ত্তী মহাশয় একই আধারে বিখ্যাত শিল্পী ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক। সুতরাং সাহিত্যসেবী ব্যক্তিমাত্রেরই সাদর-পূজাস্পদ সুহৃদ। এদেশে ইদানীং বাঙ্গালীর জাতীয়-সাহিত্যের একটী বিরাট প্রতিমা ধীরে ধীরে গঠিত হইতেছে। তাঁহার ন্যায় সূক্ষ্ম-শিল্পীরা 'আলোকচিত্রণ' প্রভৃতি গ্রন্থের দ্বারা সূক্ষ্ম-শিল্পের যে সকল তত্ত্ব বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিতেছেন, তাহা সে প্রতিমার বিশেষ অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিবে।

ছায়াবিজ্ঞান বা ফটোগ্রাফি শিক্ষার ২য় পুস্তক। (৪র্থ সংস্করণ) অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাও উক্ত আচার্য্যপ্রবর চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রণীত। 'আলোকচিত্রণে' যে সকল বিষয় নাই, 'ছায়াবিজ্ঞানে' তাহাই বিস্তৃত ও বৈজ্ঞানিক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং ফটো-শিক্ষার্থীর ইহাও বিশেষ প্রয়োজনীয় পুস্তক। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

হইলে যে খুবই ভাল হয়, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। বিলাস-ব্যাধি আমাদের শুদ্ধান্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছে। এ অবস্থায় এরূপ গ্রন্থ গৃহে গৃহে বালিকাদের পাঠ করান কর্ত্তব্য। এই গ্রন্থ পড়িয়া ইহার উপদেশ অনুসারে চলিতে পারিলে, গৃহস্থ-সংসারের স্বাস্থ্য অনেকটা ফিরিতে পারে, সংসার অনেক অসুবিধার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে * ।"

(**কাজের লোক**)—"একখানি উৎকৃষ্ট হিন্দু-স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক। বালিকা বয়স হইতে প্রসূতি অবস্থা পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের যাহা কিছু সাংসারিক বিষয় জানা আবশ্যক, ঠাকুরমার উপদেশে তাহার কোনটীই বাদ পড়ে নাই। "ঠাকুরমা" আমাদের আধুনিক মহিলাগণের পরিচালিকাস্বরূপ হইলে, সংসারে যে শান্তি বিরাজ করিতে পারিবে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে।***"ঠাকুরমা" অত্যাবশ্যকীয় উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীপাঠ্য মধ্যে গণ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

("THE TELEGRAPH")—" * * Highly recommend this book. ** * for a text-book in all Hindu Girls' Schools in the Province." ("THE INDIAN STUDENT.") —" * * * It is very useful and instructive to the females for whom it is specially intended."

প্রসিদ্ধ সাধন ও যোগ-বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীমৎ পরমহংস

স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত

সাধন-বিষয়ক অপূর্ব্ব গ্রন্থাবলী।

মন্ত্রাদি চতুর্ব্বিধ যোগ-তন্ত্র ও সাধন-বিজ্ঞান-সম্বন্ধে এরূপ সরস ও উপাদেয় পুস্তকাবলী ইতঃপূর্ব্বে আর কোন ভাষাতেই লিপিবদ্ধ

হয় নাই। সাধনার দুজ্ঞে‌র্য় তত্ত্বসমূহ যাহা তত্ত্বদর্শী গুরুর নিকট ভিন্ন জানিবার উপায় নাই, তাহারই গূঢ় আভাষ এই সমস্ত গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। **প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাধক-সমাজে উচ্চভাবে প্রশংসিত।**

—ঃ০ঃ—

স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর গ্রন্থাবলী ঃ—

সাধনপ্রদীপ [সনাতন সাধন-তত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য (১ম খণ্ড)]। (তৃতীয় সংস্করণ)—আমূল সংশোধিত ও নব নব বিষয়সংযোগে বিশেষভাবে পরিবর্দ্ধিত। স্বর্ণাক্ষর-লিখিত সুন্দর বিলাতিবৎ বাঁধান ও **শ্রীশ্রীদক্ষিণ-কালিকার সুরঞ্জিত সুন্দর চিত্রসহ.** মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

সাধনপ্রদীপ সম্বন্ধে অভিমত—

(**'এডুকেশন গেজেট'**)—"এই পরম উপাদেয় পুস্তকখানি ঠিক সময়েই মহামায়ার কৃপায় বঙ্গভূমিতে প্রচারিত হইল, ইহা পাঠে কলির বেদ আগম-শাস্ত্র-সম্বন্ধে ভ্রম-ধারণা সকল দূর হইবে এবং বাঙ্গলায় পুনরায় 'স্মরহর সমান ক্ষিতিতলে' বীরপুরুষদিগের আবির্ভাবের পথ মুক্ত হইবে। ***এই পুস্তকের কথাগুলি***সযত্নে পাঠ করা উচিত***।"

(**'হিতবাদী'**)—"গ্রন্থপ্রণেতা দুরবগাহ তন্ত্রসাগরের পরিচয় রাখেন, তন্ত্রের **এমন ব্যাখ্যা-পুস্তকের যথেষ্ট প্রচার হওয়া ভাল।**"

("THE TELEGRAPH")—'It is a treatise on the fundamental principles of Hindu religion. * * * The manner in which the book has been dealt with by the author is highly commendable. He is a profound thinker and an expounder of the difficult and intricate problems of religion. We gladly admit that it is a happy production of its kind and we recommend it to every member of the Hindu household. * * *

('সমন্বয়')—"জটিল ও নীরস বিষয়সকলও সরল ও সরস করিয়া বুঝাইবার ক্ষমতা স্বামীজির যথেষ্ট পরিমাণে আছে। যুক্তি-তর্কের সমাবেশ ও লিখনপ্রণালীর গুণে সত্য সত্যই পুস্তকখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ('মেদিনীপুর হিতৈষী')—গ্রন্থখানি সাধকের লিখিত—সাধনার সামগ্রী, ভক্তির অভিব্যক্তি। যাঁহারা তন্ত্রকে ঘৃণা করেন, আধুনিক বলিয়া উড়াইয়া দেন, তাঁহারা একবার পাঠ করুন, একবার তন্ত্র কি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করুন—আত্মহারা হইবেন, দিব্যজ্ঞান লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবেন।"

('ব্রহ্মবিদ্যা')—"*** এই গ্রন্থে তন্ত্রের সেই মৌলিক মহান্ উদারতার বিষয় আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত জনগণেরও উপযোগীরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গ্রন্থকার সিদ্ধ-সাধক; নতুবা এরূপ সহজে বোধগম্যভাবে তন্ত্রতত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার শক্তি

অপরের হইতে পারে না। পুস্তকখানি সকলকেই একবার পড়িতে অনুরোধ করি।”

পূজ্যপাদ উক্ত **স্বামীজী মহারাজের প্রণীত** নিম্নলিখিত অন্যান্য পুস্তকগুলির সমালোচনা স্থানাভাবে আর প্রদত্ত হইল না।

['সনাতন-সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য' ২য় খণ্ড] দ্বিতীয়সংস্করণ—সংশোধিত ও সম্বর্দ্ধিত অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহাতে দীক্ষা-অভিষেক এবং যোগাদি সাধনার ক্রমোন্নত বিধান ও তাহার গূঢ় রহস্যসমূহ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। **শ্রীশ্রী৺তারাদেবীর সুরঞ্জিত চিত্রসহ** সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

জ্ঞানপ্রদীপ (১ম ভাগ)ঃ—['সনাতন-সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য' (৩য় খণ্ড)] **পঞ্চ-দেবতার ত্রিবর্ণ-চিত্রসহ** সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১৷৹ পাঁচ সিকা মাত্র। 'সনাতনধর্ম্ম ও ব্রহ্মবিদ্যা', 'যোগসমাহার', 'মন্ত্রযোগ', 'হঠযোগ', 'লয়যোগ', 'রাজযোগ', পূর্ণ দীক্ষাদি', ও 'বৈরাগ্য'-সম্বন্ধে এরূপ সরল, বিস্তৃত ও ক্রমোন্নত সাধন-বিজ্ঞানযুক্ত ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত কোন পুস্তকেই প্রকাশ হয় নাই। “তত্ত্বাভিলাষী মুমুক্ষু সজ্জনগণ গ্রন্থস্থিত উপদেশরূপ স্থির প্রদীপালোকে আত্মদর্শন করিতে সক্ষম হইবেন।”

যোগবিজ্ঞান সহ উপাসনা ক্রম বা পূজাপ্রদীপ [সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্ররহস্য (৬ষ্ঠ খণ্ড)] বঙ্গবাসী' আদি সংবাদপত্রে উচ্চ প্রশংসিত। যোগ ও সাধন-বিজ্ঞানপূর্ণ এমন উপাদেয় উপাসনা-গ্রন্থ কস্মিনকালেও প্রকাশিত হয় নাই। ইহা সিদ্ধ-গুরুমণ্ডলীর অমূল্যদান! সনাতন-ধর্ম্মের এ হেন দুর্দ্দিনে এই অসাধারণ গ্রন্থের প্রকাশ কেবল শ্রীশ্রীইষ্টগুরুর অপার করুণার নিদর্শনমাত্র। ইহার বর্ণনা ভাষায় চলে না, প্রকৃত সাধনাভিলাষী ভক্ত-জনের কেবল অন্তরের আনন্দ ও অনুভূতির বিষয়! 'ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তের প্রথম-কৃত্য' হইতে 'অহোরাত্রির নিত্য-কর্ম্ম' ও নৈমিত্তিকাদি আজীবন-সাধনার অতীব গূঢ়যোগরহস্যপূর্ণ প্রকৃত অনুষ্ঠান ও উপদেশসমূহ' সহজবোধ্য-ভাষায় কথিত হইয়াছে। ইহা সাধকমাত্রেরই অপরিত্যজ্য নিত্য-ধন, চিরজীবনের সঙ্গের সাথী, ইহাতে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার স্বামিজীমহারাজের কৃপাদেশক্রমে যথাযথবর্ণে রঞ্জিত বিচিত্র ও বিশুদ্ধ 'ষট্চক্র চিত্র', 'ষট্চক্রের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতাদিগের চিত্র', কামিনীদেবীর সুরঞ্জিত অদ্ভুত চিত্র', 'আসন-মণ্ডল', 'গুরুপাদুকা', বিবিধপ্রকার 'করমুদ্রা' 'সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল', নানা দেবদেবীর 'মন্ত্র' 'হোমকুণ্ডাবলী', 'স্থণ্ডিল যন্ত্র', 'ত্রিশূলদণ্ড', 'শব্দব্রহ্ম', 'গুরুমূর্ত্তি' ও 'আত্মলয়াদির' বিপুল চিত্রাবলীর অদ্ভুত সমাবেশ হইয়াছে। প্রায় সাড়ে চারিশত পৃষ্ঠারও অধিক বিরাট অদ্বৈত-গ্রন্থ। মূল্য সুন্দর বাঁধাই ২৷০ নয়সিকা মাত্র।

পুরশ্চরণ প্রদীপ [সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্ররহস্য (৭ম খণ্ড)] ইহা 'পূজাপ্রদীপেরই' শেষ-অঙ্গস্বরূপ অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহাতে মন্ত্র-পুরশ্চরণ-সম্বন্ধীয় মন্ত্রচৈতন্য,

কুণ্ডলিনী জাগরণ ও যোগবিজ্ঞানমূলক সাধন-রহস্যপূর্ণ সমস্ত কথাই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ইহাতে চাতুর্মাস্যব্রত-বিধান, যোগিরোগ-চিকিৎসা, স্বরোদয়-শাস্ত্রোক্ত স্বাস্থ্য ও ক্রিয়াবিধান, পঞ্চতত্ত্বাদির অনুগত মানবপ্রকৃতি, রোগাদি-শান্তিকর সিদ্ধমন্ত্র ও ঔষধাবলী এবং বিবিধ-বিষয়যুক্ত বিস্তৃত পরিশিষ্ট-সম্বলিত হওয়ায় ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থাদি সকল-আশ্রমীর পক্ষেই পরম উপাদেয় বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছে। ইহাও মন্ত্রাদি-যোগীর অপরিত্যাজ্য নিত্যধনরূপে আজীবন সঙ্গের সাথী। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

কাশীমাহাত্ম্য

(দ্বিতীয় সংস্করণ) ইহাতে কাশী পঞ্চক-স্তোত্র, কাশীমাহাত্ম্য, কাশীর মৃত্তিকা ও গঙ্গাস্নান-মাহাত্ম্য, বিশ্বেশ্বরের ধ্যান, প্রণাম, শ্রীকাশীদেবীর ধ্যান, বিশ্বেশ্বরের আরতি-স্তোত্র, কালভৈরবাষ্টক, নিত্যযাত্রা, অন্নপূর্ণা-ধ্যান, প্রণাম, প্রার্থনা, অন্তর্গৃহী-যাত্রা, পঞ্চক্রোশী-যাত্রাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা কাশীবাসী ও কাশীযাত্রী সকলের অতি আদরের ধন। মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

ঠাকুর সদানন্দ

সাধক-চূড়ামণি পরমহংস-প্রবর পূজ্যপাদ ঠাকুর শ্রীমদ্ সদানন্দ সরস্বতীজী মহা-রাজের অসাধারণ জীবন-বৃত্তান্ত। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র 'ভারতবর্ষ' আদিতে উচ্চপ্রশংসিত। অতি উপাদেয় গ্রন্থ, সকলেরই ইহা শ্রদ্ধা ও সমাদরে পাঠ্য। সুন্দর বাঁধাই মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

বিহারীবাবা বা মৌনীবাবা। পরমহংসপ্রবর শ্রীমৎ বিহারীবাবার 'জীবনামৃত'।

কাশীর দশমাশ্বমেধ ঘাটে যে প্রসিদ্ধ পরমহংস মৌনীবাবা বা বিহারী বাবা নামে পরিচিত হইয়া সতত দিগম্বর বিশ্বনাথের ন্যায় বসিয়া থাকিতেন। যাঁহার সুন্দর শঙ্খ মর্ম্মর মূর্ত্তি এখনও দশাশ্বমেধ ঘাটে তাঁহার আশ্রম মন্দির প্রতিষ্ঠিত, সেই মহাপুরুষের অপূর্ব্ব ও অসাধারণ জীবন বৃত্তান্ত, পড়িতে পড়িতে চমৎকৃত ও আত্মহারা হইতে হয়। প্রায় আড়াইশত পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ। সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ গঙ্গাধর বাবার অপূর্ব্ব জীবন কথা।

আদর্শ মহাপুরুষের জীবনী সকলেরই সমাদরে পাঠ্য। বিশেষ পূজ্যপাদ স্বামীজী-.মহারাজ ঠাকুর সদানন্দ ও বিহারী বাবা আদি জীবন কথা-প্রসঙ্গে সামাজিক, নৈতিক, ধার্ম্মিক ও প্রসিদ্ধ তীর্থাদি সম্বন্ধে এমন সুন্দর ভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন যে, ইহা উৎকৃষ্ট উপন্যাসের ন্যায় সকলেরই শিক্ষাপ্রদ ও সুখপাঠ্য। সুন্দর বাঁধাই মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

'গুরুমণ্ডলীর' ফটো ও বিশুদ্ধ চিত্রাবলীঃ—

'নন্দনলাল' 'শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী', 'শ্রীশ্রীদক্ষিণকালিকা', 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-ভগবান' ও 'প্রণবেযুগল' ইত্যাদি দেবদেবীর চিত্র। (১) ষষ্ঠি -

চক্র—(সাধকাঙ্গে মূলাধারাদি ষটচক্রকমল ও সহস্রারমধ্যে অপূর্ব্ব শ্রীগুরুপাদুকাকমলে 'শ্রীশ্রীগুরুমূর্ত্তি', সুরঞ্জিত অপূর্ব্ব চিত্র ; (২) ষট্ চক্র—নরকঙ্কালস্থিত সুষুম্নামার্গের মধ্যে ষট্‌চক্রান্তর্গত দেবতাবৃন্দসমন্বিত সুরঞ্জিত অপূর্ব্ব চিত্র। মূল্য প্রত্যেকখানি ।০ চারি আনা মাত্র। পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী বশিষ্ঠানন্দ সরস্বতী, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী, সচ্চিদানন্দ সরস্বতী; কাশীমিত্রের শ্মশানস্থিত সিদ্ধসাধক, শ্রীমৎ প্রণবানন্দজী ও যোগীরাজ শ্রীমৎ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় প্রভৃতির আসল (ব্রোমাইড্-ফটো) মূল্য প্রত্যেকখানি ১।০ পাঁচসিকা মাত্র।